স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম

ইসলামের আলোকে প্রখ্যাত পদার্থবিদ হকিং এর নাস্তিকতার যাচাই

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

ষ্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম

[ইসলামের আলোকে প্রখ্যাত পদার্থবিদ হকিং-এর নাস্তিকতার যাচাই]

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫/বি. পুরানা পল্টন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

ষ্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম/মুহাম্মাদ সিদ্দিক
প্রকাশক ঃ মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা–১১০০, ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫, **প্রথম প্রকাশ ঃ** রজব ১৪২১ হিজরি
অক্টোবর ২০০০ ইংরেজি, **দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ** ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ইংরেজি
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ ইভা কম্পিউটার্স এন্ড ডিজাইন
মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা
US$-10
ISBN : 984-31-1018-8

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উৎসর্গ

"আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই" (আল-কুরআন ঃ ১৬ সূরা নাহল ঃ ২৩, আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ) দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা" (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ ৯২ আয়াত)।

"বলো, 'আমার প্রতিপালকের কথা (বাণী / বাক্যাবলী / গুণাবলী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাকে সাহায্যের জন্য তার মতো (আরও সমুদ্র) আনলেও।" (১৮ সূরা কাহাফ ঃ ১০৯ আয়াত)।

"পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র, এর সঙ্গে যদি সাত সমুদ্র যোগ দিয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর গুণাবলী (বাণী/কথা/বাক্যাবলী) লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।" (৩১ সূরা লুকমান ঃ ২৭ আয়াত)।

"যা তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।" (২ সূরা বাকারা ঃ ২৫৫ আয়াত)।

পরম করুণাময় আল্লাহ যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তার উপর ভরসা করে লেখা হয়েছে এ গ্রন্থটি। তাই আল্লাহর রাহেই উৎসর্গ করা হলো এটি। আমীন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
লেখকের কথা	৬
হকিং-এর "সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"	৯
হকিং-এর পরিবর্তনশীল খসড়া	১৩
স্রষ্টার অস্তিত্ব	১৫
বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা	২০
সম্প্রসারণশীল বিশ্ব কোরআন মজীদ	৩৩
বিশ্ব কি সঙ্কুচিত হবে?	৪১
হকিং-এর বিভ্রান্তি	৪২
বিশ্বের সীমারেখা	৬১
ডঃ হকিং-এর স্ব-বিরোধিতা	৬৫
ব্যক্তি হকিং	৬৬
হকিং-এর বিবাহিত জীবন	৭১
হকিং ও ধর্ম	৭৪
হকিং-এর নাস্তিকতার বিভিন্ন স্তর	৭৮
হকিং-এর নামের প্রচার	৭৯
হকিং-এর পক্ষে বিপক্ষে	৮০
হকিং কেন বিভ্রান্ত?	৮৩
খৃষ্টধর্ম ও বিজ্ঞান	৮৮
সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ	৯৫
কুরআনের সত্যতা ও প্রমাণ	৯৮
কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী	১১৭
নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী	১৩৬
নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং পারস্য ও রোম সম্রাট	১৪৩
মহাপ্রলয়ের পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী	১৫০
স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিক পণ্ডিতবর্গ	১৫৩
নাস্তিকতার প্রকারভেদ	১৫৬
কতিপয় পণ্ডিত ফেডারিক নিংসে	১৫৭
জাঁপল সার্ত্রে	১৬১
স্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি যুক্তি ও সেগুলোর খণ্ডণ	১৬৩
উহসংহার	২৭৬

www.pathagar.com

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান বিশিষ্ট মানবতাবাদী দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ **ডক্টর আনিসুজ্জামান** (পি,এইচ,ডি-ওয়েলস, ইউ কে; ডক্টরেট পরবর্তী গবেষণা- এ্যান্ডরুজ, ইউ.এস.এ; কিংস কলেজ, লণ্ডন,ইংল্যাণ্ড)-এর অভিমতঃ

আমি বিশিষ্ট লেখক, কূটনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মুহাম্মাদ সিদ্দিক প্রণীত **স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম** শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটির অংশ বিশেষ পড়েছি এবং লেখকের নিজের মুখ থেকে বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। তাঁর লেখার ধরণ, প্রকাশভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পড়াশোনার গভীরতা ও ব্যাপ্তি, জ্ঞানসঞ্জাত অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বাসগত পরিচ্ছন্নতা ও মহানআল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। মাত্র দু'দিনের কয়েক ঘণ্টার আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে আমরা ঘনিষ্ট হয়েছি। সবকিছু বিচার করে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, এ শতাব্দীর শেষ পাদের অন্যতম নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর চিন্তার বৈকল্যের উপর কলম ধরার একজন যোগ্য লেখক মুহাম্মাদ সিদ্দিক। মহানআল্লাহ তাঁকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দিন যাতে তিনি বিজ্ঞানের নামে এই বিস্তারশীল অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস থেকে মনুষ্যকুলকে সতর্ক করতে পারেন। তিনি এ পুস্তকে ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস সহ ঐশী ও মানব জ্ঞানের বিচিত্র শাখা মন্থন করে হকিং-এর বক্তব্যের একদেশদর্শিতা ও অগভীরতা দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাথে সব চিন্তাশীল ব্যক্তিই যে ঐকমত পোষণ করবেন এমন নয়, তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যে কোন সতর্ক পাঠকই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। আল্লাহ্পাক তাওফিক দিলে সন্দেহবাদীর ঈমানের পথ-নির্দেশ পাবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজীতে এটি অনুবাদের জন্য পরামর্শ দেই। মহানআল্লাহ্ই একমাত্র সৎপথ প্রদর্শনকারী (হাদী) ও চূড়ান্ত সংরক্ষণকারী (হাফিজ)।

৮/৫/২০০০ইং

আনিসুজ্জামান
দর্শনবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪৩৮০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬৫৫৮৩
ই-মেইল:duregstr@bangla.net

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইংল্যান্ডের ষ্টিফেন হকিং-এর কিছু মূল বই আমার কনিষ্ঠতমা কন্যা রুবিনা সিদ্দিকা পড়ত। তার কাছে থেকেই আমি ষ্টিফেন হকিং-এর ব্যাপারে প্রথমে জানতে পারি। এত পরে আমি আরো কিছু ইংরাজী বাংলা বই সংগ্রহ করি। পঙ্গু হয়েও ষ্টিফেন হকিং যে বিজ্ঞানের এত বড় পন্ডিত হয়েছেন তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের গবেষণায় তাঁর বেশ অবদান রয়েছে। তবে যে বিষয়টি আমার চিন্তায় নাড়া দেয় তাহলো তাঁর নাস্তিকতা। তাঁর লেখালেখি ও মন্তব্য পড়ে কখনও মনে হয় তিনি আংশিক নাস্তিক, কখনও মনে হয় তিনি পুরাপুরি নাস্তিক।

ষ্টিফেন হকিং-এর নাস্তিকতাতে আমি বিস্মিত হই নাই। তিনি খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টান পন্ডিতগণ খৃষ্টবাদকে শেষ পর্যন্ত যে রূপ দিয়েছেন তাতে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে খৃষ্টবাদকে মেনে নিয়ে আস্তিক থাকা অসম্ভবপর। কোন বৈজ্ঞানিক কি যীশু খোদার বেটা, এটি কি মেনে নিবেন? এ ছাড়া আরো বহু বিভ্রান্তিকর তত্ব রয়েছে আধুনিক খৃষ্টবাদে।

ষ্টিফেন হকিং-এর মত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের দুর্ভাগ্য যে তাঁরা আসমানের গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে তো বহু খোঁজ খবর নিতে পারেন, কিন্তু ঘরের কাছের ইসলাম, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে বে-খেয়াল। তাঁদের অনেকেই এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন যে ইসলাম খৃষ্টবাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। খৃষ্টবাদেরই যখন এই চেহারা, তাহলে ইসলামের আর কি শ্রেয়ত্তর হবে? তবে কষ্ট করে যারাই কুরআন অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছেন, অন্ততঃ একটি অনুবাদ, তাঁদের মনেপ্রাণে শেষ পর্যন্ত ঝড় উঠেছে। তাইতো আমরা দেখি বৃটেনের পপ তারকা ক্যাট স্টিভেন্স হয়েছেন ইউসুফ ইসলাম, ইংলন্ডের মার্মাডিউক পিকথল হয়েছেন মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথল, ফ্রান্সের ডাঃ মরিস বুকাইলী কুরআনের প্রশংসায় লিখে ফেলেছেন জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "বাইবেল, কুরআন এন্ড সাইন্স"। এরূপ আরো ভুঁড়ি ভূঁড়ি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

বৈজ্ঞানিক ষ্টিফেন হকিং-এর প্রভাব মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও অন্যান্যদের উপর পড়া স্বাভাবিক। তাঁর বিজ্ঞানের মমর্থক হতে গিয়ে অজান্তে তাঁর নাস্তিকতার ফাঁদেও তারা পড়তে পারে। এ চিন্তাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়নে। হকিং ফিজিক্সস এর বাইরে যে মেটাফিজিক্স

www.pathagar.com

নিয়ে ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য করেছেন, আর 'সুইপিং রিমার্ক' রেখেছেন যা একবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মুসলমান তো গ্রহণ করতেই পারে না, লজিকের যুক্তিতেও তার ভ্রান্তিকর "মেটাফিজিক্যাল" কথা বার্তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, স্রষ্টা নেই অথবা থাকলেও তিনি পঙ্গু– এমনি একটি ভাব দেখাইয়েছেন তাঁর বইয়ে। এটা কি এজন্য যে, খৃষ্টানদের যীশু নামক খোদা ক্রুশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নাই? আর যীশু যে খোদার রাজত্বের এক তৃতীয়াংশের ভাগিদার, এটা কি ভেবেই হকিং খোদাকে পঙ্গু ভেবেছেন? আমি আমার গ্রন্থে যুক্তির আলোকে, ইসলামের আলোকে হকিং-এর বিভ্রান্তিকে আপনোদনের চেষ্টা করেছি।

নাস্তিকতা প্রচারে হকিং- একা নন। আরো বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এতে রয়েছেন। তাই আমার এ গ্রন্থ রচনা করতে করতে লম্বা হয়ে গেল। অবশেষে আমি এটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথম ভাগে হকিং-এর ব্যাপরটাই গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে "নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন" নামে নাস্তিকতার অন্যান্য যুক্তি ও পয়েন্ট নিয়ে তর্কবিতর্ক অন্তর্ভূক্ত। আর "স্রষ্টাতত্ত্ব ও ইসলাম" নামে শেষটিতে ইসলামের স্রষ্টা তত্ত্ব স্থান পেয়েছে। এই ত্রয়ী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য একই– নাস্তিকতাকে নস্যাৎ করে স্রষ্টার অস্তিত্বকে যুক্তিগত দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনটি গ্রন্থ পাঠে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে। তবে প্রতিটি গ্রন্থ আলাদা আলাদাভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণও বটে।

স্টিফেন হকিং-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। বিজ্ঞানের গবেষণায় ভুল হলেও কোন দোষ নেই। বিজ্ঞান এমনিভাবেই এগিয়ে চলছে ভুল ত্রুটি ঠেলে ঠেলে। ইসলাম গবেষণায় (ইজতেহাদে) ভুল হলে এক সওয়াব (পূণ্য), আর শুদ্ধ হলে দুই সওয়াব, বলা হয়। ভুল গবেষণাতেও সওয়াব রয়েছে। তবে পরবর্তীতে ভুল ধরা পড়লে তা স্বীকার করা উচিত।

বিজ্ঞানের গবেষণা ও ধর্মতত্ত্বের গবেষণায় পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণার ভুলে হয়ত তেমন ক্ষতি হবে না কারো, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের, মেটাফিজিক্সের (অধিবিদ্যার) গবেষণার ভুলে কারো বিশ্বাস (ঈমান)ই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে হতে পারত ধার্মিক, সে হয়ে গেল নাস্তিক– ধর্ম বিরোধী। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ধর্মতত্ত্ব ব্যাপারে মন্তব্য করতে পন্ডিতদের সাবধান হতে হবে।

ষ্টিফেন হকিং একজন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক। সম্ভবতঃ আমার এই বইটি সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম বই যা হকিং-কে সমালোচনা করে লেখা হয়েছে। আমি

www.pathagar.com

দুঃখিত যে আমাকে এটি লিখতে হয়েছে। হকিং যদি স্রষ্টাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করতেন, তাহলে আমার এটি লেখার প্রয়োজন হোত না।

সর্বশেষে আমি একটি কথা বলতে চাই। আমি খুশি হতাম যদি হকিং কুরআন ও হাদীস কিছুটা হলেও পড়াশুনা করতেন। আজকাল ইংরেজিতেও এসবের অনেক অনুবাদ পাওয়া যায়। কুরআন অধ্যয়ন করলে হকিং হয়ত তাঁর গবেষণাকে উন্নততর রূপ দিতে পারতেন। ডাঃ মরিস বুকাইলীর মত তাঁরও হয়ত দিকনির্দেশনার হোত আমূল পরিবর্তন, কারণ আমরা তো সবাই সত্য আহরণে সচেষ্ট। আর সত্যকে কে অস্বীকার করতে পারে?

কেউ সুযোগ পেলে হকিংকে কি কুরআন ও হাদীসের ইংরেজী কিছু কপি উপহার প্রদান করতে পারেন? পরিবর্তিত হকিং লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী ও ছাত্র-ছাত্রীকে সঠিক সংকেত দিতে পারতেন।

২৬৫ নিউ ডি, ও, এইস, এস, লেন-১৯,
ঢাকা-১২০৬
ফোনঃ ঢাকা- (৮৮০-২)৮৮২৭৮১২
১৭ই জুন, ২০০০ ইং

—মুহাম্মাদ সিদ্দিক

www.pathagar.com

হকিং-এর "সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"

ডঃ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভিতর একজন সেরা বিজ্ঞানী। তিনি শারীরিক দিক দিয়ে পঙ্গু। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন। তবু শারীরিক পঙ্গুত্বকে হার মানিয়ে তিনি পড়াশুনা, গবেষণা চালিয়ে যান, পিএইচডি ডিগ্রী গ্রহণ করেন ও শেষতক ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক শাস্ত্রে লুকাসিয়ান অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি পান। এই পদে এক সময় স্যার আইজ্যাক নিউটন (বিশ্বের আরেক সেরা পদার্থবিদ) ছিলেন। অনেক বিশেষজ্ঞ হকিংকে আইনস্টাইনের পরে একজন সেরা পদার্থবিজ্ঞানী বলে মনে করেন।

হকিং-এর একটি বই "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব্ টাইম" (সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। প্রায় দুশো পৃষ্ঠার এ বইটি মূলতঃ অপদার্থবিদদের জন্য লেখা পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বই। তবু পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন নতুন কথা রয়েছে ছোট্ট বইটিতে। সহজ করে বলার চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত হকিং তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা। ১৯৮৮ সালে বইটি বাজারে আসে ও (বেষ্ট সেলার)-সেরা বিক্রয়ের প্রশংসা হাসিল করে।

আমাদের এই বইটিতে আগ্রহের কারণ হলো পদার্থবিজ্ঞানের নবতর গবেষণার আলোকে ইসলামকে পরখ করে দেখা আর দ্বিতীয়ত ডঃ হকিং কর্তৃক স্রষ্টা ও ধর্ম সম্পর্কে কতিপয় মন্তব্যও পরখ করা। সাধারণতঃ বলা হয় যে, বিজ্ঞানের নবতর গবেষণা ও আবিষ্কার ধর্মকে কোণঠাসা করছে। এ ধারণা অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ঠিক হলেও, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এটি আরোপ করা অবৈজ্ঞানিকসুলভ হবে। ফ্রান্সের চিকিৎসা বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী কোরআন মজীদ নিয়ে গবেষণা করে তাঁর বিখ্যাত "দি বাইবেল দি কুরআন এন্ড সাইন্স" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনে কোন অবৈজ্ঞানিক তথ্য বা অসামঞ্জস্যতা নেই।

হকিং-এর বইটির ভূমিকাতে কার্ল সাগা (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইথাকা, নিউইয়র্ক) লিখেছেন ঃ This is also a book about god . . . or perhaps about the absence of god. The word god fills these pages. Hawking embarks on a quest to answer Einstein's famous question about whether god had any choice in creating the universe. Hawking is attempting, as he explicitly states, to understand the mind of god and this makes all the more

www.pathagar.com

unexpected the conclusion of the effort, at least so far, a universe with no edge in space, no beginning or end in time and nothing for a creator to do." (ভাবানুবাদ: এটা ঈশ্বর সম্পর্কেও একটি বই ... অথবা ঈশ্বরের না থাকার সম্পর্কেও। ঈশ্বর শব্দটি এই বইয়ের পাতায় পূর্ণ। বিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন পছন্দ ছিল কি না– বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত প্রশ্নের জবাবের জন্য হকিং প্রচেষ্টা নেন। হকিং স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের মনকে বোঝার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত তিনি যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তার ফলাফল অপ্রত্যাশিত। হকিং চেয়েছেন এমন একটা মহাবিশ্ব, যার নেই কোন কিনারা মহাশূন্যে, কোন শুরু নেই, কোন শেষ নেই এবং স্রষ্টার করার কিছু নেই")।

হকিং-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে কার্ল সাগা যা বলেছেন, তাতে ঈশ্বরের যে পরিচয় ফুটে ওঠে, বিশ্ব সৃষ্টিতে সেই ঈশ্বরের যেন কোন ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ ছিল না, এমনকি তার করারও কিছু ছিল না। তাহলে ধরে নিতে হয় বিশ্ব সৃষ্টিতে আর একটি শক্তি— যা ঈশ্বর অপেক্ষা শক্তিশালী— কাজ করেছে। তাই ঈশ্বরের করার কিছু ছিল না। আর বিশ্বটাও এমনি যে, এর কোন শুরু নেই, শেষ নেই, কিনারা নেই। হকিং এর মন্তব্যের অর্থ হলো যার শুরুই নেই, তার সৃষ্টিতে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন কি?

আসলে হকিং ও কার্ল সাগা বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়গুলি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ঈশ্বর আছেন কি না, তা কি পদার্থ বিজ্ঞানীর গবেষণাগারের উপর নির্ভরশীল? শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কি বিশ্বকে দেখতে হবে? মানুষের আর সব জ্ঞানকে কি তবে সমুদ্রে বিসর্জন দিতে হবে? হকিং তার বইয়ের শেষ দিকে উপসংহার অংশে দার্শনিকদের ব্যঙ্গ করেছেন। আসলে যে যে লাইনের পণ্ডিত তারটা ছাড়া অন্যেরটা তার তেমন পছন্দের হয় না। তারা মনে করেন যে, সব কিছু তাদের বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে বা তাদের বিষয়েই নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজ কি?

হকিং মন্তব্য করেছেন যে, দার্শনিকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন থিওরির (মতবাদ) উন্নতির সঙ্গে তাল মিলাতে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকগণ বিজ্ঞানসহ সমগ্র জ্ঞানকে তাদের বিষয়বস্তু মনে করতেন এবং তারা আলোচনা করতেন বিশ্বের কি শুরু ছিল? তারপর বিজ্ঞান বেশী টেকনিক্যাল ও গাণিতিক হওয়ার ফলে দার্শনিকদের শুধু ভাষার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু করার থাকেনি। হকিং-এর এ সব কথা অনুযায়ী যেহেতু দার্শনিকগণ বিশ্ব ও ঈশ্বর সম্পর্কে চূড়ান্ত

www.pathagar.com

কিছু দিতে পারেননি তাই দর্শন এখন আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাঁর মতে এখন যদি বিজ্ঞানীরা সমস্ত বৈজ্ঞানিক থিওরি (মতবাদ) কে একটি থিওরিতে আনতে পারেন, তাহলে ঈশ্বরের মনকে জানা যাবে। বিজ্ঞানীরা বিশ্ব সম্পর্কে একটি সাধারণ একক থিওরি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তারা নাকি খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন।

শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে সমগ্র বিশ্ব ও জ্ঞানকে যাচাই করে, দর্শনকে অবজ্ঞা করে এবং সাধারণ একক বৈজ্ঞানিক থিওরি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের তথাকথিত অসহায়ত্ব প্রকাশ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে? যদি বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করে যে, বিশ্বের শুরু, শেষ ও কিনারা নেই, আর একটি মাত্র একক সাধারণ বৈজ্ঞানিক থিওরি সব কিছুর জন্য দায়ী তাতে ঈশ্বরের অসহায়ত্বটা কোথায়? বিরাটতম ঈশ্বর কি বিরাট বিশ্বকে নিজস্ব পছন্দে সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর কি কোন কার্যই ছিল না? না, তিনি না চাইতেই বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল? হকিং-এর ধারণা অনুযায়ী এ সব মেনে নিলে ঈশ্বর সম্পর্কে হিন্দু বা বিকৃত খৃষ্টধর্ম সম্পর্কীয় ঈশ্বর ধারণাকে মেনে নিতে হয়। ইসলামের ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কীয় ধারণা এ সবের উর্ধ্বে। বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে– আর আল্লাহ তার পরিকল্পনায় ছিলেন না বা তার করার কিছু ছিল না এতে– কতিপয় পদার্থ বিজ্ঞানীর এই ধরনের বিভ্রান্ত মতামত মানুষকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এককালে দার্শনিকগণ বিজ্ঞান নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করতেন। এই চিন্তাভাবনার ফলে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ তাদের গণ্ডিভুক্ত জ্ঞান দিয়ে দার্শনিক প্রসঙ্গগুলিকে দেখছেন। সেই সঙ্গে ঈশ্বর সম্পর্কে আজগুবি তত্ত্ব দিচ্ছেন। এতে সত্য প্রকাশিত না হয়ে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হবে।

আর একটি কথা। পদার্থ বিজ্ঞানী হকিং মনে করেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞান বেশী টেকনিক্যাল ও গাণিতিক হওয়ার ফলে দার্শনিকগণ বিজ্ঞানে আর নাক গলাবার মওকা পাচ্ছেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ শাখা দর্শনকে এভাবে ব্যঙ্গ করা তার মত জ্ঞানীর ঠিক হয়নি। দর্শন যদি পরিত্যাজ্যই হবে, তবে কেন তিনি পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য লালায়িত ছিলেন। পিএইচডি হোল ডক্টর অব ফিলোসফি। পদার্থবিদ্যার ছাত্র হয়েও তাঁকে নিতে হয়েছে দর্শনের তকমা। এ সব কথার দ্বারা আমি দর্শনকে উচ্চে তুলতে চাই না। আমি বলতে চাই না যে, দর্শনই শ্রেষ্ঠ। আমি এও বলব না যে, পদার্থ বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। আসলে জ্ঞান এক অবিভাজ্য অভিজ্ঞতা। এ এক বিশাল বৃক্ষ। এর শিকড় গভীরে প্রোথিত, আর

www.pathagar.com

ডালপালা উর্ধ্বে বিস্তৃত। পদার্থ বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়াও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ডাল-পালা, নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সবই জ্ঞানরূপ বৃক্ষের অংশ।

কোরআন মজীদ বলে ঃ "সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে। . . . . . কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নাই।"

(১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২৪-২৬)।

ডঃ হকিং পদার্থবিজ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারেন। তবে কি তিনি এনাটমি, জিওলজি ইত্যাদিতে একইভাবে পণ্ডিত বলে গর্ব করতে পারেন? এগুলোও বিজ্ঞানের অংশ। তবু সব বিজ্ঞানী সব অংশ সম্পর্কে একই পর্যায়ের পণ্ডিত নন। বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাতেই যদি এমন হয়, তাহলে বিজ্ঞানের বাইরে জ্ঞানের যে শাখা-প্রশাখা আছে, তা সম্পর্কে একজন বিজ্ঞানী কি সম-জ্ঞানের অধিকারী? না, নন। কাজেই একজন পদার্থবিদের চোখ দিয়ে দেখা ঈশ্বর সম্পর্কে বিভ্রান্তকারী মনোভাব কিভাবে গ্রহণ করা যায়? এতো কুবাক্য অনুরূপ। এ বাক্যের কোন স্থায়িত্ব নেই, এর মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিশ্ব সম্পর্কে একটি একক থিওরি আবিষ্কার হলে ঈশ্বর কোণঠাসা হয়ে যাবেন বা তার ক্ষমতা সীমিত হবে বা তাঁর করার কিছু থাকবে না আর মানুষ (বিশেষ করে কোন একজন সেরা পদার্থবিজ্ঞানী) হবে চূড়ান্ত সত্য— এটা কিভাবে চিন্তা করা যায়? একীভূত, একক বৈজ্ঞানিক থিওরি তো পক্ষান্তরে একত্ববাদেরই জয়গান গাইবে। সব কিছুর মূলে যে ঈশ্বর–তখনতো তাই প্রমাণিত হবে। বিভিন্ন থিওরি থাকলে কেউ কেউ বলতে পারতেন যে, নানা ঈশ্বর নানা থিওরি সৃষ্টি করেছেন। যখন থিওরি একটাই হবে, তখন এক ঈশ্বর যে এর স্রষ্টা— এটা বলাই স্বাভাবিক হবে। কাজেই একক বৈজ্ঞানিক থিওরি ঈশ্বরের ক্ষমতা বা অবস্থানের ক্ষতি করবে না। পদার্থবিদ হকিং পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের ঘরে হানা দিয়ে ঈশ্বরকে ক্ষমতাহীন করার ব্যর্থ কসরত করেছেন।

কোরআন মজীদ বলে ঃ "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন ঃ তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। তারপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবেন, তখন তোমরা উঠে আস্‌বে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। সকলেই তাঁর হুকুম মানে। আর তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি আবার একে সৃষ্টি করবেন— এ তাঁর জন্য সহজ।

www.pathagar.com

আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই। আর তিনিই শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।" (১০ সূরা রূম ঃ আয়াত ২৫-২৭)।

"তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, আর সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে।" (২২ সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ১৮)।

"সাত আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যকার সবকিছু তাঁরই পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে আর এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে না। অবশ্য ওদের পবিত্র মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪৪)।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে মান্‌ছে। আল্লাহর আদেশই চলছে সর্বত্র। আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি তাঁরই আদেশে নির্ভরশীল। শুধু মানুষের কিছু সংখ্যক তাঁকে মান্‌ছে না। কিন্তু বস্তুজগত (অর্থাৎ পদার্থবিদ্‌দের বিশ্ব) আল্লাহ্‌কে মান্‌ছে। তাই যদি হয়, তাহলে তার আদেশ তো একটাই হবে। তাই একক, একীভূত বিশ্ব থিওরি আবিষ্কৃত হলে আল্লাহর অসুবিধাটা কোথায়? হকিং-এর মত কিছু পদার্থ বিজ্ঞানী তাঁকে পুরাপুরি না মানলে আল্লাহর কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত হবে না। তিনি আগে যা করেছেন, এখনও তাই করতে সক্ষম।

সৃষ্টি সম্পর্কে ঈশ্বরের কোন পরিকল্পনা ছিল কি না, এ ব্যাপারে তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল কি না, তিনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন কি না, তাঁর করার কিছু ছিল কি না, তাঁর ক্ষমতা সৃষ্টিতে সীমিত ছিল কি না, তাঁর এখন করার কিছু আছে কি না, দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের এ সব প্রশ্নের উত্তর শুধু পদার্থবিদ্যা দিয়ে প্রদান করা ঠিক হবে না। ফিজিক্স-এর বাইরে রয়েছে 'মেটা ফিজিক্স'। কোনটাকে খাটো করা যায় না। 'ফিজিক্স' যেখানে শেষ, 'মেটাফিজিক্স' সেখানে শুরু। বিজ্ঞান যেখানে যেতে পারে না, দর্শন সেখানে বিচরণে সক্ষম। ধর্মতত্ত্ব সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ও দর্শনকে ঠিক রাস্তায় নিতে পারে। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব দর্শনকে ঠিক পথে চালাতে সক্ষম।

হকিং-এর পরিবর্তনশীল খসড়া

এখন ডঃ হকিং প্রসঙ্গে আসা যাক। ডঃ হকিং তাঁর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব্ টাইম" বইয়ে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এই দুশো পৃষ্ঠার বইটি তাঁর ছাত্র

www.pathagar.com

ব্রিয়ান হুইট সংশোধন করতে সাহায্য করেন। তাছাড়া বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করেছেন এই বইটির উৎকর্ষ সাধনে। মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন নিউইয়র্কের "রাইটার্স হাউস"-এর সভাপতি Al zuckerman এবং আমেরিকার "বান্টাম বুক্স" প্রকাশনী সংস্থার সম্পাদক Guzzardi-র সূত্রে লেখেন ঃ Zuckerman has said of Guzzardi's efforts:

I would guess that, for every page of text Peter (Guzzardi) wrote two to three pages of editorial letters, all in an attempt to get Hawking to elaborate on ideas that his mind jumps over, but other people wouldn't understand." (Page 229) .

[অনুবাদ ঃ জুকারম্যান সম্পাদক পিটার গুজারদির প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন ঃ আমি মনে করি হকিং-এর প্রতি পৃষ্ঠার ব্যাপারে সম্পাদক পিটার গুজারদি দু' থেকে তিন পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় পত্র হকিংকে লেখেন। যে যে বিষয়ের উপর মনে হয়েছে যে, তার আরো বর্ণনা প্রয়োজন, কারণ অন্য পাঠকগণের নিকট তা বোধগম্য হবে না গুজারদি তা হকিংকে জানান।" (পৃষ্ঠা- ২২৯)।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন, "The first draft of the manuscript was completed by Christmas (of 1984) and work on re-writes began in the New year." (Page 231) .

[অনুবাদ ঃ ১৯৮৪ সালের যীশুখৃষ্টের জন্মদিনের ভিতর পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া লেখা শেষ হয় এবং পুনর্বার লেখা শুরু হয় নববর্ষে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে (পৃষ্ঠা-২৩১)] ।এদিকে বইটির সম্পাদক পিটার গুজারদি সম্পাদনার কাজ করে যেতে লাগলেন। হকিং এর ভিতর পিটার গুজারদি ও অন্যান্য পাঠকদের পরামর্শ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অংশ পরিত্যাগ করলেন ও কয়েকটি অংশ নতুন করে লিখলেন। হকিং বেশ কয়েকটি অঙ্ক ও সমীকরণ পরিশিষ্টে দিতে চান যাতে সম্পাদক প্রবল বাধা প্রদান করেন। কারণ, পাঠকগণ এসব পছন্দ করবে না। (সূত্র ঃ হোয়াইট ও গ্রিবিন, পৃষ্ঠা-২৩৭)।

যাই হোক, হকিং বেশ কয়েকটি প্রাথমিক 'ভার্সন' লেখেন এই বইটির মুসাবিদায়। বান্টাম বুকস লাইব্রেরীর পক্ষে সম্পাদক পিটার গুজারদি পাতার পর পাতা সমালোচনা, মন্তব্য ও প্রশ্ন পাঠান ডঃ হকিং এর নিকট এমন বিষয় সম্পর্কে যা হকিং বইটিতে ঠিকভাবে প্রাথমিক খসড়াতে প্রতিফলিত করেননি। ডঃ হকিং বলেন, "I received his great list of lines to be changed" (অনুবাদ ঃ পরিবর্তন করার জন্য আমি একটি বড় তালিকা পাই সম্পাদক থেকে)। হকিং

www.pathagar.com

তার পুস্তকের "স্বীকৃতি" অংশে এসব উল্লেখ করেছেন। ডঃ হকিং-এর দুশো পৃষ্ঠার পদার্থবিদ্যার বইটি বের করতে কতজনের সাহায্য-সহযোগিতা, সংশোধনী, পরিবর্তন গ্রহণ করতে হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত কোরআন মজীদ যা সাধারণ ছাপাতে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার ন্যায়, তা তিনি কতবার খসড়া করেন, কতবার কাটাকাটি করেন, কতজনের সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করেন? একবারও না। লেখাপড়া না জানা একজন ধর্ম প্রচারক একবার যা 'ডিক্টেট' করেছেন তাঁর লেখকদের কাছে (অবশ্য আল্লাহর নির্দেশে) তাই আজ পর্যন্ত আমাদের সামনে রয়েছে। হকিংদের বইয়ের মত হযরত (সাঃ) কোরআন মজীদের বারে বারে খসড়া বদলান নাই। তবু কি হযরতের বাণীকে পদার্থবিদদের নীচে নিতে হবে? হকিং-এর অদ্যকার মন্তব্য আগামীকাল নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অচল হয়ে যেতে পারে। কোরআন মজীদ মূলতঃ ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কে এতে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব এসেছে তার কোন পরিবর্তন হবে না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে কোরআনের বৈজ্ঞানিক বক্তব্যসমূহ কোনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ, কোরআন হলো বিজ্ঞানের স্রষ্টা, বিশ্বের স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত যদিও তা হযরতের মুখ দিয়ে প্রকাশিত। কোন কোন আয়াত আপাততঃ দৃষ্টিতে অবৈজ্ঞানিক মনে হলেও, নবতর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হবেই। সত্য একই, সত্য বহু নয়। তাই কোরআনে যা সত্য তাই বিধৃত হয়েছে।

স্রষ্টার অস্তিত্ব

হকিং-এর মতে স্রষ্টা মানুষ ও মহাবিশ্ব নিয়ে কোন কিছু ভাবেন না। নাই তাঁর কোন মাথাব্যথা মানুষের ব্যাপারে। এ শুধু হকিং-এর কথা নয়। বেশকিছু নাস্তিক পণ্ডিত এমনি ধারণা পোষণ করেন। এ ধারণা একটি ভুল ধারণা। পৃথিবীতে অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, হতাশা, ব্যাধি, জরা, অপরাধ, যুলুম, বন্যা, ভূমিকম্প, হত্যা ইত্যাদি রয়েছে বলে কি স্রষ্টা বিশ্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত? আসলে তা নয়। ভাল-মন্দ সবকিছু মিলিয়েই স্রষ্টার বিশ্ব।

বিশ্বের ভালমন্দ সম্পর্কে স্রষ্টার মুখ থেকেই মন্তব্য অনুধাবন করতে হবে। স্রষ্টা মানুষ সম্পর্কে একেবারে নির্লিপ্ত নন। মানুষকে ভালবাসেন তিনি। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে–নবী (প্রফেট)দের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবীগণের মাধ্যমে স্রষ্টা

www.pathagar.com

মানুষের ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন, নানা তথ্য প্রদান করেছেন। এসব হেসে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি স্রষ্টার কথা বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে প্রাপ্ত নতুন ও পুরাতন বাইবেল, ইহুদিদের তৌরাত (তোরা) ও ইসলামের কুরআনে এখানে-সেখানে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল সুর একই। স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব, জীবজন্তু, মানুষ সবই সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য মাঝে মাঝে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষকে ঠিক পথে চলার পরামর্শ দিয়ে। স্রষ্টা তাঁর একটি নীতির কারণেই প্রতিটি মানুষের সম্মুখে সশরীরে হাজির হবেন না। তিনি বিশ্বে তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁর বাণী মানুষকে জানান। ভক্তিপ্রবণ মানুষ এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই অতিভক্তি দেখিয়ে আসল স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এদের কাউকে কাউকে স্রষ্টা, ভগবান, গড, খোদার পুত্র ইত্যাদি নামে প্রচার করেছে। এটি একটি বড় ভুল। এইসব ব্যক্তির সবাই স্রষ্টার দূত–প্রতিনিধি। তাঁরা কেউই স্বয়ং স্রষ্টা নন।

সে যাই হোক, এই সব ব্যক্তিত্বের অন্যতম সর্বশেষ নবী (প্রফেট) স্রষ্টার যে বাণী কুরআন মজীদের মাধ্যমে বহন করে এনেছেন, তাতে মানুষের বহু প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর এসব জবাব আজগুবি নয়। কুরআন মজীদের কোন অংশকেই মিথ্যা প্রমাণ করা যায় নাই বলে এসব জবাবও তথ্য নির্ভরযোগ্য। কুরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভুল পাওয়া গেছে। কুরআন মজীদ তাই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছে এমনি একটি রচনা পেশ করতে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরক্ষর হলেও তাঁর মুখ নিঃসৃত কুরআন মজীদ নিজেই একটি অলৌকিক বস্তু। এটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রচনা নয়, এটি তাঁর নিজের বাণী নয়– পুরা গ্রন্থটি প্রকাশের তিনি শুধু একটি মাধ্যম মাত্র। রেডিও, টেলিভিশন সেট যার আছে, সেই শুধু কোন দূরবর্তী রেডিও, টেলিভিশন কেন্দ্রের কথা ধরতে পারে; অন্যরা তাতে অক্ষম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবীদের স্রষ্টার বাণী গ্রহণের ক্ষমতা ছিল বলেই তাঁরা ঐশীগ্রন্থ মানুষকে উপহার দিয়েছেন। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেরিত গ্রন্থটি সর্বশেষ, তাই এতে রয়েছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও বাণী।

পৃথিবীতে ভালোর সঙ্গে অনেক মন্দ কিছুও হচ্ছে। স্রষ্টাকে এসব মন্দ কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না। কেউ যদি গাড়ী চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহলে গাড়ীকে দোষ না দিয়ে চালককেই দোষারোপ করা উচিত। আইনকেও

www.pathagar.com

এতে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেউ যদি বেশী বেশী আহার করে মোটা হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে পাচককে দোষ না দিয়ে সেই পেটুক ব্যক্তিকে দোষ দেওয়াই উচিত। বাবার ভালো ভালো পরামর্শ সত্ত্বেও কোন সন্তান জীবনে অঘটন ঘটালে বাবার কোন দোষ নেই; এতে সন্তানই দায়ী। অঘটনের জন্য, মন্দের জন্য স্রষ্টাকে দায়ী করলে, ভালো জিনিসগুলি, ভালো ঘটনাবলীর জন্য প্রশংসা কার ঝুড়িতে যাবে? এই সুন্দর সুন্দর নদী, প্রস্রবণ, পর্বত, বন, মাঠ সৃষ্টির কৃতিত্ব কার? যদি রোগের জন্য সমালোচনা করা হয় স্রষ্টাকে, সুস্থ ও নিরাময় অবস্থার জন্য কাকে প্রশংসা করা হবে? স্রষ্টা যে মানুষের জন্য কত ভালো ভালো কাজ করেছেন, তা যে অস্বীকার করা যাবে না তাই সুললিত ভাষায়, মধুর ছন্দে স্রষ্টা কুরআন মজীদের ৫৫ নম্বর সূরা আর রাহমানে প্রশ্নাকারে উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে, সূর্য, চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁর বিধান, তিনিই আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যই, এতে রয়েছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। অতএব, তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ মানুষ ও জীন্ নামক অলৌকিক ও জীবন্ত সৃষ্টি) তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (আয়াত ১-১৩)।

স্রষ্টা উপরে বলছেন যে, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে মনের ভাব প্রকাশ করা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ ভাষা– ইশারা, অঙ্গভঙ্গি স্রষ্টার দান।

কুরআন বলে, "মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে এবং জিন্‌কে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের (সূর্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্তের স্থান অথবা অন্য মতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের উদয় ও অস্তাচল) নিয়ন্তা। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা আর রাহমান আয়াত ১৪-১৮)। শুষ্ক পোড়ামাটি থেকে কি সুন্দর প্রতিভাবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা। তাছাড়া অনেক মানুষের অগোচরে অবস্থানরত জীন্ নামক অলৌকিক জীবন্ত সৃষ্টি স্রষ্টার এক মহান কীর্তি। স্রষ্টা কি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখেয়াল?

www.pathagar.com

মানুষকে স্রষ্টা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। সে ভালোমন্দ যে কোন পথে চলতে পারে। ফলাফল তাকেই ভুগতে হবে। কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ) তাকে (মানুষকে) পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (৭৬ সূরা দাহ্‌র বা ইন্‌সান ঃ আয়াত ৩)।

কুরআন বলে, "তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া (লোনা ও মিঠা) যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৫ সূরা আর রাহমান ঃ আয়াত ১৯-২৫)। স্রষ্টা বলছেন যে, মানুষের প্রয়োজনে লোনা ও মিঠা দুই দরিয়া তিনিই সৃষ্টি করেছেন। লোনা দরিয়া না হলে মানুষ কোথায় পেত তার অতীব প্রয়োজনীয় লবণ? আর মিঠা পানি তো জীবনেরই অন্য নাম। দরিয়ায় উৎপন্ন মুক্তা ও প্রবাল স্রষ্টারই তৈরী। সাগরে যে বিরাট জাহাজ ভাসে, তা স্রষ্টার নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত নাহলে কিভাবে পর্বত সমান জাহাজ পানিতে ভাস্‌তে পারে। পানিতে ভেসে থাকার ফর্মূলাটির স্রষ্টা তো তিনিই।

কুরআন বলে, "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর নিকট ঋণী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে মানুষ ও জীন্! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৫৫ সূরা আর রাহমান, আয়াত ২৯-৩২)।

স্রষ্টা ৩২ নম্বর সূরা-'সাজদা'য় বলেন, "তিনি (স্রষ্টা) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে যে দিনের পরিমাপ হবে– তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান।" (আয়াত ৫)। স্রষ্টা সুস্পষ্ট করেছেন যে, তিনি মহাবিশ্ব পরিচালনায় প্রতি মুহূর্তে কর্মরত রয়েছেন। তিনিই মহাবিশ্বের সবকিছু পরিচালনা করছেন। এ পরিচালনার পরিকল্পনাকারী, রূপকার তিনিই। সব মানুষের চোখে এটি প্রতিভাত না হলেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এটি ভালভাবে অনুধাবন করেছেন। সাধারণ মানুষ হয়ত স্বাভাবিকভাবে মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত্রি, পানি, আগুন,

www.pathagar.com

বাতাস ইত্যাদি অনুধাবন করছে এবং এগুলোই মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মনে করছে। কিন্তু সে কি ভেবে দেখেছে– এ সবকে কে নিয়ন্ত্রণ করছেন? মাধ্যাকর্ষণের পরিকল্পনাকারী তো স্রষ্টা নিজে, মাধ্যাকর্ষণ নীতির আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক নিউটন নন। নিউটনের কৃতিত্ব এইটুকু যে, তিনি এটি প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছেন অথবা স্রষ্টা তার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্রষ্টার কিছু গুরুত্বপুর্ণ বিষয় জানতে পেরেছেন, এটা সম্ভবপর হয়েছে স্রষ্টা মানুষকে সে গুণ দিয়েছেন বলেই। মানুষের এ সামান্য জ্ঞানও স্রষ্টারই অবদান, যা স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকেই প্রদান করেছেন। কুরআন বলে ঃ "তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন আর এ দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল জন্মান। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ–সাদা, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রং- বেরঙের মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে। আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ তো শক্তিমান ক্ষমাশীল।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ২৭-২৮)

"বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?" বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" (৩৯ সূরা জুমার ঃ আয়াত ৯)।

"তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান) দান করেন। আর যাকে হিকমত দেওয়া হয় তাকে তো প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়। আসলে, কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"
(২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৯)।

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে সেইসব বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে . . .।"
(৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১ আয়াত)।

উপরের বাক্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জ্ঞান স্রষ্টার দান। আর সত্যিকারের জ্ঞানীগণই স্রষ্টাভীরু। কলম মানুষের জ্ঞানের একটি সাধারণ ও অসাধারণ উপাদান। জাগতিক ও বাহ্যিক দিক দিয়ে দেখলে বলা হবে যে কোন মানুষ এটি আবিষ্কার করে প্রথমে। তবে স্রষ্টা কুরআনের প্রথম বাক্যাবলীতেই বলেন, "আবৃত্তি কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" (সূরা আলাক ঃ আয়াত ৩-৫)। আর একটি পূর্ণ সূরার নামই হোল 'কলম'! ২৬৮ নম্বর সূরা এটি। এর শুরুতে সৃষ্টা বলেন, "নূন! শপথ কলম ও শপথ ওরা (ফেরেশ্‌তারা) যা লিখে তার।"

www.pathagar.com

(৬৮ সূরা কলম ঃ আয়াত ১)। স্রষ্টা এই "কলম" শব্দ দ্বারা শপথ করছেন মানুষকে নিশ্চিত করতে। আর স্রষ্টা বলছেন যে, তিনি মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে কলমের আসল প্রস্তুতকারক স্রষ্টা নিজেই। কোন মানুষ শুধু উপলক্ষ। স্রষ্টা তো তাঁর নীতি অনুযায়ী– একটি কলম নিজে বানিয়ে মানুষকে উপহার দেন নাই (আর তা দিলেও আশ্চর্যের কিছু হবে না)। কোন মানুষের মনে কলম আবিষ্কারের শক্তি দিয়েছিলেন যার ফলে মানুষের জ্ঞান বিকাশের একটি অসাধারণ-সাধারণ বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে। হকিং যে বলছেন– স্রষ্টা মানুষ সম্পর্কে বেখেয়াল, তা কি এই ব্যাখ্যা মিথ্যা প্রমাণিত করে না? হকিং ও তার সমমনাদের হাতে কলম না থাকলে স্রষ্টা সম্পর্কে এ সব অনুমান নির্ভর কথা কি তাঁরা লিখতে পারতেন?

কুরআন বলে, "তিনি (আল্লাহ্) শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!। (১৬ সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪)। মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না, সে তুচ্ছ মাটি ও তারপরে নিকৃষ্ট শুক্র হতে সৃষ্ট। অথচ বড় হয়ে সে তার স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে!

কুরআন বলে, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করবার জন্য। তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন-যন্ত্রণা।" (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৮)।

কুরআন বলে, "তুমি যতই চাও না কেন, বেশীরভাগ লোকই বিশ্বাস করার নয়।" (১২ সূরা ইউসূফ ঃ ১০৩ আয়াত)।

স্রষ্টার অস্তিত্ব তাই অনেকের কাছে কুহেলিকাময়। কেউ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কেউ অবজ্ঞা করে। মানবকেই তার নিজস্ব জ্ঞান, প্রতিভা, অনুভূতি দিয়ে এর মুখোমুখি হতে হবে। ভুল সিদ্ধান্তে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে কারণ মানুষ এতে সত্য বিচ্যুৎ হয়ে পড়বে।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

বিজ্ঞান একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যা হলেও এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমনি রয়েছে জ্ঞানের অন্যান্য শাখারও। বিশ্বের জ্ঞান একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় হলেও, ব্যক্তির মন-মগজ দিয়ে তা অনুধাবন করতে হয়। মন-মগজের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক। সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত পদার্থবিদ Charles Eugene guye (চার্লস

www.pathagar.com

ইউজিন গাই) মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, "It is the scale of observation (by the scientist) which creates the phenomenon (of an object). The scale of observation depends on man; it is he, who creates it. In nature different scales of observatias do not exist. There is only one immense, harmonious phenomenon on a scale which in general escapes man because of the structure of the brain, a structure which necessitetes dividing into arbitrary compartments and cutting up into insolated pieces (সূত্রঃ Science Philosophy and religion by Muhammad Ruhul Amin, Page 21)

[ভাবানুবাদ ঃ কোন বস্তুর দৃশ্য সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণের স্তর দ্বারা। পর্যবেক্ষণের স্তর মানব-নির্ভর। মানবই এটা তৈরী করে। কিন্তু প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণের নানা স্তর নেই। প্রকৃতিতে রয়েছে একটি বিরাট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্য এমন একটি স্তরে যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এর কারণ হলো মানুষের মগজের গঠন, যা কোন বস্তুর চিত্রকে তার মগজে তার ইচ্ছামাফিক কুঠুরিতে বিভক্ত করে এবং বিচ্ছিন্ন টুকরা টুকরা খণ্ড বানায়।" চার্লস ইউজিন গাই বলতে চান যে, কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র মানুষের মগজ ধারণ করতে অক্ষম। মানুষের মগজ একটি জিনিসকে টুকরা টুকরা করে পর্যবেক্ষণ করে। মানুষের মগজ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে, সামগ্রিকভাবে কোন কিছু পর্যবেক্ষণে অক্ষম।

পদার্থে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Le Comte du Nouy বলেন ঃ "Expressions such as 'scientific truth' should only be taken in a very limited sense and not literally, as the public so often does. There is no scientific truth in the absolute sense. The phrase 'Ad veritatem per scientihm is an absurdity." (অনুবাদ ঃ 'বৈজ্ঞানিক সত্য'-এ ধরনের মন্তব্যকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা উচিত এবং আক্ষরিক অর্থে নয়, যা জনসাধারণ সাধারণতঃ করে থাকে। শর্তহীন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই")।

বিজ্ঞানীএডিংটন বলেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হোল বহু আয়তনবিশিষ্ট বাস্তবতার চার আয়তনবিশিষ্ট মূর্তি (সূত্র ঃ Science Philosophy and Religion- মুহাম্মদ রুহুল আমিন, পৃষ্ঠা-২৫)

J. L. Goodall তাঁর "An Introduction to the philosophy of Religion" গ্রন্থে অন্যগ্রহ থেকে আসা এক কাল্পনিক আগন্তুক কর্তৃক পৃথিবীর রেলওয়ে ব্যবস্থা পর্যবক্ষেণ করে "The Natural Railway Law" (প্রাকৃতিক রেল মতবাদ) নামক আজগুবি থিওরি প্রদানের হাস্যাস্পদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। বৈজ্ঞানিকগণও একই বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন।

www.pathagar.com

Myerson তাঁর "Introduction to the Reality and Determinism in Quantum Physics" গ্রন্থে লেখেন ঃ

"Although scientific knowledge can advance indefinitely, it must by its essential character be limited and partial".

(**অনুবাদ ঃ** যদিও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনির্দিষ্টভাবে উন্নতি করতে পারে, তবু এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটা অবশ্যই হবে সীমাবদ্ধ ও আংশিক")। আইনস্টাইনও তেমনিভাবে "Out of my later years" লেখায় বলেন, "We face, therefore, the limits of a purely rational conception of our existence" (অনুবাদ ঃ আমাদের অবস্থানের সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী ধারণার সীমারেখার সম্মুখীন আমরা)।

Hoimer Von Ditfurth নামে এক বৈজ্ঞানিক লেখক লিখেছেন ঃ "Since Einstein we have to live with the truth that we will never be able to understand completely the universe because the innate structure of our brain is inadequate to do so . . We have learned that we are both short lived witnesses of and participants in an evolutionary process embracing all nature that has been going on over billions of years. The system produced in this way of ever increasing complexity and beauty are also irrevocably passing beyond our capacity for rational understanding" (সূত্র : Science Philosophy and Religion")

অনুবাদ ঃ হুইমার ভন ডিটফার্থ লিখেন: আইনস্টাইনের সময় থেকে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, আমরা কখনই বিশ্বকে পুরাপুরি বুঝতে সক্ষম হব না, কারণ আমাদের মগজের সহজাত গঠন অপর্যাপ্ত তা করতে। . . . আমরা জানি যে সামগ্রিক প্রকৃতির বিকাশের ধারায়, যা কোটি কোটি বছর ধরে চলছে, আমরা একাধারে স্বল্পায়ুধারী সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারী।এভাবে যে জটিলতা ও সৌন্দর্যের মাঝে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা আমাদের মানবিক ধ্যান-ধারণার বোধগম্যতা অতিক্রম করছে]।

স্যার আর্থার এডিংটন লিখেন–

"The physicist now regards his external world in a way which I can describe as more mystical than that which prevailed some years ago" (অনুবাদ ঃ কয়েক বছর পূর্বে পদার্থবিদগণ যা ভাবত তাকে পরিত্যাগ করে বর্তমানে তারা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে যা ধারণা করে, তাকে আমি এভাবে বলতে পারি যে, এটা এখন আরো গূঢ় রহস্যময়)।

www.pathagar.com

A, Cracy Morrison (এ ক্র্যাসি মরিসন) নামে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন যে, অলংঘনীয় গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্ব একজন 'সুপারহিউম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিয়াস (প্রকৌশলী প্রতিভাবান অতিমানব) দ্বারা পরিকল্পিতএবং পরিচালিত।

"Evidence of god in an expanding universe" গ্রন্থে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওলজির প্রফেসর Edward Conklin মন্তব্য করেন যে, জীবনের সূত্রপাত হঠাৎ আকস্মিকভাবে কতগুলো বস্তুর সংমিশ্রণে হয়েছে এমন সম্ভাবনা এত কম যেমন কোন মুদ্রণ প্রেসে একটি শব্দ বিস্ফোরণের পরে একটি সুসম্পাদিত ও সংক্ষিপ্ত অভিধান তৈরী দ্রব্য হিসাবে বেরিয়ে আসা।

বিজ্ঞানের গালভরা বুলি সত্ত্বেও অনিশ্চয়তাবাদ (The Uncertainty Principle) বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে রশি টেনে ধরেছে। এখন খোদ ডঃ হকিং এর চিন্তাতে অনুধাবন করুন। হকিং বলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্কুইস দ্যা লাপ্লাস (Marquis De Laplace) যুক্তি দেখিয়েছিলেন– মহাবিশ্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণীয় (বৈজ্ঞানিক নিয়তিভিত্তিক -deterministic)। লাপ্লাসের প্রস্তাবনা ছিল, এমন এক গুচ্ছ বৈজ্ঞানিক বিধি থাকা উচিত যার সাহায্যে মহাবিশ্বের যে কোনো এক সময়কার অবস্থা যদি সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে মহাবিশ্বে কি ঘটবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। উদাহরণ ঃ সূর্য এবং গ্রহগুলির যে কোনো একসময়কার দ্রুতি (positions) এবং অবস্থান যদি জানা থাকে, তাহলে নিউটনের বিধিগুলির সাহায্যে সৌরতন্ত্রের অন্য যে কোনো সময়কার অবস্থা গণনা করে বলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে নির্ধারণীয়তাবাদ (determinism) বেশ স্পষ্ট। কিন্তু লাপ্লাস আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অনুমান ছিল, অন্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, এমনকি, মানবিক আচরণ সম্পর্কেও এই ধরনের বিধি রয়েছে।

..... লাপ্লাসের স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানের এমন একটি তত্ত্ব– মহাবিশ্বের এমন একটি প্রতিরূপ যা হবে সম্পূর্ণ নির্ধারণযোগ্য ceterministic)। মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থানই যদি নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুলভাবে বলা অসম্ভব। এই পরিস্থিতি লাপ্লাসের স্বপ্নের অন্তিম অবস্থারই ইঙ্গিত। . . . ঊনিশ শ' কুড়ির দশকে হাইজেনবার্গ, এরভিন শ্রয়েডিংগার এবং পল ডিরাক বলবিদ্যার পুনর্গঠন করে কণাবাদী বলবিদ্যা (Quantum mechanics) নামক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন তত্ত্বের ভিত্তি হল অনিশ্চয়তাবাদ (uncertainty)।

www.pathagar.com

সাধারণত কণাবাদী বলবিদ্যার (Quantum mechanics) ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি পর্যবেক্ষণের একক সুনিশ্চিত ফল থাকে না। তার বদলে সে ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকে অনেকগুলি পৃথক পৃথক (different) ফলশ্রুতি। তাছাড়া থাকে ফলগুলির প্রতিটির কতটা সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ কেউ যদি বহু সংখ্যক সমরূপতন্ত্রের (similar system) একই মাপ নেন এবং তাদের প্রতিটি যদি একইভাবে শুরু হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে পাবেন বিশেষ সংখ্যক ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে ক ভিন্ন আর কিছু ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে খ এবং এই রকম (and so on)। কতবার ফল ক কিম্বা খ হবে, সে সম্পর্কে একটা আসন্ন (approximate) সংখ্যা ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকতে পারে। কিন্তু একক একটি মাপনের বিশেষ ফল (specific result) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। সুতরাং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছে ভবিষ্যদ্বাণী করার অসম্ভাব্যতা কিম্বা একটা এলোমেলো অনিশ্চিত অবস্থা (randomness)।" (A BRIEF HISTORY OF TIME. পৃষ্ঠা: ৫৭-৬০)।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটা যেমন পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে খাটে, তেমনি জ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও। নইলে স্টিফেন হকিংকে ১৯৬৩ সালে তাঁর মোটর নিউরন ব্যাধির (যাকে এ, এল, এস ব্যাধিও বলা হয়) জন্য ডাক্তার বলেছিলেন যে, তিনি আর দু'ছর বাঁচবেন। স্টিফেন নিজেই বলেন, "আসলে যে ডাক্তার আমার রোগ নির্ণয় করেছিলেন, তিনি আমার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন করবার মতো আর কিছু নেই।" হকিং বলেন, "কিন্তু আমি মরিনি"। (সূত্র : "কৃষ্ণ গহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা", স্টিফেন ডব্লু হকিং' পৃষ্ঠা ১৫৪ ও ২২)। স্টিফেন হকিং বর্তমান বছর ২০০০ সনে এখনও আরও ৩৭ বছর বেঁচে আছেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তিনি কখনই জনক হতে পারবেন না। অথচ তিনি বিবাহ করেছেন ও তিন সন্তানের জনক হন। তিনি প্রথম স্ত্রী পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রীও গ্রহণ করেছেন। মাইকেল হোয়াইট ও ড: জন গ্রিবিন লেখেন, "Most people believed that medical predictions were correct and that Hawking had a very short time to live" (page 63)

(অনুবাদ ঃ বেশীরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে, চিকিৎসা ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক এবং হকিং আর অল্প দিন বাঁচবেন (পৃঃ ৬৩)। ১৯৮৫ সালে জেনেভার "সার্ন" নামক আণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যান তিনি। হঠাৎ তাঁর নিউমোনিয়া হলো যা মোটর নিউরন ব্যাধিতে হয়ে থাকে ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। স্টিফেন বলেন, আমার নিউমোনিয়া হল। ফলে আমাকে তড়িঘড়ি করে

www.pathagar.com

হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জেনেভার হাসপাতাল আমার স্ত্রীকে বলল, জীবন রক্ষার যন্ত্রটা চালিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজি হলেন না। আমাকে বিমানে করে কেম্ব্রিজে এ্যাডেন ব্রুকস্ (Adden brooks) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে রজার গ্রে (Roger Grey) নামক একজন সার্জেন আমার উপর ট্রাকিওস্টমি অপারেশন করেন। এই অপারেশনে আমার জীবন বাঁচল কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর চলে গেল। (সূত্র ঃ কৃষ্ণ গহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা, পৃষ্ঠা ১৪৬)

উপরোক্ত তথ্য থেকে কি প্রতিপন্ন হয়? ডাক্তার বৈজ্ঞানিকগণ হকিং-এর জীবনের আশা ও তাঁর জনক হবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা কি ঠিক হয়েছে? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীর যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, হকিং-এর বেঁচে থাকা ও জনক হওয়া তাই প্রমাণ করে। মানুষ নিজেকে যতবড় জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মনে করুক, সে সীমাবদ্ধতার বেড়ায় আটকা। তাহলে আমরাই বা কেন হকিং-এর ঈশ্বর সম্পর্কে সব তথ্য, তত্ত্ব, মন্তব্য ও কটাক্ষ বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করব?

বর্তমানে পদার্থবিদগণ "Grand Unified Theory" (মহা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব) আবিষ্কারে রত। ড: হকিংও সে কোশেশ করে চলেছেন। এটা ভালো কথা। এ আবিষ্কারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হলে কারো আপত্তির কিছু নেই। তবে এটা আবিষ্কার হলে ধর্ম, ঈশ্বর, দর্শন সব শেষ হয়ে যাবে, হকিং ও কোন কোন পদার্থবিদের এ ধরনের ধারণা যথার্থ নয়। তাছাড়া খোদ হকিং তো বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

"I am still trying to understand how the universe works, why it is the way it is and why it exists at all. I think there is a reasonable chance that we may succeed in the first two aims, but I am not so optimistic about finding why the universe exists." (Michael white and John gribbin, Page 291) .

অনুবাদ ঃ আমি এখনও জানার চেষ্টা করছি কিভাবে মহাবিশ্ব চলে, কেন মহাবিশ্ব এভাবে চলছে এবং কেন এটা আছে। আমি মনে করি, আমাদের সফলকাম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে প্রথম দু'টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে। কিন্তু আমি খুব আশাবাদী নই এটা পেতে যে, কেন মহাবিশ্ব আছে"। (মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা-২৯১)।

ভালো কথা, পদার্থবিদগণ চেষ্টা করছেন জানার জন্য যে, কিভাবে মহাবিশ্ব চলে, আর কেন এ ভাবেই চলে। তবে তৃতীয় উদ্দেশ্য কেন মহাবিশ্ব আছে, কেন

www.pathagar.com

এ মহাবিশ্ব, কেন মানুষ, কেন জীবজন্তু, কেন এত সব– এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না বিজ্ঞানের গবেষণাগারে। ড: হকিং নিজেই এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। তাহলে মানুষের কি প্রচেষ্টা থেমে গেছে এ প্রশ্ন জানার। এ প্রশ্নের উত্তর জান্‌তে তো মানুষ আদিকাল থেকেই আগ্রহী। কেন আমরা এখানে? কেন এই মহাবিশ্ব?

পদার্থবিদ্যা যদি এ প্রশ্নের জবাব নাই দিতে পারে, অন্যরা কেন চেষ্টা করবে না। আমরা যদি এ প্রশ্নের জবাব না জানি, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই তো থাকে না। আমরা কি গরু-ভেড়ার মত জীবন যাপন করে মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, না জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে?

ড: হকিং যে তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তা নিয়ে পদার্থবিদদের চিন্তা-ভাবনায় কোন দোষ নেই। তবে অন্যরা কেন চিন্তা-ভাবনা করবে না? দর্শন, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), ধর্মতত্ত্ব, ইসলাম, কোরআন-হাদীস, রাসূলগণ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ড: হকিং-এর তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। জবাব আমরা পেয়ে গেছি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে।

কোরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই।" (৩৮ সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ২৭)।

"আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের মাঝে কোনো কিছুই আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই তা করতাম, আমি তা করিনি। বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি; মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই আর তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১৬-১৮)।

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, আর দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে সেই বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য"।

(৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯০)।

"আমার দাসত্বের জন্যই আমি মানুষ ও জীনকে সৃষ্টি করেছি।"

(৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৬)

"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বলেন, 'আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো

www.pathagar.com

আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, 'আমি জানি যা তোমরা তো জান না এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।"(২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩০-৩১)।

মহাবিশ্ব ও মানুষ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তার জবাব পুরাপুরি জানা গেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞান যা বলতে পারে নাই, তাই আমরা অন্যত্র পেয়েছি। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক।

"এরিস্টটলের পদার্থবিদ্যা, টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্যালেনের চিকিৎসা শাস্ত্র আজকের বিজ্ঞানের সাথে কতটুকু অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে? এ্যারিস্টটলের দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থ (Physics ও On Heaven) সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এই দু'ইটি বইয়ে লিখিত একটি বাক্যও আজ আর সময়োপযোগী নয়।" (আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম, রূপান্তর ইফতেখার ইকবাল, আমান পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃঃ ৬০)

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল প্রচার করেন, পৃথিবী শক্ত ও মজবুতভাবে মহাবিশ্বের মাঝখানে স্থির ও অনড় হয়ে বসে আছে, আকাশ হলো একটি নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ এবং অপরিবর্তনশীল সৃষ্টি (Perfect sky)। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি (১০০-১৭৮ খৃষ্টাব্দ) এর মতেও বিশ্ব সংসারের কেন্দ্রস্থল হলো এই পৃথিবী; স্থির ও অনড়। Ian Ridpath বলেন, For nearly 1500 years after ptolemy, astronomy in Europe, entered a period of total eclipse— the Dark age," (Stars and Planets)।

নিকোলাস কোপার্নিকাশ সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা পেশ করলেন। একে বলা হলো হেলিও সেন্ট্রিক তত্ত্ব (Helio-centric theory)। ১৫৪৩ সালে মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত তার On the Revolution of the Celestial Spheres এ তিনি বলেন, As if seated upon a royal throne, the sun rules the family on planets as they circle round,। রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রচারিত পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাটির বিরোধিতা করায় গির্জা অসন্তুষ্ট হোল। মার্টিন লুথার ব্যঙ্গ করে বললেন, "The fool wants to turn whole science of Astronomy upside down." (অনুবাদ ঃ বোকা জ্যোতির্বিদ্যাকে উপুড় করে ফেলতে চাইছে।)

টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe 1546-1601) ১৫৭২ সালে বললেন যে, কোপর্নিকাস যে বলেছেন– সূর্য স্থির। তা নয়– সূর্যও ঘুরছে। জোহান্স ক্যাপলার

www.pathagar.com

(১৫৭১-১৬৩০) যদিও টাইকোকে প্রথম দিকে স্বীকৃতি দিলেন কিন্তু পরে তিনি তাকে বাদ দিয়ে কোপার্নিকাসকে সমর্থন করলেন। গ্যালিলিও ১৬০৯ সালে উন্নত টেলিস্কোপের দিয়ে বললেন, মহাবিশ্বে স্থির বলতে কিছুই নেই। ১৬৮৭ সালে নিউটন প্রমাণ করলেন যে, সৃষ্টিতে কোথাও কোন বস্তু স্থির নয়, প্রতিটি নিরন্তর গতি নিয়ে চলছে।

উপরে দেখা গেল বিজ্ঞান এক স্থানে বসে থাকে নাই। মত ও তত্ত্বের পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানের এ হলো সীমাবদ্ধতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে, কুরআন সেই ৭ম শতাব্দীতে বলছে "সূর্য তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত ব্যবস্থা।" (৩৬ ঃ ৩৮)। " তিনি (আল্লাহ্) চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত" (৩১ ঃ ২৯)। "আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস, চন্দ্র ও সূর্য; প্রত্যেকেই নিজনিজ কক্ষপথে সঞ্চালনশীল।" (২১ ঃ ৩৩)। "সূর্যের সাধ্য নাই চন্দ্রকে সীমার মধ্যে পায়, রাত্রির সাধ্য নাই দিবসকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমান" (৩৬ ঃ ৪০)। ১৩ ঃ ২, ৩৫ ঃ ১৩ ও অন্যান্য আয়াতেও এমনি বক্তব্য রয়েছে।

কুরআন বলে- "এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতির্ময় আর সূর্যকে করেছেন প্রদীপ্ত উজ্জ্বল।" (৭১ ঃ ১৬)।" কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন দুর্গ এবং ওর মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রদীপ সদৃশ্য সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র" (২৫ ঃ ৬১)। একটি বিকিরণ করে অন্যটি প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিকগণ জেনেছে টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতকের দিকে। Ian Ridpath বলেন, "Astronomers of the time did not know the true nature of the stars nor did they realise that planets are non luminous bodies like the earth that shine by reflecting sunlight. This fact did not emerge until after the invention of telescope in 17th centuries" (Stars and Planets).

সূর্যসহ তারকারাশির মহাযাত্রা সম্পর্কে হ্যান বেস্ট বলেন, "All the local stars, including sun are heading in the direction of the constellation cygnus" (The Frame Work of the stars, Nigel Henbest)।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্তে। এ ক্ষেত্রে কুরআনে এসেছে স্বয়ং স্রষ্টা থেকেই জ্ঞানের কিছু যা মানুষ পূর্বে জানত না। এটিও স্রষ্টার প্রমাণের একটি দলিল ছাড়া আর কি? নইলে ৭ম শতাব্দীতে একজন নিরক্ষর নবীর মুখে এসব জ্ঞানের কথা, এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য কোন জায়গা থেকে এল?

www.pathagar.com

জার্মান বিজ্ঞানী Reinhard Breuer বলেন, To my mind, either god must guide us in accordance with our laws so that we can understand Him or He must improve our knowledge and make us as wise as He is, so that we can understand Him. we must not think, howeuer, that god shares our views," (কাজী জাহান মিয়া কর্তৃক "আল কোরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ / মহাকাশ পর্ব-১, ২৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

Ian Ridpath লেখেন, "It would be foolish to think that we have final answers to . . . questions . . .. of the universe ... But, in say 50 years, our ideas may be completely different. In centuries to come, our present views of cosmology may seem as naive as those of the ancient greeks do to us" (The Stars and Planets)।

১৯৪৮ সালে থমাস গোল্ড, হারম্যান বন্ডি, ফ্রেড হোলি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের 'স্টেডিস্টেট তত্ত্বে" বলা হয় যে, মহাবিশ্বের কখনও কোন আরম্ভ ছিল না, এ শুধু অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে আপন হতে পদার্থ তৈরী হত এবং তা মহাবিশ্বের শূন্যস্থানকে ভরে দিত। আর এরূপ হত বলেই সকল সময় আমরা সৃষ্টিকে একইরূপে ও অপরির্তনশীল দেখতে পাই যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দৃশ্যপটে দৃশ্যতঃ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। (Ian Ridpath, Stars and Planets)। এই তত্ত্ব ১৯৫০ হতে ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে হতে ১৯৬৫ এর দিকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। বিজ্ঞানের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে এই তত্ত্বের করুণ পরিণতি। এই তত্ত্বের লোপাটে এটি এখন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণের সহায়ক হয়ে পড়েছে। মহাবিশ্ব যে সৃষ্ট বস্তু তাই প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু সৃষ্টিটা করল কে? মহাবিশ্ব তো আর স্বয়ম্ভু নয়।

"মানুষের জ্ঞান ততখানি পুরোপুরি বৈধ যতখানি সে পর্যবেক্ষণ থেকে অর্জন করছে। এবং সেই পর্যবেক্ষণের সত্যতার ওপর তার যুক্তির দৌড় নির্ভর করে। অথচ প্রকৃতির সত্যের অনেক কিছুই মানব যুক্তির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

অবরোহ (Inductkive nethod) দিয়ে অবরোহকে প্রমাণ বা যাচাই করা যায় না। অবরোহ 'কিছু' থেকে 'সবগুলো' সম্বন্ধে অনুমান করে। ফলে জগতের সম্ভাব্য *সব অবরোহের* সত্যতা যাচাই করতে হলে আমাদেরকে তাদের 'কিছু' সংখ্যক থেকেই সবগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যা হয়ে যাবে অসম্পূর্ণ অর্থাৎ *আমরা বলতে পারি : অবরোহ পদ্ধতি বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধান দেয় না*

www.pathagar.com

সুতরাং, যেহেতু পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞানের একমাত্র উপায় হলো অবরোহ পদ্ধতি, এবং যেহেতু *অবরোহের বৈধতা* সীমিত, সেহেতু মানব জ্ঞানের দৌড়ও সীমিত।

কিন্তু এ তো গেল মানব জ্ঞানের দৌড়, আমাদের সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হলো মানুষের *যুক্তির দৌড়।*

তবে তার আগে দেখা যাক মানুষের জানার (অর্থাৎ জ্ঞানের) সীমাবদ্ধতা কেমন ধরনের। অর্থাৎ আমরা জানব মূলত মানুষের জানার *যোগ্যতার* সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাদের একটির যে ক্ষমতা আছে অন্যটির তা নেই। যেমন– আমরা বাতাসকে *অনুভব* করতে পারি, কিন্তু *দেখতে* পারি না। আমরা আলোকে *দেখতে* পারি, তবে *অনুভব* করতে পারি না (যদি তার সাথে অনুভবযোগ্য তাপ না থাকে)। আমরা মিষ্টি কী তা *আস্বাদন* ক'রে বুঝতে পারি, কিন্তু *ছুঁয়ে* দেখে বুঝতে পারি না।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলির একটির সীমাবদ্ধতাকে অন্যটির ক্ষমতা দ্বারা কিছুটা পূরণ করা যায়। কিন্তু তার পরও সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যায় না। কিছু জিনিস আছে যা শুধু যুক্তি দিয়েই বুঝা যায়– ধরা– ছোঁয়া বা আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু এই যুক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে।

Perpetual machine বা শাশ্বত যন্ত্রের কথাই ধরা যাক। বহুকাল যাবত উদ্ভাবকগণ এমন একটি মেশিন উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন যাকে একবার বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে চালু করে দিলে তা চিরকাল চলতে থাকবে আর কোনো শক্তির প্রয়োজন হবে না। নিউটনের গতিবিষয়ক প্রথম সূত্র (সূত্রটি হলোঃ বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল এবং আপেক্ষিক অর্থে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চাইবে। সূত্রটি মূলত গ্যালিলিওর) বলে যে তা নীতিগতভাবে সম্ভব। অথচ বাস্তবে এমন মেশিন *তৈরি* করা আদৌ সম্ভব নয়। ১৬১৮ সালে ইংরেজ ডাক্তার রবার্ট ফ্লাড (Robert Fludd, ১৫৭৪-১৬৩৭) এরূপ একটি মেশিন তৈরিও করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তারপর অনেকেই চেষ্টা করেছেন কাজটি করতে, কিন্তু কেউই সফল হননি। এখন অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে, এরূপ মেশিন সম্ভব নয়। কারণ, মেশিনটি গতিশীল হলে যে ঘর্ষণ উৎপন্ন হয় তা-ই উক্ত গতিকে থামিয়ে দেয়। অর্থাৎ ঘর্ষণের কাজে কিছু শক্তি খরচ হতে থাকে। দেখুনতো এমন মেশিনের কথা মানুষ ভাবতে পারে অথচ সে তা তৈরি করতে পারেনা। এখানে

www.pathagar.com

ভাবতে পারাটাও যুক্তিসঙ্গত এবং বানাতে না পারাটাও যুক্তিসঙ্গত। তাহলে কী লাভ হলো যুক্তি দিয়ে? তা তো মানুষের যোগ্যতাকে ভাবনার স্তরে এনে দিতে পারল না।" (এস এম জাকির হুসাইন, সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ২১-২৪)।

এস এম, জাকির হুসাইন তাঁর "সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!" গ্রন্থে আরও লেখেন ঃ "বিখ্যাত বৃটিশ পদার্থবিদ এবং গণিতবিদ Roger Penrose (যিনি Stephen Hawking এর বন্ধুও) স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, এমনও ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে সবকিছু নির্ধারিত (deterministic) এবং যৌক্তিক, অথচ তার সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না।

মানুষের অযোগ্যতার এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়; মানুষের যোগ্যতার কিছু কিছু সীমাকে তার যুক্তি অনেকাংশে অতিক্রম করে যেতে পারে। যেমন, ১,২,৩,৪, . . . অসীম পর্যন্ত সংখ্যাগুলির একটির সাথে অপরটির যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ করে যত সংখ্যা পাওয়া যায় তা গুণে কেউ শেষ করতে না পারলেও প্রমাণ করা যায় যে, তা *গণনাযোগ্য* (denumerable)।

মানুষের ক্ষমতার একটা বড় সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইসেনবার্গ (১৯০১-১৯৭৬), যা তাঁর বিখ্যাত অনিশ্চয়তা নীতি বা Uncertainty Principle নামে পরিচিত। এই নীতির মূল কথা হলো; কোনো একটি গতিশীল কণার (যেমন ইলেকট্রনের) অবস্থান (position) এবং গতিবেগ (velocity) *একই সাথে* নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। প্রথমটিকে নির্ভুলভাবে মাপতে গেলে দ্বিতীয়টির পরিমাপে ত্রুটি থাকবে এবং বিপরীতক্রমে। তিনি এই বিষয়টিকে গাণিতিকভাবে এক ধরনের ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী পালাবদল ঘটিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল এবং ১৯৩২ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মূলত তাঁরই অগ্রজ সহকর্মী ডেনমার্কের পদার্থবিদ নীলস্ বোরের (Neils Bohr, ১৮৮৫-১৯৬২, নোবেল পুরস্কার পান ১৯২২ সালে) *complementarity-র* বা *প্রতিপূরকতার* ধারণাটির একটি বিশেষ দিক। তাঁর এই ধারণার মূল কথা হলো ঃ কোনো একটি সিস্টেমের একটি দিককে নির্ভুলভাবে জানতে গেলে তার অপর একটি সম্পৃক্ত দিককে নির্ভুলভাবে জানা যায় না। তিনি পদার্থবিদ-বিশেষত পারমাণুবিদ-হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই ধারণাকে শুধু পরমাণুর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি। উদাহরণস্বরূপ,

www.pathagar.com

তিনি নিজেই বলেছেন যে, সত্য (truth) এবং স্পষ্টতা (clarity) হলো complementary বা প্রতিপূরক; অর্থাৎ সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গেলে তা আর পুরোপুরি সত্য থাকে না। আবার তাকে পুরোপুরি সত্য রাখতে হলে তার বর্ণনা হয়ে যাবে কিছুটা ঝাপসা বা অস্পষ্ট। (দেখুন Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory, Vintage, 1993, বার্ট্রান্ড রসেলও (১৮৭২-১৯৭০) একই মন্তব্য করেছিলেন ঃ স্পষ্টতা সর্বদাই শুদ্ধতার শত্রু (Mysticism and Logic, Routbledge, 1994, p.78) যেকোন চিন্তাবিদই তাঁর মনের কথাটিকে ভাষায় প্রকাশ করার সময়ে এ কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পান।

দৈনন্দিন জীবন থেকে এরূপ অনেক ঘটনাযুগলকে দেখানো যায়। এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য উদাহরণ হলো perspective পরিপ্রেক্ষিত। ছবি আঁকতে গিয়েই মানুষ এ ধারণাটিকে বেশি ব্যবহার করেছে- এবং বহু আগে থেকেই এটি মানুষের জানা ছিল। পরিপ্রেক্ষিতের সর্বপ্রথম সার্থক বিস্তারিত জ্যামিতিক আলোচনাও করেছিলেন একজন চিত্রকর- লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। এই ধারণাটির বিশ্লেষণ পুরোপুরি জ্যামিতিক-নির্ভর। এর সাথে পরিচিত না হলে কোনো ছবি আঁকাই সম্ভব নয়। এর সহজ বর্ণনা হলো এরূপ ঃ আপনি কোনো একটি জিনিসকে (যেমন ভবনকে) স্পষ্টভাবে দেখতে চাইলে তার সমগ্রকে দেখতে পাবেন না এবং বিপরীতক্রমে, তার সমগ্রকে দেখতে চাইলে তাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন না। অর্থাৎ কথাগুলিকে একটি অট্টালিকার উদাহরণের ওপর উপরিপাতন করে বলা যায়, আপনি যদি অট্টালিকার পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যটি দেখতে চান, তাহলে আপনাকে তা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে, যখন আপনি তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে দেখতে পাবেন না। আবার আপনি যদি তার কক্ষ, দরোজা, জানালা, চিত্রকর্ম ইত্যাদি জিনিসগুলি দেখতে চান, তাহলে আপনাকে তার খুব কাছে যেতে হবে এবং ফলে আপনার পক্ষে আর তার সমগ্র ছবিটি দেখা সম্ভব হবে না। এই কারণে ছবিতে দূরের কোনো জিনিসকে ছোট এবং কাছের জিনিসকে বড় করে দেখানো হয়।

এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিষয় হলো, *অট্টালিকাটি যত বড় হবে, তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে আপনাকে যেতে হবে তত দূরে।* অংশকে দেখতে হলে সব অট্টালিকার ক্ষেত্রে সমান নৈকট্য যথেষ্ট, অথচ পূর্ণাঙ্গকে দেখাই যত সমস্যা।

মানুষের মাপার (এবং জানার, কারণ বিজ্ঞানে জানার *একমাত্র* উপায় হলো মাপা) এই সীমাবদ্ধতা থেকেই বুঝা যায় যে তা আসলে শুধু সীমাবদ্ধ নয়,

www.pathagar.com

স্থিরও বটে। এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে *এই সৃষ্টিজগৎকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে গেলে তা থেকে কত দূরে যেতে হবে?* কিন্তু আমরা কি সৃষ্টিজগৎ থেকে আদৌ বাইরে যেতে পারি? পারি না বলেই আমাদের পক্ষে এর *উৎসের রহস্য* অন্তত বিজ্ঞানের দ্বারা কোনো দিনও জানা সম্ভব নয় তাছাড়া কোনো কিছুর মধ্যে থেকে তার সমগ্র দেখা আদৌ সম্ভব নয়, অংশের মধ্যে সমগ্র থাকলেও। অংশের মধ্যে সমগ্র থাকলেও ঐ সমগ্রের উৎস উক্ত অংশের মধ্যে নেই। ফলে সৃষ্টিরহস্যের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আসা সম্ভব যুক্তি থেকে, বিজ্ঞান থেকে নয়।

কিন্তু তার জন্য আগে জানতে হবে যুক্তি কেন কাজ করে, কখন করে এবং কখন করে না। এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়– যুক্তি এজন্য কাজ করে যে, তা *স্বয়ংসম্পূর্ণ।* কিন্তু *স্বয়ংসম্পূর্ণতা* আসলে কী? যা স্বয়ংসম্পূর্ণ তা কি মানবীয় দৃষ্টিতে *অসীম* হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে এই বইতে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে।

আরেকটি সহজ অথচ চমৎকার বিষয় নিয়ে এখন ভাবা যায়; আমরা সেই জিনিসটিকে কিভাবে ছবিতে আঁকি যা এত দূরে আছে যে আমরা তাকে দেখতেই পাই না? তাকে আমরা একদম আঁকিই না। অথচ তার পরও আমরা ছবিটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবি।

বিশ্বজগৎকে আমরা কেউ দেখি না, দেখি আমাদের মন ও যুক্তির মধ্যে তার অংকিত ছবি। সেই ছবিতে যা নেই তাকে আমরা আর স্বীকার করতে চাই না। এটা হলো মানুষের সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা।" (পৃঃ ২৬–২৮)।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, দর্শন বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য শাখাসমূহের সীমাবদ্ধতা নেই। আসলে মানুষের জ্ঞানই সীমাবদ্ধ। একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহর জ্ঞানই হলো সীমাহীন।

সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ও কোরআন মজীদ

হকিং তাঁর বইয়ের ৯ পৃষ্ঠায় Edwin Hubble (এডউইন হাবল)-এর মতামত বিধৃত করেছেন। ১৯২৯ সালে হাবল বললেন যে, সুদূরের ছায়াপথসমূহ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অন্য কথায় বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রথমে কাছাকাছি ছিল। দশ বা বিশ হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে আকাশ মণ্ডলীর সবকিছু একই স্থানে ছিল ও তাদের ঘনত্ব ছিল অসীম। হাবলের পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দিল যে, এক সময়ে অর্থাৎ 'বিগ ব্যাংগ' (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ) নামক সৃষ্টির প্রাথমিক সময়ে যখন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব

www.pathagar.com

সৃষ্টি শুরু হল, তখন মহাবিশ্ব অপরিমেয় ক্ষুদ্র ও বিশালভাবে ঘন ছিল। ড: হকিং লিখেন ঃ

"Hubble's observations suggested that there was a time called the big bang, when universe vas infinitesimally small and infinitely dense"

হকিং-এর জীবন লেখেন মাইকেল হোয়াইট ও ড: জন গ্রিবিন তাঁদের "স্টিফেন হকিং এ লাইফ ইন সায়েন্স" গ্রন্থে লেখেন: "And if galaxies are getting apart, that means that long ago they must have been closer together. How close could they ever have been? What happened in the time when galaxies must have been touching one another and before then?" (page 34) [অনুবাদ: এবং যদি গ্যালাক্সিসমূহ পৃথক হয়ে যাচ্ছে এমন হয়, তাহলে বহু পূর্বে এগুলো একত্রে ছিল। কত কাছাকাছি সেগুলো ছিল? তখন কি অবস্থা ছিল? যখন গ্যালাক্সিসমূহ একে অন্যকে স্পর্শ করত এবং তারও আগে? (পৃষ্ঠা ৩৪)]

উপরের অনুচ্ছেদে যা বর্ণিত হয়েছে কোরআন মজিদ থেকে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি হাজির করা যেতে পারে। অনেক বছরের গবেষণা করে উপরের মন্তব্যে পৌঁছেছেন বৈজ্ঞানিকগণ। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), যার মুখ দিয়ে কোরআনের বাণী নির্গত হয় ১৪শ বছর পূর্বেই লেবরিটরিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করেছেন। কোরআন বলে ঃ

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুকি ওরা বিশ্বাস করবে না? আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে এদিকে বা ওদিকে ঢলে না যায়, আর আমি ওর মধ্যে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। আর আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ, তবু ওরা তার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকেই নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০-৩৩ আয়াত)।

উপরের তিনটি আয়াতে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব তত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিক প্রদান করলে এর প্রতিটির জন্য বৈজ্ঞানিককে পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা যায়। সমগ্র কোরআন মজীদে ধর্মের কথার ফাঁকে

www.pathagar.com

ফাঁকে এরূপ বিজ্ঞানের বহু মৌলিক তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে। এসবের ব্যাখ্যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী সৃষ্টির শুরুতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি, যাকে বলা হয় নীহারিকা। এই নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এইসব খণ্ড ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, পৃথিবী ও বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের জন্ম হয়। মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন বলেন, "For must of billion your hrotons, nutions and etctrons hour Iron bound up in tors and glaxis formed out of this frimend tugg as graving hulled clruds of ges to gether un pace" (page 86)

[**অনুবাদ ঃ** মহাকর্ষীয় শক্তি গ্যাসের মেঘকে টেনে মহাশূন্য একত্র করলে, গত ১৫ বিলিয়ন বছরের বেশী সময় ধরে প্রটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনসমূহ একত্রিত হয়ে তারকারাদি ও গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি হয় াদিম, প্রাথমিক পিণ্ড থেকে [পৃষ্ঠা ৮৬)]

মাইকেল হোয়াইট ও ড: জন গ্রিবিন বলেন, "For most of the fast 15 billion years, protons, neutrons and electrons have been bound up in stars and galaxies formed out of this primeval stuff as gravity fulled clouds of gas together in space" (page 86)

[**অনুবাদ ঃ** মহাকর্ষীয় শক্তি গ্যাসের মেঘকে টেনে মহাশূন্যে একত্র করলে, গত ১৫ বিলিয়ন বছরের বেশী সময় ধরে প্রটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনসমূহ একত্রিত হয়ে তারকারাজি ও গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি হয়, আদিম, প্রাথমিক পিণ্ড থেকে। (পৃষ্ঠা- ৮৬)]।

মরিস বুকাইলী লেখেন, "মহাবিশ্ব যে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অধুনা এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। তবে, কিভাবে যে মহাবিশ্বের সেই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে এখনো ইতস্তত কিছু কিছু মতভেদ রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন-পরিচিত আপেক্ষিক থিওরিতে প্রথম উল্লেখিত হয়। যে সব পদার্থবিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোক-রশ্মির বর্ণালীবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় নিরত ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাও মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টা সমর্থন করেছেন

www.pathagar.com

তাঁরা দেখতে পান যে, বিভিন্ন ছায়াপথের বর্ণালীবিভা ক্রমান্বয়ে লাল বর্ণের রূপ ধারণ করছে। এর থেকে তাঁরা এই ধারণায় পৌঁছান যে, একটা ছায়াপথ থেকে আরেকটা ছায়াপথ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের পরিমণ্ডল ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখন কথা হচ্ছে, ছায়াপথসমূহ আমাদের নিকট থেকে যত দূরে সরে যাবে, মহাবিশ্বের পরিমণ্ডলের পরিধি সম্ভবত বিস্তৃতি লাভ করবে ততটাই। তবে, কি রকম গতিতে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে অর্থাৎ মহাশূন্যের ওই সব বস্তু কতটা দ্রুত আমাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা একটা প্রশ্ন বটে। মনে হয়, তাদের এই দূরে সরে যাওয়ার গতিটা আলোর গতির কোন-এক ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে আরো দ্রুততর হওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়।

কোরআনের একটি আয়াতে যে বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে (সূরা ৫১, আয়াত ৪৭) তার সাথে অনায়াসেই আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ-মতবাদের তুলনা করা চলে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

"আকাশমণ্ডলী, আমিই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছি ক্ষমতার বলে। নিশ্চয়ই আমিই উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি।"

এখানে যাকে আকাশমণ্ডলী বলা হয়েছে– তা আরবী 'সামাআ' শব্দের অনুবাদ। এর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবেই পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য জগতের কথাই বুঝানো হয়েছে।" (পৃষ্ঠা-২১৯)।

কোরআনের অন্যত্র আছে, "বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (দুই পর্বে বা সময়ে) এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি জগতসমূহের (Worlds) প্রতিপালক!

"তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং ওতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারি পর্বের (বা সময়ের) মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।"

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস (আল্লাহর আইনের অনুগত হয়ে) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়"। তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।'

"অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে (সময়ে বা কালে) সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং

www.pathagar.com

নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এটি পরিক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা (৪১ সূরা হামীম আস্ সাজদা ঃ আয়াত ৯-১২)।

অন্যত্র আছে, "আল্লাহ, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ পর্বে / সময়ে)" (৩২ সূরা সাজদা ঃ. আয়াত ৪)।

পূর্বোক্ত ২১ সূরা আম্বিয়ার ৩০ আয়াতে আরবী মূল কোরআনে 'ফাতক' ও 'রাতক' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। ডাঃ মরিস বুকাইলি এই দুই শব্দের আভিধানিক অর্থ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন,

"The reference to a separation process (fataq) of a primary single mass whose elements were initially fused together (ratq).It must be noted that in arabic 'Fatq' is the action of breaking, diffusing separating and that 'ratq' is the action of fusing or binding together elemats to make a homogenous whole". (page 139)

[অনুবাদ ঃ একটি আদিম একখণ্ড বস্তু যার উপাদানসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে মিলিত অবস্থায় ছিল 'রাতক' তার বিচ্ছিন্নকরণের পদ্ধতির ('ফাতক') উল্লেখ হোল এটা। এটি অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, আরবী ভাষাতে "ফাতক" হোল ভাঙ্গানো প্রক্রিয়া, বিচ্ছিন্নকরণ, পৃথকীকরণ এবং "রাতক" হোল উপাদানকে একটি সদৃশাত্মক সমস্ত বস্তু তৈরী করতে মিলিতকরণ বা জোড়ানো কার্যক্রম। (পৃষ্ঠা ১৩৯)।

সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআন মজীদের উপরোক্ত তথ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ মরিস বুকাইলি তাঁর "দি বাইবেল, দি কোরআন এন্ড সাইন্স" গ্রন্থের ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠাতে চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কোরআন যে ছয় দিনে বা পর্বে বা সময়ে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা বলেছে তা হলো জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি ও তার পরে মানুষ থাকার উপযোগী পৃথিবীতে পরিবেশ ও খাদ্যের সংস্থান পর্যন্ত। পৃথিবীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ চার পর্বে। বর্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর এ পরিবর্তনকেও চারিভাগে বিভক্ত করেছে,– বলেন বুকাইলি।

৪১ সূরা হামীম আস্ সাজদার ৯-১২ আয়াতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টিতে দুই ধাপের কথা বলা আছে। বুকাইলী বলেন যে, আমাদের নাগালের

www.pathagar.com

ভিতর সূর্য ও পৃথিবীকে যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে নেই, আমরা দেখব যে, তারা যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে তা হলো প্রাথমিক নীহারিকা ('নেবুলা') জমাট বেঁধেছে এবং তার পরে তারা পৃথক হয়েছে। বুকাইলী বলেন যে, কোরআন এটাই "অতি পরিষ্কার"ভাবে উল্লেখ করে যখন বলে যে, আকাশের ধোঁয়া জমাট বেঁধে মিলিত হয় ও পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়। বুকাইলী বলেন, "Hence there is complete correspondence between the facts of the Qur'an and the facts of science" [অনুবাদ : তাই কোরআনের তথ্যে ও বিজ্ঞানের তথ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়)।

বুকাইলী আরো বলেন যে, তারকা (যেমন– সূর্য) সৃষ্টি এবং এর উপগ্রহ (যেমন– পৃথিবী) সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের মতে দু'টি ধাপ রয়েছে যা পরস্পরে গ্রথিত (interlocking of the two stages)। বুকাইলি বলেন, " The inter connection is surely very evident in the text of the Qur'an examined)" (Page-147). (অনুবাদ ঃ এই পারস্পরিক সংযুক্তি, কোরআনের যে পংক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হলো, তাতে সুনিশ্চিতভাবে পরিস্ফুট।" (পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭)।

বুকাইলী আরো বলেন যে, বিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে ধোঁয়ার যে উল্লেখ রয়েছে কোরআনে তা হোল প্রাথমিক 'নেবুলা' (নীহারিকা) যা মূলতঃ বস্তুর গ্যাসীয় অবস্থা– আধুনিক বিজ্ঞানের মত অনুযায়ী। আর বহু বিশ্বের কথা যা কোরআনে বিধৃত হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের মতে সম্ভব, যদিও এখনও তার সন্ধান মানুষ পায়নি।

ডাঃ মরিস বুকাইলী বলেন,

"There is in any case absolutely no opposition between the data in the Qur'an on the creation and modern knowledge on the formation of the universe. This fact is worth stressing for the Qur'anic revelation, where as it is very obvious indeed that the present-day text of the old testament provides data on the same events that are unacceptable from a scientific point of view." (Page-148) [অনুবাদ ; কোরআনে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে তথ্য আছে এবং এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানে কোন বিরোধ নেই– এটা নিরঙ্কুশভাবে বলা যায়। এই বিষয়টি কোরআনের বাণী সম্পর্কে জোর দিয়ে বলা যায়, অন্যদিকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, বাইবেলের পুরাতন অংশের আধুনিককালে প্রচারিত টেক্সটে একই প্রসঙ্গে যা বিধৃত রয়েছে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রহণযোগ্য। (পৃষ্ঠা-১৪৮)। ডাঃ মরিস বুকাইলী এ প্রসঙ্গে ইসলামের শুরু থেকে হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সাঃ)কে খৃস্টানদের দ্বারা এ বলে সমালোচনা করা হয় যে, তিনি বাইবেল থেকে নকল করেছেন–এ মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন,

"How could a man living fourteen hundred years ago have made corrections to the existing description to such an extent that he eliminated scientifically inaccurate material and on his own initiative, made statements that science has been able to verify only in the present day? this hypothesis is completely untenable . the description of the creation given in the Qur'an is quite different from the one in the Bible." (Page 148) .

[**অনুবাদ ঃ** একজন মানুষ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বসবাস করে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিভাবে সংশোধন করতে পারলেন এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ বর্জন করলেন এবং নিজের ঝুঁকিতে এমন সব মন্তব্য রাখলেন যা বিজ্ঞান হালে প্রমাণ করার সামর্থ্য পেল? এই ধরনের ধারণা (যে বাইবেল থেকে কোরআন নকল করা হয়েছে) একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা একই বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। (পৃষ্ঠা-১৪৮)।

আমরা আগেই মন্তব্য করেছি যে, ডঃ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্টি অব টাইম" পুস্তকে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় কোরআন মজীদ বলে,

" আমি(আল্লাহ) আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই এটিকে সম্প্রসারণ করছি।" (৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ৪৭)।

এক্ষেত্রে ডাঃ মরিস বুকাইলীর ব্যাখ্যা হলো– কোরআনে সম্প্রসারণ অর্থে "মুসি'উনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা বহুবচন ও বর্তমান কালবাচক। মূল ক্রিয়া হলো "আউসা'আ" যার অর্থ হলো– প্রসারণ করা, আরো প্রশস্তকরণ, বিস্তারিত করা, সম্প্রসারণ করা।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ সালে বৈজ্ঞানিক হাবল ঘোষণা করেন যে, 'গ্যালাক্সি' (ছায়াপথ) সমূহ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি হিসাব কষে দেখলেন যে ১৫ বিলিয়ন বর্ষ পূর্বে যখন 'বিগ ব্যাংগ' (বৃহৎ বিস্ফোরণ) হয়, তখন সূর্য, তারকা, ছায়াপথ, আকাশ, পৃথিবী কিছুই ছিল না এবং সেই থেকে সৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আইনস্টাইন স্থির বিশ্বের কথা বলেছিলেন। তবে হাবলের পূর্বে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে রুশী পদার্থবিদ আলেকজান্ডার এ ফ্রায়েডম্যান আইনস্টাইনের ভুল ধরে বিশ্ব সম্পর্কে দু'টি মডেল উত্থাপন করেন। একটিতে

www.pathagar.com

বিশ্ব সময়ের সঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে, অন্যটিতে সংকুচিত হচ্ছে। এর পর পরই বেলজীয় জ্যোতির্বিদ Georges Lemaitre বলেন যে, বিশ্ব ছিল প্রথমে খুবই ঘন ও উত্তপ্ত "Primeval atom" (মৌলিক অণু)। বিশ্ব সৃষ্টি হয় এই মৌলিক অণুর ভীষণ বিস্ফোরণে অর্থাৎ "বিগ ব্যাংগ" ঘটনার পর।

১৯৪৮ সালে তিনজন বৃটিশ তত্ত্ববিদ Herman Bondi, Thomas gold ও Fred Hoyle হাবলের বিশ্ব সম্প্রসারণের তত্ত্বকে ঠিক রেখে the steady state theory (স্থির পদ তত্ত্ব) প্রদান করেন এবং বলেন যে, বিশ্বের কোন সূচনা বা শেষ নেই। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে George Gamow 'বিগ ব্যাংগ' কালীন সময়ের সেই অতিঘন ক্ষুদ্র অগ্নিবলয়ের তাপের পরিমাপ কষে দেখালেন এবং বললেন যে, 'বিগ ব্যাংগ'-এর পরে তাপ হ্রাসের পরবর্তী অবস্থা যাকে নামকরণ করা হয় $3^{o}k$ Background Radiation" তার ছিটেফোঁটা এখনও বিশ্বে রয়েছে। ১৯৬৫ সালে Arno Penzias and Robert Wilson (যারা আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের পদার্থবিদ ছিলেন) $3^{o}k$ background radiation তাদের যন্ত্রে ধরেন। এই পর্যবেক্ষণ "ষ্টিডিস্টেট থিওরি"র সলিল সমাধি রচনা করে এবং 'বিগ ব্যাংগ' থিওরিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। 'বিগ ব্যাংগএর পরে বিভিন্ন পর্যায়ে ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য, গ্রহাদি, চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব কষে সৃষ্টির সময় বের করেছেন। প্রায় ১৫ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে 'বিগ ব্যাংগ' হলে তার পরে ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) সৃষ্টি হয় প্রাথমিকরূপে। দ্বিতীয় ধাপে তারকা ও অন্যান্য সৌরজগত সৃষ্টি হয় 'নেবুলা' থেকে। তার পরে হয় পৃথিবীসহ গ্রহাদির সৃষ্টি।

পৃথিবীর পরিবর্তন হয় চারিটি ধাপে বা পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে এক সময় পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়, বৃষ্টির সূচনা হয়, একসেলওয়ালা 'অরগানিজম' ও প্রাচীন সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থলভাগ বৃদ্ধি পায়, পাহাড় সৃষ্টি হতে থাকে, মাছ ও বিভিন্ন সরীসৃপ সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পর্যায়ে মরুভূমি, আগাছায় ভরা পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি, হ্রদ, নদী, ডায়নোসর-এর মতো অতিকায় প্রাণী আসে। চতুর্থ ধাপে আলপ্‌স্, হিমালয় পর্বত সৃষ্টি, স্থল ও সমুদ্রের বর্তমান সীমারেখা সৃষ্টি, ডায়নোসরের অবলুপ্তি, নানা জীবজন্তু ও অবশেষে মানুষের আগমন অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে ধাপে ধাপে বা পর্যায়ে পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

বিশ্ব কি সংকুচিত হবে?

হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পাঠ করতে করতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানিগণ সম্প্রসারণশীল বিশ্বের সঙ্গে ভবিষ্যতে সঙ্কোচনশীল বিশ্বেরও চিন্তা করছেন। এক সময়ে বিশ্ব আর সম্প্রসারিত না হয়ে মহাকর্ষের চাপে সঙ্কুচিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। ডঃ হকিং লেখেন,

"মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হারের যে বিভিন্ন প্রতিরূপ (যা বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করেছেন) রয়েছে, তার কয়েকটিতে মহাবিশ্বের আবার চুপ্‌সে যাওয়ার কথা– আর অন্য কয়েকটি প্রতিরূপে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। এই হারকে বলা হয় ক্রান্তিক হার (critical rate)। সম্প্রসারণের এই ক্রান্তিক হার কেন হল– যার জন্য এক হাজার কোটি বছর পরও মহাবিশ্ব প্রায় একই হারে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে? বৃহৎ বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাংগের) এক সেকেণ্ড পর যদি সম্প্রসারণের হার এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন (১০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০) ভাগও কম হোত, তাহলে মহাবিশ্ব বর্তমান আয়তনে পৌঁছানোর আগেই চুপসে যেত।" (পৃষ্ঠা ১২৮)।

ডাঃ হকিং আবার বলেন,

"মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে বিরাট আয়তন প্রাপ্ত হবে এবং তারপর আবার চুপ্‌সে যাবে। সেটি দেখাবে অনেকটা বাস্তবকালের অনন্যতার মতো। সুতরাং এক অর্থে কৃষ্ণগহ্বর (black hole) থেকে দূরে থাকলেও আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত (মহাবিশ্ব সংঙ্কোচনের ফলে)"। (পৃষ্ঠা-১৪৭)।

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে মনে হয় বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন বিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি এক সময়ে সঙ্কুচিত হবে– তার অবস্থানগত কারণেই। কোরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এ প্রসঙ্গে যা বলে তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে। কোরআন বলে,

"সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়"। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪ আয়াত)

"কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর (আল্লাহর) হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ডানহাতে।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৭)।

"সূর্য যখন গুটানো হবে, নক্ষত্র যখন খসে পড়বে, পাহাড়গুলো যখন সরানো হবে, ..." (৮১ সূরা তাকভির ঃ আয়াত ১-৩)

www.pathagar.com

"যে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসবে? যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হবে– সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?' না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।" (৭৫ সূরা ক্বিয়ামা ঃ আয়াত ৬-১১)।

"নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে . . .। " (৭৭ সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ৭-১০)।

"অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়া নেমে এসে মানব জাতিকে গ্রাস করবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি।" (৪৪ সূরা দুখান ঃ ১০-১২ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হবে যে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণার মত মহাবিশ্বকে প্রলয়ের সময় গুটানো হবে। মহাবিশ্ব সংকুচিত হবে ও মানুষ ভীষণ বিপদে নিপতিত হবে। ডঃ হকিং তো বলেছেন যে, বিশ্ব চুপসে গেলে বা সংকুচিত হলে "আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত" (পৃষ্ঠা-১৪৭, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম)। উপরোক্ত আয়াতগুলি নিয়ে কোন পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিদ গবেষণা করলে আরো নতুন, চমকপ্রদ তথ্য পেতে পারেন।

হকিং-এর বিভ্রান্তি

ডঃ হকিং লেখেন,

"They (supporters of metaphysics or religion) would say that god being *omnipotent,* could have started the universe off any way he wanted. That may be so, but in that case he also could have made it develop in a comletely arbitrary way. yet it appears that he chose to make it evolve in a very regular way according to certain laws" (page -12) [অনুবাদ ঃ তারা (দর্শন ও ধর্মের সমর্থকগণ) বলবেন যে, "ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই বিশ্ব সৃষ্টি তিনি যেভাবেই চাইতেন সেভাবে শুরু করতে পারতেন। তা হয়ত হবে, কিন্তু তাই হলে তিনি বিশ্বকে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন অনিয়মিত (arbitrary) ভাবে রূপ দিতেন। তবু দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বিশ্বকে খুবই নিয়মিতভাবে কতিপয় আইনের নিয়ম অনুযায়ী বিবর্তিত করার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন"। (পৃষ্ঠা ১২)।

ডঃ হকিং-এর উপরোক্ত মন্তব্য একজন পদার্থবিদের মন্তব্য। তবে তিনি

www.pathagar.com

যে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন তা হলো মেটাফিজিক্সের বা ধর্মতত্ত্বের বিষয়, তাই তিনি বিভ্রান্ত। আল্লাহ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলেই তিনি এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আল্লাহ আইন সৃষ্টি করতে পারেন এবং সে আইন প্রাকৃতিক আইনও হতে পারে। তিনি আইনের স্রষ্টা, আইনের অধীন নন। তিনি যদি সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম হন, তবে তাঁর ক্ষমতার সীমারেখা টানা ঠিক হবে না। তবে খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের তিন খোদার ক্ষমতা ভাগাভাগি হলে বিষয়টি ডঃ হকিং-এর আশঙ্কা অনুযায়ী হতে পারে। আল্লাহর বিশ্ব সৃষ্টির ফর্মূলা কি একটি মাত্র যে আল্লাহর আর কোন দ্বিতীয় বিকল্প পথ থাক্‌ত না সৃষ্টি করতে? তা হলে তাকে সার্বভৌম বলা চলে না। অন্যভাবে আল্লাহ্ বিশ্ব সৃষ্টি করলে তাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হবে কেন? হ্যাঁ, তিনি বিশ্বসৃষ্টিতে কিছু নিয়ম-কানুনও সৃষ্টি করেছেন, তাই বলে তিনি সেগুলোর দাস হন নাই। অন্য কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাইরে নয়। নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য আল্লাহই কিছু কিছু নিয়ম শৃঙ্খলার আইন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সেসব নিয়মকে, আইনকে চলতে দেন। তবে সার্বভৌম আল্লাহ এসবের নিয়ম বা আইনের হাতে বন্দী নন।

এখন ডাঃ হকিং-এর মতের বিপরীতে কোরআন মজীদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি উত্থাপিত হলো। কোরআন বলে,

"তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, সম্মানিত আরশের (সিংহাসনের) অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন।" (৮৫ সূরা বুরুজ ঃ আয়াত ১৩-১৬)।

"আমি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে– যা তোমরা জান না।

তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। বলবে, 'আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে। আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি'।

তোমরা যে পানি পান কর, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা

www.pathagar.com

করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" (৫৬ সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ৬০-৭০)।

"তাঁর (আল্লাহর) অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর এই দুয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে সব জীবজন্তু সেগুলো। যখন ইচ্ছা তিনি তখনই তাদের সমবেত করতে সক্ষম।" (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ২৯)

"আমি (আল্লাহ) কোন কিছু চাইলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও', তখন তা হয়ে যায়।" (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৪০)।

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা,জীবজন্তু, আর সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে হেয় করেন, তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তাই করেন।" (২২ সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ১৮)।

"আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।" (৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৭)।

"তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এ আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।" (১৪ সূরা ইব্রাহিম ঃ আয়াত ১৯-২০)।

উপরের বাক্যগুলিতে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছাই নিরঙ্কুশ। এমনকি তিনি বর্তমানেও তার সৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন, আকাশের পানি লবণাক্ত ও বীজকে খড়কুটা করতে পারেন, মানুষের অস্তিত্বকে বিলোপ করে মানুষের সদৃশ অন্য জীব সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কারণ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি "বিগ ব্যাংগ' (মহা বিস্ফোরণ) করে সৃষ্টি শুরু করেছেন বলে যে তিনি তাতে বাঁধা পড়েছেন, বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেছে আর তিনি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না– আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা ভ্রান্ত। 'ফিজিক্স' (পদার্থবিদ্যা) এর চোখে 'মেটাফিজিক্স' (দর্শন) এর বিষয় দেখার ফলে এ ভ্রান্তির সৃষ্টি। ডঃ হকিং খৃস্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যীশু খ্রীস্টের বিনা পিতাতে কুমারী মাতা মেরির গর্ভে জন্ম সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দেবেন তিনি? আল্লাহ্ তো পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ার নিয়ম রেখেছেন। তবে যীশুর জন্মে এ নিয়ম আল্লাহ রাখেন নাই। একে কি

www.pathagar.com

হকিং-এর ভাষায় আল্লাহর এই ইচ্ছাকে "Arbitrary" (স্বেচ্ছাচার বা অনিয়মিত) বলব?

কোরআনে আছে ঃ

"মরিয়ম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই।"

সে (জিবরাঈল ফেরেশতা) বললো, 'এভাবেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "এ আমার জন্য সহজ আর আমি তাকে (ঈসাকে) সৃষ্টি করব মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসাবে। এতো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।" (১৯ সূরা মরিয়ম ঃ আয়াত ২০-২১)।

"সে (ঈসা) তো ছিল আমারই (আল্লাহর) এক দাস, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম আর করেছিলাম বনী-ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম (মানুষকে না করে)। ঈসা তো কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) অগ্রদূত। সুতরাং তোমরা কিয়ামতকে সন্দেহ করো না, আর আমাকে অনুসরণ কর।" (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৫৯-৬১)।

"সে (মরিয়ম) বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, কেমন করে আমার সন্তান হবে? তিনি (আল্লাহ্) বলেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৭)।

"আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে পাঠ করছি নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে। নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের (জন্মের) দৃষ্টান্তের মতো। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', আর সে হয়ে গেল।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫৮-৫৯)।

কোরআন মজীদের উপরোক্ত বাণীর আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ ডঃ হকিং-এর নবী যীশু খৃষ্টকে স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টি করেন নাই। তবে এ ধরনের সৃষ্টি আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে নয়। যীশুর জন্ম হযরত আদমের জন্মের অনুরূপ বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ্।

অন্যদিকে হযরত শীশ (আঃ) হিব্রুতে যাকে 'শেট' বলা হয়। তার জন্ম হয় বিনা মাতায়। তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর তৃতীয় সন্তান ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আঃ) বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শীশ

www.pathagar.com

(আঃ)-এর জন্ম বিনা মাতায়। এ ধরনের জন্ম যদিও নিয়মের ব্যতিক্রম, তবু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর নিয়মের দাস নন; নিয়ম তাঁরই দাস।

হকিং-এর জীবনী লেখকদ্বয় মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন ধারণা দিতে চেষ্টা করেন যে, হকিং নাস্তিক নন, তবে তিনি ধর্ম বিশ্বাসকে তাঁর বিশ্ব-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পান নাই। ডঃ হকিং "মাস্টার অব দি ইউনিভার্স" নামে বিবিসি টিভি সম্প্রচারণে বলেন, "We are such insignificant creatures on a minor planet of a very average star in the outer suburbs of one of a hundred thousand million galaxies. So it is difficult to belive in a god that would care about us or even notice our existence" (সূত্রঃ "স্টিফেন হকিং: এ লাইফ ইন সাইন্স" 'পৃষ্ঠা ১৬৬)।

[অনুবাদ ঃ হকিং বলেন, এক শত সহস্র মিলিয়ন গ্যালাক্সির (ছায়াপথের) প্রান্তদেশের একটি সাধারণ ক্ষুদ্র তারকার একটি সামান্য গ্রহের নগণ্য জীব আমরা। কাজেই এমন একজন গডে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করা কঠিন, যে গড্ আমাদের জন্য মাথা ঘামাবেন বা এমনকি আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন]।

ডঃ হকিং যে 'গড্' সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন, তা খৃস্টানদের 'গড' হতে পারে। তবে তিনি ইসলামের আল্লাহ সম্পর্কে যে অধ্যয়ন করেন নাই, তা তার ধর্মতত্ত্ব থেকে বোঝা যায়। আর সব ধর্ম সম্পর্কে না জেনে এমন একটি ছেলেমানুষি বক্তব্য বিবিসি টিভিতে প্রদান করা অবৈজ্ঞানিক সুলভ বলে মনে হয়।

ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান কি– তা জানতে ড: হকিংকে মরিস বুকাইলীর ন্যায় কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করতে হবে। কোরআন বলে,

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।" (৫০ সূরা কাফ্ ঃ আয়াত ১৬)।

"আকাশ, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী স্থানে এবং ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। তোমাকে উঁচু গলায় বলতে হবে না, আল্লাহ জানেন যা গুপ্ত ও যা অব্যক্ত।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ৬-৭)।

"তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর আল্লাহ্। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। আর তোমরা যা কর তাও তাঁর জানা।" (৬ সূরা আন্আম ঃ আয়াত ৩)।

www.pathagar.com

"তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অংকুরিত হয় না বা এমন কোন রসাল বা শুষ্ক জিনিস নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই।" (৬ সূরা আন্‌আম ঃ আয়াত ৫৯)।

"(লুকমান হাকিম বললেন) 'হে বাছা! কোন কিছু যদি সরষে দানার পরিমাণও হয় আর তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে বা আকাশে বা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ তো সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে খবর রাখেন।" (৩১ সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১৬)।

"আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই তো গোপন নেই।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫)।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যু ঘটান; তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনিই যুগপৎ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত"। (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২-৩)

"তিনি জানেন যা কিছু মাটিতে ঢোকে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৪)

"আল্লাহ্ তোমাদের দিনের গতিবিধি ও রাত্রির অবস্থান সম্বন্ধে ভালোভাবে জানেন।" (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ১৯)।

"তুমি কি বুঝ না আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাদের মধ্যে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি হাযির না থাকেন, পাঁচজনের মধ্যেও হয় না যেখানে তিনি ষষ্ঠজন হিসাবে না থাকেন। সংখ্যায় ওরা এর চেয়ে কম বা বেশী হোক ওরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ ওদের সঙ্গে আছেন। ওরা যা করে, কিয়ামতের দিন ওদের তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর তো সব বিষয়ই ভালো করে জানা।" (৫৮ সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত ৭)।

"আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ

www.pathagar.com

মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী।" (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৩৪)।

উপরোক্ত তথ্য থেকে কি প্রমাণিত হয় যে হকিং-এর মত এক ক্ষুদ্র জীব সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত? হকিংকে কি আল্লাহ্ চিনেন না? চিকিৎসকগণ পঙ্গু হকিং-এর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেও, তাঁর আগাম মৃত্যু সনদ জারি করলেও, আল্লাহ হকিংকে নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেই ছাড়বেন।

মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন ডঃ হকিং-এর জীবনীতে লেখেন ঃ "There are a number of practising scientists who have very strong Christian convictions and some have claimed that Hawking is simply not qualified to make statements about religion because he knows nothing about it. But what qualifications does one need? hawking works in a field which *does* impinge on religion. His work deals with the origins and early life of the Universe. Could a subject be any more religious? He once stated :

`It is difficult to discuss the beginning of Universe without mentioning the concept of god. My work on the origin of the Universe is on the borderline between science and religion, but I try to stay on the scientific side of the border. It is quite possible that god acts in ways that cannot be described by scientific laws. But in that case one would have to go by personal belief. '(20/20' ABC Television Broadcast)"And that has never been hawking's way." (Pages 166-167) .

[**অনুবাদ ঃ** অনেক ধর্মভীরু বৈজ্ঞানিক আছেন, তাদের খৃষ্টবাদ সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব রয়েছে। তাদের কেউ দাবী করেছেন যে, হকিং ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে যোগ্য নন, কারণ তিনি ধর্মের কিছু জানেন না। কিন্তু একজনের কি যোগ্যতা লাগবে? হকিং যে বিষয়ে কাজ করেন তা ধর্মের সীমারেখাতে অবশ্য আঘাত করে। তাঁর কাজ বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রাথমিক অবস্থা নিয়ে। অন্য কোন বিষয় কি আরো ধর্মীয়? হকিং একবার বলেন ঃ

'গড্ সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা না করে বিশ্বের শুরু সম্পর্কে আলোচনা করা কঠিন। বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আমার গবেষণা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সীমারেখা স্পর্শ করে, কিন্তু আমি বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে থাকার চেষ্টা করি। এটা সম্ভব যে, গড্ এমনভাবে কার্য করেন যা বৈজ্ঞানিক আইন দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে একজনকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারা চলতে হবে।'

www.pathagar.com

(২০/২০ এবিসি টেলিভিশন ব্রডকাস্ট) 'এবং তা কখনই হকিং এর পথ থাকে, নাই। (পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭)।

জীবনী লেখকদ্বয় হকিংকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন যে, যেহেতু হকিং বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাই তা ধর্মীয় বিষয়। আর হকিংও তাই বলেন। তবে হকিং বলেন যে, তিনি বিজ্ঞানের ঘরেই থাকার চেষ্টা করেছেন। আর বলেছেন যে, গডের কার্যকলাপ বৈজ্ঞানিক আইন দ্বারা বর্ণনা করা নাও যেতে পারে ; তাই এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বড়। কিন্তু জীবনীকারগণ বলেছেন যে, হকিং এ কথায় ঠিক থাকেন নাই, কারণ, এ পথ হকিং-এর নয়।

হকিং শুধু পদার্থবিদ্যা দিয়ে ঈশ্বর তত্ত্ব দেখেছেন। তাছাড়া তিনি খৃষ্টতত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব জানেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া তিনি শুধু বিজ্ঞানের ঘরে থেকেছেন, তাও মনে হয় না। তিনি 'গড্' ও ধর্ম সম্পর্কে বহু মন্তব্য করেছেন। যেহেতু দেহের দিক দিয়ে পঙ্গু একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ হকিং, তাই তার ধর্ম সম্পর্কীয় মন্তব্যসমূহ বিশ্বের বহু মানুষকে তাঁর প্রতি সহানুভূতির জন্য ভুল পথে নিতে পারে।

ডঃ হকিং তাঁর "সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বইয়ে লেখেন ঃ

"কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব (বিশ্ব সম্পর্কে) আবিষ্কার করি, তাহলে শুধুমাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকেরই নয়, কালে কালে সে তত্ত্ব বোধগম্য হওয়া উচিত সবার, অন্ততপক্ষে বোধগম্য হওয়া উচিত সে তত্ত্বের মূল রেখাগুলি। তাহলে আমরা দার্শনিকরা, বৈজ্ঞানিকরা এমন কি সাধারণ মানুষরাও এই আলোচনায় (বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে) অংশগ্রহণ করতে পারব; আমাদের এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ কি? আমরা যদি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই, তাহলে সেটাই হবে মানবিক যুক্তির চূড়ান্ত জয়– তার কারণ তখন আমরা জানতে পারব ঈশ্বরের মন।" (অনুবাদ পৃষ্ঠা ১৮০)।

ঈশ্বরের মন সম্পর্কে বা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে ডঃ হকিং জানতে চান। তবে তিনি তা পদার্থ বিদ্যার চোখে দেখতে চান। আর বিশ্ব সম্পর্কে একটি সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার হলে 'ঈশ্বরের মন' জানা যাবে এই আশা করছেন ডঃ হকিং। ঈশ্বর যে তার মনের কিছু কিছু কথা ইতিমধ্যে নবীদের মাধ্যমে, বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তাঁর খোঁজ পান নাই ডঃ হকিং। তবে পদার্থবিদ্ হিসাবে ঈশ্বরের

www.pathagar.com

মহাবিশ্বকে জানার আগ্রহ তাঁর জন্য সঠিক পদক্ষেপ। তিনি যে দাবী করেছেন যে, তিনি বিজ্ঞানের সীমারেখা ডিঙিয়ে ধর্মের সীমাতে অনুপ্রবেশ করেন নাই, সে দাবী তিনি নিজেও ঠিক রাখছেন না। পদার্থবিদ্যা থেকে ধর্মের সীমারেখাতে প্রবেশ অনুচিত নয়, বরঞ্চ তাই তাঁকে করতে হবে। তবে সঠিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তির পথে। তিনি শুধু খৃস্টবাদ, ত্রিত্ববাদ, আর 'রিভাইজড বাইবেল' (সংশোধিত বাইবেল) দিয়ে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করবেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ডাঃ মরিস বুকাইলীর মত তাঁকে প্রাচ্যে তাকাতে হবে।

কোরআন মজীদ বলে,

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯০)।

'আমি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই; আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (৪৪ সূরা দুখান ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)।

"আমি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি জীন ও মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে।" (৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৬)।

"বলো, পৃথিবীতে সফর করে দেখ কিভাবে তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টির সূচনা করেন'।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১৯)।

"মানুষ কি দেখে না আমি (আল্লাহ) তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্যে তর্ক করে।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৭৭)।

"ঈশ্বরের মন" বোঝার জন্য গবেষণা করায় কোন নিষেধ নেই। তবে পূর্ব থেকে এ ধারণা করা যে বিশ্ব ও পরবর্তী সৃষ্টিতে (মানুষ সৃষ্টি?) আল্লাহ্র কোন কার্যক্রম ছিল না– এমনি ধারণা করা কোনক্রমে বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বসম্মত নয়। আসলে ডঃ হকিং-এর "কনসেপ্ট অব গড্" (ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা) সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও ধর্মবিরোধী।

মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন লেখেন ঃ "What really began to cause problems for Jane (wife of Hawking) was a growing feeling that her husband was trying to eradicate any necessity for god in his view of the Universe . . . It simply seemed to her that, in his Universe, pure mathematical reasoning overrode any

www.pathagar.com

need for god" (Page 167) . [অনুবাদ ঃ হকিং এর স্ত্রী জেনের ধারণা হতে লাগল যে, তাঁর স্বামী তাঁর বিশ্ব ধারণায় গডের কোন প্রয়োজন নেই– এই মনোভাব ধারণা করে চলেছেন। এই অবস্থা জেনকে মনোপীড়া প্রদান করে। ... জেনের মনে হলো– হকিং-এর বিশ্ব চিন্তায় বিশুদ্ধ অঙ্কের যুক্তি গডের প্রয়োজনীয়তা নাকচ করেছে। (পৃষ্ঠা-১৬৭)]।

ডঃ হকিং এর স্ত্রী জেন হকিংকে ভিতর থেকে দেখেন। কাজেই তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণ এটা প্রতিষ্ঠিত করে যে, হকিং বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় গডের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন না। এদিকে হকিং এর জীবনী লেখকদ্বয় মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন খৃস্টান গির্জা কর্তৃক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের উপর অত্যাচারকে ঈশ্বর থাকা না থাকার যুক্তি হিসাবে পেশ করে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা লেখেন,

"Are the leaders of the various churches any more knowledgeable about the origins and meaning of life than a scientist? why should Stephen Hawking be any less competent to talk about god than the next person or the next *pontiff,* come to that? Were the men of god right to sentence galileo to end his years in solitary misery? were they right to burn giordano Bruno at the stake for daring to propose a contrary view of the universe? Have all the religious wars of human history with their accompanying terror and misery, been justifiable?" (Page 168) . [অনুবাদ ঃ বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে কি বিভিন্ন গির্জার পাদ্রীগণ জীবনের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বেশী জাননেওয়ালা? কেন স্টিফেন হকিং ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে অন্য লোক অথবা গির্জার গুরুর চেয়ে কম যোগ্য হবেন? ঈশ্বরের লোকজন কি ঠিক করেছিলেন বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে নির্জন কারাবাস প্রদান করে? বিশ্ব সম্পর্কে সাহসী বিপরীত মতবাদ প্রদান করায় গির্জার পাদ্রীগণের বৈজ্ঞানিক জিওরডানো ব্রুনোকে খুঁটিতে আগুনে পুড়িয়ে মারা কি ঠিক হয়েছে? মানব-ইতিহাসের ভীতি ও দুঃখ জড়িত ধর্মীয় যুদ্ধসমূহ কি ঠিক ছিল? (পৃষ্ঠা ১৬৮)]।

উপরোক্ত মন্তব্য করে লেখকদ্বয় শুধু খৃস্ট ধর্ম ও পাদ্রীদেরই সমালোচনা করেছেন। এ যুক্তিতে ইসলামকে আঘাত করা ঠিক হবে না। ইসলামের ইতিহাসে বিজ্ঞানের গবেষণা করে কাউকে প্রাণ দিতে হয় নাই। ধর্মীয় যুদ্ধের হানাহানি ইউরোপে রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছিল রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের ভিতর। মুসলমানদের এলাকাতে এসে খৃস্টানরাই ক্রুসেডের ধর্মীয়

www.pathagar.com

যুদ্ধ করেছিল। খৃস্টবাদ বিরোধী যুক্তি দিয়ে আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় নেই– এ কথা বলা নেহাৎ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক হবে।

ডঃ হকিং পদার্থবিদ হয়েও ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে কটাক্ষ করেন, তবে তিনি আর কাউকে তাঁর সামনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে মন্তব্য করতে অনুমতি দেন না। এ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার এক সাথী ডঃ ডন পেজ (Don Page)-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উল্লেখ করা যেতে পারে। ডন পেজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কাতে জন্মগ্রহণ করেন ও লস এঞ্জেলসের নিকটস্থ পাসাডেনা শহরের কালটেক (Caltech) কলেজে পিএইচডি করেন। পাসাডেনা শহরের একটি "টপলেস বার" (উন্মুক্তবক্ষ সাকীর পানশালা) শহর কর্তৃপক্ষ বন্ধ করতে গেলে কালটেকের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক রিচার্ড ফেনম্যান (Richard Feynman) আদালতে "টপলেস বারের" পক্ষে বলেন যে, তিনি ঘনঘন সেখানে গিয়ে পদার্থবিদ্যার উপর গবেষণা করতেন। (সূত্র ঃ স্টিফেন হকিং এ 'লাইফ ইন সাইন্স,' পৃষ্ঠা ১৫৫)। ১৯৮৮ সালে ফেনম্যান ক্যান্সারে ইন্তেকাল করেন। সে যাই হোক, উন্মুক্ত-বক্ষ সাকী না দেখলে পদার্থবিদ্যার গবেষণা হয় না। এ যেন কতকটা গাঁজা, আফিম টেনে মন্দিরে ধর্ম চর্চা আর কি। বিবাহিতা স্ত্রী পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত বক্ষ সাকী পরিদর্শন করার অর্থ হলো সেই বিখ্যাত মন্তব্য "A man is by nature polygamious" (পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে বহুগামী)। তাহলে ইসলামের বহু বিবাহের বিশেষ অনুমতির বিরুদ্ধে কথা বলা হয় কেন? একটি নারীকে পানশালায় উন্মুক্ত-বক্ষ করে বেইজ্জতি করার চেয়ে সেই নারীকে অন্তত দ্বিতীয় স্ত্রী করে তাকে মর্যাদা দেওয়া কি হানিকর? উন্মুক্ত-বক্ষার সন্তানের ভবিষ্যত কি? আমরা কি কেউ উন্মুক্ত-বক্ষার সন্তান হতে রাজি হব?

সে যাই হোক, কালটেকে পিএইচডির ছাত্র ডন পেজ হকিং-এর কালটেকে থাকাকালীন সময়ে খুব ঘনিষ্ঠ হন। ফলে দু'জনে মিলে "কৃষ্ণ গহ্বর" নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখেন। হকিং কালটেকে এক বছর গবেষণা করেন। পরবর্তীতে ডঃ ডন পেজ ক্যামব্রিজে গিয়ে ডঃ হকিং-এর সঙ্গে গবেষণা করার বৃত্তি পান ও ১৯৭৬ সালে হকিং এর গৃহে অবস্থান করেন। পদার্থবিদ ডন পেজ "বর্ন এগেন ক্রিশ্চিয়ান, এন এভানজেলিস্ট এজওয়েল এজ এ কসমলজিস্ট" (সূত্র ঃ মাইকেল হোয়াইট ও জনগ্রিবিন, পৃষ্ঠা ১৬৯) ছিলেন। হকিং-এর স্ত্রী জেন নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, ডন পেজ হকিং পরিবারে আসার পর পরই হকিং-এর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে হকিং-এর কাছ থেকে বাধা পান ও আলোচনা

www.pathagar.com

বন্ধ করতে হয়। এর পর থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনা না করার জন্য উভয়ের ভিতর সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, হকিং-এর যুক্তি হলো– ঈশ্বর ধারণা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কখনও কখনও হকিং ভাবখানা দেখান যে, তিনি একেবারে নাস্তিক নন, শুধু ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার-অপ্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য। এ এক ধরনের বিপরীতমুখী মনোভাব, যা শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করতে পারে। হকিং বলেন,

"Even if there is only one possible unified theory, it is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a Universe for them to describe?" (সূত্র ঃ " এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম"-এর উপসংহার)। (অনুবাদ ঃ যদিও একটি সম্ভাব্য সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্ব সম্পর্কে থেকে থাকে, এটা হবে শুধু এক সারি বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও বীজগণিতের সমীকরণ। এর ভিতর কি সে যা এই সমীকরণসমূহকে জীবন্ত করে এবং একটি বিশ্বকে সৃষ্টি করে তাদের বর্ণনা করতে)?

ডঃ হকিং আরো বলেন,

"বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি হল একটি গাণিতিক প্রতিরূপ গঠন করা। কিন্তু সে প্রতিরূপ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। (কি সে– যা জীবন্ত করে?); প্রতিরূপ বিবরণ দেবে সেই জন্য একটি মহাবিশ্ব থাকবে কেন? অস্তিত্বের ঝামেলা মহাবিশ্ব কেন নিতে গেল? ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব কি এমনই ক্ষমতাশালী (compelling) যে সে নিজেরই অস্তিত্ব নিয়ে আসতে পারে? না কি এর জন্য একটি স্রষ্টা দরকার? তাই যদি হয়, তাহলে মহাবিশ্বের উপর তাঁর আর কি অভিক্রিয়া থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁকে (সৃষ্টিকর্তা) কে সৃষ্টি করেছিল?" (সূত্র ঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্তের অনুবাদ "কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", পৃষ্ঠা ১৮০)।

হকিং-এর এসব বক্তব্য দু'মুখো সাপের মত এবং ঈশ্বর তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই বিভ্রান্ত। তার সহ-গবেষক কর্মী ডঃ ডন পেজের সঙ্গে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে একেবারেই রাজি নন পদার্থ বিদ্যা ছাড়া। কিন্তু তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পুস্তকে ঈশ্বর সম্পর্কে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নাই। একদিকে বলেন যে, বিশ্ব সম্পর্কে সমীকরণগুলোতে কে জীবন দান করে বিশ্ব সৃষ্টি করল? অন্যদিকে তিনি বলেন, "তাঁকে (ঈশ্বরকে) কে সৃষ্টি করেছিল?" (Who created god?)" ডঃ হকিং তত্ত্ব দিয়েছেন যে, মহাবিশ্ব

www.pathagar.com

"সম্পূর্ণ আত্মঅন্তর্ভুক্ত (Self-contained) এবং বাইরের কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়। এটা সৃষ্টও হবে না, ধ্বংসও হবে না। এটা শুধু থাকবে।" ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন করেছেন ডঃ হকিং। তবে তিনি প্রশ্ন করেন নাই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? এতে প্রতীয়মান হয় যে, হকিং-এর ঈশ্বরতত্ত্বে ঈশ্বরের চেয়েও মহাবিশ্ব শক্তিশালী ও আদি। এটা যুক্তির দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য।

ডঃ হকিং-এর পুরো মন্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি লিখেন ঃ

"If Euclidean space-time stretches back to infinite imaginary time, or also starts at a singularity in imaginary time, we have the same problem as in the classical theory of specifying the initial state of the universe; god may know how the universe began but we cannot give any particular reason for thinking it began one way rather another. On the other hand, the quantum theory of gravity has opened up a new possibility, in which there would be no boundary to space time and so there would be no need to specify the behaviour at the boundary. There would be no singularities at which the laws of science broke down and no edge of space- time at which one would have to appeal to god or some new law to set the boundary conditions for space-time. One could say: "The boundary condition of the universe is that it has no boundary." The universe would be completely self-contained and not affected by anything outside itself. It would neither be created nor destroyed. It would just BE." (Source: A Brief History of Time pages 143-144). [অনুবাদ ঃ ইউক্লিডীয় স্থান-কাল যদি কাল্পনিক সীমাহীন অতীতে বিস্তৃত হয়, কিম্বা যদি কাল্পনিককালের একটি অনন্যতায় শুরু হয়, তাহলেও আমাদের চিরায়ত তত্ত্বের মতো একই সমস্যা থেকে যায় অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা নির্দিষ্টরূপে নির্দেশ (Specifiying) করাঃ ঈশ্বর হয়তো জানেন– মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু মহাবিশ্ব এভাবে শুরু না হয়ে কেন অন্যভাবে শুরু হয়েছিল সেটা বিচার করার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখাতে পারব না। অন্যদিকে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে।এ সম্ভাবনায় স্থান-কালের কোনো সীমা থাকবে না, সুতরাং সীমানার আচরণ নির্দিষ্ট করারও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সে ক্ষেত্রে এমন কোনো অনন্যতা থাকবে না– যেখানে বিজ্ঞানের বিধি ভেঙে পড়েছিল এবং স্থান-কালের এমন কোনো কিনারা (edge) থাকবে না– যেখানে স্থান-কালের সীমানা স্থির করার জন্য ঈশ্বর কিম্বা অন্য কোন বিধির দ্বারস্থ হতে হবে। বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে "মহাবিশ্বের সীমান্তের অবস্থা হল কোনো সীমান্তের অনস্তিত্ব"। মহাবিশ্ব হবে সম্পূর্ণ আত্মঅন্তর্ভুক্ত (Self contained) এবং বাইরের কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়। এটা সৃষ্টিও হবে না,ধ্বংসও হবে না। এটা শুধুমাত্র থাকবে (it would just BE)। (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪)।

উপরে ডঃ হকিং-এর বেশ কিছু মন্তব্য রয়েছে– যা পদার্থবিদ্যার সীমা লঙ্ঘন করে ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, দর্শন ও অধিবিদ্যায় (Metaphysics) প্রবেশ করেছে। ডঃ হকিং ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি শুধু পদার্থবিদ্যার সীমান্তে থাকবেন। তিনি কথা রাখেন নাই। তাঁর গবেষক সাথী ডঃ ডন পেজের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনাই করবেন না তিনি। অন্যদিকে ঈশ্বর-ধারণাকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে ঈশ্বরকে কটাক্ষ করবেন তাঁর পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়ের বই-এর ভিতরে! এতো স্ব-বিরোধিতা।

পদার্থবিদ্যার "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" বইয়ে ডঃ হকিং লেখেন যে, "ঈশ্বর হয়তো জানেন মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল।" হকিং-এর ভাবনা এই যে, ঈশ্বর শুধু "হয়তো জানেন", এছাড়া ঈশ্বরের আর করার কিছু ছিল না। গবেষক-সাথী ডঃ জন পেজকে ধমক দিয়ে ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত ঘোষণা করে তিনি একটি বহুল প্রচারিত বইয়ে ঈশ্বরকে পঙ্গু হিসেবে দেখালেন। ডঃ হকিং নিজে পঙ্গু হয়েও বিজ্ঞানের অনেক গবেষণা করেছেন। ঈশ্বরকে পঙ্গু হিসাবে ধারণা করলে খৃস্টবাদে তা অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, কারণ খৃস্টবাদে তিন ঈশ্বর মিলে ত্রিত্ববাদ তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। ঈশ্বরের ক্ষমতা ভাগাভাগি হলে, পঙ্গুত্বই আসবে। তাই ডঃ হকিং মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু "হয়তো" ঈশ্বর জানতেন। তাহলে কি ছোট ঈশ্বর সৃষ্টির শুরু করে এবং বড় ঈশ্বরকে তা শুধু জানানো হয়? বড় ঈশ্বরের করার তেমন কিছু ছিল না? ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা অতীতকালের অশিক্ষিত, অজ্ঞান ও বর্বর জাতির ভিতর ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের ধারণা হবে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অদার্শনিক।

মহাবিশ্বের সীমানা না থাকলে, কিনারা না থাকলে,স্থান-কালের সীমানা না থাকলে, কিনারা না থাকলে, সীমানা স্থির করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই– বলেছেন ডঃ হকিং। এটা কি ব্যক্তিগত ঈশ্বরতত্ত্ব, না পদার্থবিদ্যা? এই যদি পদার্থবিদ্যা হয়, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান তার সত্যিকারের রূপ হারিয়ে, পথ হারিয়ে, চোরাবালিতে ঢুকবে। এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আর মধ্যযুগের খৃস্টীয় চার্চ তথা পোপের ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের কোন কিনারা, সীমা নেই– বলেছেন ডঃ হকিং। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন,

"ধরাপৃষ্ঠ বিস্তারের দিক দিয়ে সীমিত কিন্তু তার কোন সীমানা কিম্বা কিনারা নেই। আপনি যদি জাহাজে করে সূর্যাস্তের ভিতরে ঢুকে পড়েন, তাহলে আপনি পৃথিবীর কিনারা দিয়ে পড়ে যাবেন না কিম্বা একটি অনন্যতায় ঢুকে পড়বেন না ("আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, সেই জন্য আমি জানি!"– বলেন হকিং) (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, পৃষ্ঠা ১৪৩)। ডঃ হকিং বলেন যে, পৃথিবীর সীমানা, কিনারা নেই; মহাবিশ্বের সীমানা, কিনারা নেই। তাই কোনো মানুষ পৃথিবীর সীমানা, কিনারা দিয়ে পড়ে যায় না, আর তিনি সারা পৃথিবীতে ঘুরে দেখেছেন যে, মানুষ পৃথিবীর সীমানা, কিনারা দিয়ে পড়ে যায় না। এটা কি পদার্থবিদ্যা হলো? ডঃ হকিং কি রসিকতা করছেন? মহাবিশ্বেরও কোন সীমানা নেই, বলেছেন ডঃ হকিং। আর মহাবিশ্ব হলো "আত্মঅন্তর্ভুক্ত" (self-contained) অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী, স্বতঃক্রিয়াশীল, স্বয়ংক্রিয়াশীল। তিনি বলেন যে, মহাবিশ্ব বাইরের কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়। যেহেতু ডঃ হকিং এ মন্তব্য লেখার একটি বাক্যের আগে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাই "মহাবিশ্ব বাইরের কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়" একথা বলে প্রকারান্তরে তাঁর "ব্যক্তিগত" ঈশ্বরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের পাশাপাশি সন্নিবেশিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

অন্যদিকে ডঃ হকিং বলেছেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টও নয়, ধ্বংসশীলও নয়; "It would just BE" (মহাবিশ্ব শুধু আছে)। মহাবিশ্ব যেখানে সম্প্রসারণশীল, আর পরিণতিতে সঙ্কোচনের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে তিনিই মতামত প্রদান করেছেন (হয়ত এখনই সঙ্কুচিত হবে না); আবার এখন বলছেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্ট নয়, এটা ধ্বংসশীল নয়। এটা শুধু আছে ও থাকবে। সৃষ্ট নয়, ধ্বংসশীল নয়, শুধু আছে— এসব গুণ হলো একমাত্র আল্লাহর। তাহলে কি ডঃ হকিং মহাবিশ্বরূপী নতুন ঈশ্বরের জন্ম দিলেন?

ডঃ হকিং বলেন,"মহাবিশ্ব যদি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যদি কোনো অনন্যতা (Singularities) কিম্বা সীমানা না থাকে এবং যদি একটি ঐক্যবদ্ধ (পদার্থবিদ্যার) তত্ত্বের সাহায্যে তার বিবরণ দেওয়া যায়, তাহলে স্রষ্টা ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে তার নিহিতার্থ হয় গভীর"।

"আইনস্টাইন একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহাবিশ্ব গঠনে ঈশ্বরের কতটুকু স্বাধীনতা (choice) ছিল'? যদি সীমাহীনতার প্রস্তাব নির্ভুল হয়, তাহলে

www.pathagar.com

প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনে প্রায় কোনো স্বাধীনতাই তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও অবশ্য যে বিধিগুলি মহাবিশ্ব মেনে চলবে, সে বিধিগুলি নির্বাচনের স্বাধীনতা তাঁর থাকত কিন্তু বাস্তবে বেছে নেওয়ার এ স্বাধীনতাও হয়তো খুব বেশী একটা কিছু হতো না। হয়তো হেটারোটিক (heterotic) (হেটারোজেনাস? ভিন্ন প্রকারের? বিসদৃশ? —বর্তমান নিবন্ধকারের প্রদত্ত শব্দ) তন্তুতত্ত্বের (string theory) মতো শুধুমাত্র একটি কিম্বা সামান্য কয়েকটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব থাকত, সেগুলির হয়তো অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য থাকত এবং সে তত্ত্ব হয়তো মানুষের মতো জটিল গঠনের জীবের অস্তিত্ব অনুমোদন করত। সে মানুষ এমন জীব যে, তারা মহাবিশ্বের বিধি অনুসন্ধান করতে পারে এবং ঈশ্বরের ধর্ম (nature of god) নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে।" (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম; পৃষ্ঠা-১৮৪)।

ডঃ হকিং 'অনন্যতা' (Singularity) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার বইয়ের শব্দকোষ অংশে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ "স্থান-কালের এমন একটি বিন্দু যেখানে স্থান-কালের বক্রতা অসীম হয়।" উপরে এ শব্দটা এসেছে।

ডঃ হকিং বলেছেন যে, "মহাবিশ্ব যদি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যদি কোনো অনন্যতা (singularities) কিম্বা সীমানা না থাকে এবং যদি একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের সাহায্যে তার বিবরণ দেওয়া যায়, তাহলে স্রষ্টা ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে তার নিহিতার্থ হয় গভীর" অর্থাৎ আল্লাহর ভূমিকা হয় গৌণ বা তাঁর ভূমিকা নেই। পদার্থবিদ্যা আলোচনা করতে করতে ডঃ হকিং তাঁর "ব্যক্তিগত ঈশ্বর"কে এনেছেন— যে ঈশ্বর কল্পিত, তাঁরই মত পঙ্গু। মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই আল্লাহর ভূমিকা থাকবে না কেন? আল্লাহই মহাবিশ্ব ঠিকভাবে চলবার ব্যবস্থা করেছেন। "মহাবিশ্বের অনন্যতা" আর "সীমানা" না থাকলেই বা আল্লাহর ভূমিকা খতম হবে কেন? আর পদার্থবিদ্যার ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব হলেই বা আল্লাহর ভূমিকা হ্রাস পাবে কেন? বরঞ্চ ঐক্যবদ্ধ এক তত্ত্ব তো এক আল্লাহর এক নীতিই প্রমাণ করবে। বহু তত্ত্ব হলে তো কেউ কেউ একত্ববাদের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে পারে। ডঃ হকিং বলেন যে, "মহাবিশ্ব গঠনে "প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনে প্রায় কোনো স্বাধীনতাই তাঁর (ঈশ্বরের) ছিল না।" এ কোন্ ঈশ্বরতত্ত্ব? এ কি ইহুদী ও রোমানদের ক্রুশে বিদ্ধ অসহায় তথাকথিত "লর্ড" যীশুখৃষ্ট"রূপী ত্রিত্ববাদের কোন ঈশ্বর? ডঃ হকিং বলেন যে, "মহাবিশ্ব চলার বিধিগুলি পর্যন্ত বেছে নেওয়ার এ স্বাধীনতাও হয়তো খুব বেশী একটা কিছু হতো না" ঈশ্বরের জন্য। এ কোন্ ঈশ্বরতত্ত্ব? ডঃ হকিং কি পদার্থবিদ্যার বই লিখলেন? না

www.pathagar.com

ঈশ্বরতত্ত্বের? তিনি দর্শন, মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা), ধর্মতত্ত্ব– এসবকে কটাক্ষ করেন। তাহলে সে ক্ষেত্রে কেন তিনি তাঁর অপরিপক্কতা প্রদর্শন করলেন?

"ঈশ্বরের ধর্ম বা স্বভাব (nature of god)" নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে মানুষ– কোন কোন মানুষ। কারণ আল্লাহ মানুষকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে এ প্রশ্ন সঠিক না হলে আর নাস্তিকতা বা অংশীবাদী ধারণা প্রদর্শন করলে, আল্লাহও তার সময়মত তার মোকাবিলা করবেন। আল্লাহ ধৈর্যশীল বলেই এহেন অজ্ঞ ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন না। এখন কোরআন মজীদের ভাষা দিয়ে ডঃ হকিং-এর কিছু অজ্ঞ উক্তির জবাব প্রদান করা হবে। কোরআন বলে,

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আদি, তিনি অন্ত। তিনি যুগপৎ ব্যক্ত-অব্যক্ত। আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১-৩)।

"তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, দয়াময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী,তিনি প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী, ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ তার চেয়ে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা কীর্তন করে। তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।" (৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াত ২২-২৪)।

"তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়, সম্মানিত আরশের (মহাবিশ্বসহ সমগ্র সৃষ্টির পরিচালনা কেন্দ্র বিশেষ) অধিকারী"। (৮৫ সূরা বুরুজ ঃ আয়াত ১৩-১৫)।

"আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি (আল্লাহ্) তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী"। (১৪ সূরা ইব্রাহিম ঃ আয়াত ৩৪)।

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব (There remaineth but the countenance of *thy* Lord of Might and glory- মুহাম্মদ মার্মাডিউক

www.pathagar.com

পিকথলের অনুবাদ); সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।" (৫৫ সূরা আর-রাহমান, আয়াত ২৬-২৯)।

" আর আমার (আল্লাহর) দাস যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন (তুমি বলো) আমি (আল্লাহ) তো কাছেই আছি।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬)।

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে সেই বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে আর (বলে), হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১ আয়াত)।

"যিনি (আল্লাহ) নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের মতো সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল বলেন, "হও", তখন তা হয়ে যায়। তাই পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; আর তারই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৮১-৮৩)।

"আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৭ আয়াত)।

"আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৬)।

"নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই আদেশ করেন।" (৫ সূরা মায়িদা ঃ ১ আয়াত)।

"আকাশ ও পৃথিবীর এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৭)।

"ওরা কি ওদের সামনে ও পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী আছে তা লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে, পৃথিবী ওদের নিয়ে ধসে পড়বে বা ওদের উপর আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে

www.pathagar.com

প্রত্যেক দাসের জন্য– যে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায়"। (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ৯)।

"আর তার (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ২২)।

" আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন ঃ তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ২৫)।

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদের সংরক্ষণ করবে?" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ ৪১ আয়াত)।

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভূ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট–বিশ্বধাতা। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তারই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ"। (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৫)।

"যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু প্রভূ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, ওরা যা বলে, তা হতে আরশের (আল্লাহর আসন) অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান"। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ২২)।

"আল্লাহর প্রকৃতির (ফিতরাতুল্লাহ্) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল দ্বীন (ধর্ম / বিধান); কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৩০)।

উপরোক্ত বক্তব্যে যা বিধৃত হয়েছে, তা ডঃ হকিং-এর দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হকিং পদার্থবিদ্যার ফাঁকে ফাঁকে অন্য প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তার গ্রহণযোগ্যতা নেই প্রকৃত জ্ঞানীদের নিকট।

'বিগ ব্যাংগ' (মহা বিস্ফোরণ) এর পরবর্তী পর্যায়ে এবং বিশ্বের সীমানা না থাকলে ঈশ্বরের কিছুই করার থাকে না, তিনি শক্তিহীন হবেন এমন মনোভাব

www.pathagar.com

প্রদর্শন ডঃ হকিং-এর শোভা পায় না। তার পঙ্গু ঈশ্বরতত্ত্বের বিরুদ্ধে কোরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। কোরআন বলে,

"আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪৪)।

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন . . . তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন প্রভূ নেই, পৃথিবী ও পরকালে প্রশংসা তাঁরই; বিধান (আইন) তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে।"

"বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন– আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন্ প্রভূ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?"

"বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি– আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন প্রভূ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে– যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবু কি তোমরা ভেবে দেখবে না?" (২৮ সূরা 'কাসাস 'ঃ ৬৮, ৭০-৭২ আয়াত)।

ইসলামের ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা ডঃ হকিং থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হকিং-এর ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁর ধর্মীয় গোষ্ঠীর হতে পারে। ডঃ হকিং-এর ঈশ্বরতত্ত্বের উপর প্রকৃত মুসলমান কখনই একমত হতে পারে না। ইসলামের ঈশ্বর মহা শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী ও মহাস্রষ্টা। তিনি ডঃ হকিং-এর মনোমত অক্ষম ও পঙ্গু নন।

বিশ্বের সীমারেখা

ড: হকিং তাঁর " এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" বইয়ে "কোয়ান্টাম থিওরি অব গ্রাভিটি" নামে একটি নতুন থিওরি প্রদান করেছেন অবশ্য প্রস্তাব হিসাবে। তিনি বলেন,

"I'd like to emphasize that this idea that time and space should be finite without boundary is just a *proposal;* it cannot be deduced from some other principle, Like any other scientific theory, it may initially be put forward for aesthetic or metaphysical reasons, but the real test is whether it makes predictions that agree with observation. (page 144).

www.pathagar.com

(অনুবাদ ঃ আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এই ধারণা যে সময় বা কাল ও স্থান সীমিত কিন্তু সীমানাহীন এটি একটি প্রস্তাবনা মাত্র। এই তত্ত্ব অন্য কোন থিওরি থেকে টানা যায় না। যে কোন বৈজ্ঞানিক থিওরির ন্যায়, এই তত্ত্ব প্রাথমিক অবস্থায় নন্দনতাত্ত্বিক বা দার্শনিক কারণে উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু এর আসল যাচাই হবে যদি এর ধারণাসমূহ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়" (পৃষ্ঠা ১৪৪)।

ডঃ হকিং এই প্রস্তাবিত থিওরি সম্পর্কে লিখেন, "One could say: 'The boundary condition of the universe is that it has no boundary," The universe would be completely self-contained and not affected by anything outside itself. It would neither be created nor destroyed. It would just BE" (Page 144).

অনুবাদ ঃ মাধ্যকর্ষণের কোয়ান্টাম মতবাদের আলোকে একজন বলতে পারে: 'বিশ্বের সীমারেখার পরিস্থিতি হলো এই যে, এর কোন সীমা নেই।' বিশ্ব হলো সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর বাইরে থেকে কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবন্বিত নয়। বিশ্বকে না সৃষ্টি করা যায়, না ধ্বংস করা। এটার অবস্থা শুধু স্থিতি। (পৃষ্ঠা ১৪৪)।

ডঃ হকিং আরো লিখেন,

"The idea that space and time may form a closed surface without boundary also has *profound* implications for the role of god in the affairs of the universe . . . So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have niether beginning nor end: it would simply be, what place, then, for a creator?" (Page 149) . (অনুবাদ ঃ প্রস্তাবিত মাধ্যকর্ষণের কোয়ান্টাম মতবাদ অনুযায়ী স্থান ও সময়বদ্ধ অবয়বে সীমারেখা বিহীন হলেও এই তত্ত্বের গভীর প্রভাব ফেলবে বিশ্ব পরিচালনায় ঈশ্বরের দায়িত্ব প্রসঙ্গে। ... এতদিন মনে করা হতো যে বিশ্বের একটি সূচনা রয়েছে, তাই আমরা মনে করতাম এর একজন স্রষ্টা আছে। কিন্তু যদি বিশ্ব সত্যিকারভাবে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, এর কোন সীমারেখা বা প্রান্ত না থাকে, এর কোন সূচনা বা শেষ থাকবে না; বিশ্বের শুধু থাকবে স্থিতি। তাহলে, স্রষ্টার কি প্রয়োজন রয়েছে? (পৃষ্ঠা ১৪৯)।

ডঃ হকিং-এর উপরোক্ত মন্তব্যগুলো ফিজিকস্ (পদার্থবিদ্যা) সম্পর্কিত, না

www.pathagar.com

মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা) সম্পর্কীয়? ডঃ হকিং দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে ব্যঙ্গ করলেও, তিনি পদার্থবিদ্যা ডিঙিয়ে মেটাফিজিক্সে হাজির হয়েছেন এবং মেটাফিজিক্সে বিচরণ করে স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা, অপ্রয়োজনীয়তা এসব বিভ্রান্তির অবতারণা করেছেন। তাছাড়া তার মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম মতবাদ শুধু একটি প্রস্তাব মাত্র। একটি অপরীক্ষিত প্রস্তাব দ্বারা ঈশ্বরের সিংহাসন টলানো বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবিদ্যা গ্রাহ্য কি?

এরিস্টটল ও অনেক গ্রীক পণ্ডিত অবশ্য সৃষ্টি (ক্রিয়েশন) সম্পর্কে স্পর্শকাতর ছিলেন। 'সৃষ্টি' বললে 'স্রষ্টা' এসে যায়। তাই তারা বলতেন, মানবজাতি ও বিশ্ব আছে এবং থাকবে চিরকাল। তাদের মতে 'সৃষ্টি' প্রসঙ্গটি অবান্তর। তবে তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ, গ্রীক ধর্মগুরুরা যে সব মূর্তিকে স্রষ্টা বলে চালিয়েছে, তাদের কোন বৈজ্ঞানিক স্রষ্টা বলে মানবে? এরিস্টটল ও টলেমী তো এও মনে করতেন যে, বিশ্বের কেন্দ্র হলো পৃথিবী, আর চন্দ্র, সূর্য, তারকারাশি, গ্রহ-উপগ্রহ–সবই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু পৃথিবী স্থির। 'বিগ ব্যাংগ" থিওরি আবিষ্কারের পরে যখন বিশ্ব 'একটি সৃষ্টি' এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন একদল বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে তাড়ানোর জন্য 'Steady State Theory' (স্থির-স্থিতি মতবাদ) প্রচার করেন ১৯৪৮ সালে। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব সাধারণভাবে সব সময় ও সব স্থানে একই স্থিতিতে রয়েছে। এর ফলে স্রষ্টার তেমন প্রয়োজন পড়ে না আর কি।

১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন কর্তৃক 'বিগ-ব্যাংগ' কালীন সময়ের মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন আবিষ্কারে 'সৃষ্টি' সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়াতে 'ষ্টিডি স্টেট থিওরি' অচল হয়ে গেল। ডঃ হকিং অবশ্য তবু মন্তব্য করেন, "The theory (of steady state) was a good scientific theory" (page 51) . (অনুবাদ ঃ স্টিডি স্টেট থিওরি একটি ভালো বৈজ্ঞানিক থিওরি। পৃষ্ঠা ৫১)। স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা নেই বলা যাবে বলে ডঃ হকিং হয়ত 'স্টিডি স্টেট থিওরি'র প্রশংসা করে থাকবেন। একই পৃষ্ঠায় তিনি অবশ্য বলতে বাধ্য হন পেনজিয়াস ও উইলসনের ১৯৬৫ সালের গবেষণার প্রসঙ্গে, "The steady state theory therefore had to be abandoned" (Page 51)। (অনুবাদ ঃ অবশেষে স্টিডি স্টেট থিওরিকে বর্জন করতে হলো, পৃষ্ঠা ৫১)।

ডঃ হকিং একদিকে বলছেন যে, বিশ্ব একটি 'সারফেস' (অবয়ব) দ্বারা বদ্ধ, আবার বলছেন যে, তবু এর স্থান ও সময়ের কোন সীমা বা প্রান্ত নেই। তাঁর মতে, তাছাড়া বিশ্বের সূচনা নেই, শেষ নেই, বিশ্ব হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে,

www.pathagar.com

বিশ্ব আছে, এটিই সত্য। এসব কথাই অবশ্য তিনি তাঁর প্রস্তাবিত (পরীক্ষিত নয়) মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম থিওরি অনুযায়ী বলতে চান। কিন্তু এসব কথার আসল উদ্দেশ্য হোল এটা প্রমাণিত করা যে, স্রষ্টা নেই, এই প্রস্তাবিত থিওরি অনুযায়ী। তিনি জোর দিয়ে বলেননি যে, এই নতুন থিওরি পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রমাণিত থিওরি। তিনি এই থিওরিকে নন্দনতত্ত্ব বা দর্শনের নামে চালাতে চেয়েছেন। দর্শনকে ব্যঙ্গ করে একটি প্রস্তাবিত পদার্থবিদ্যার থিওরিকে দর্শনের নামে চালানো সঠিক মনে হয় না।

মোটকথা, বিশ্বের সীমারেখা নেই একথা দ্বারা ডঃ হকিং কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। আর বিশ্বের সীমারেখা থাকলে ঈশ্বর আছেন, সীমারেখা না থাকলে ঈশ্বর নাই– ডঃ হকিং-এর এ তত্ত্ব অযৌক্তিক। ঈশ্বরের থাকা-না থাকা বিশ্বের সীমারেখার উপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বর সীমাবদ্ধ বিশ্ব, কিম্বা সীমানাহীন বিশ্ব (ডঃ হকিং যেভাবে এই সীমানাকে বুঝতে চান) কিম্বা অন্য প্রকারের বিশ্ব–সব প্রকারই সৃষ্টিতে সক্ষম।

সীমারেখা সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর লাইন রয়েছে কোরআন মজীদে। আল্লাহ যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা (সেই সঙ্গে পদার্থবিদ্যার মহাজ্ঞানী সত্তা) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিরাজ (মহাবিশ্ব ও অন্যান্য জগত পরিভ্রমণ) সম্পর্কে বলেনঃ

"নিশ্চয় সে (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (জিবরাঈল ফেরেশতাকে) আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান (বেহেশ্‌ত)। যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত (কুলবৃক্ষটি আল্লাহর নূর দ্বারা আচ্ছাদিত) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে (রাসূল) তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" (৫৩ সূরা নযম ঃ আয়াত ১৩-১৮)।

আল্লাহ নিজেই মহাবিশ্ব ও বেহেশ্‌তের সীমান্তের কথা, উল্লেখ করেছেন– অবশ্য আমাদের বোঝার ভাষা দিয়ে। সীমান্তটি আল্লাহর "মহান নিদর্শনাবলীর" অন্যতম। আল্লাহর নূরের (জ্যোতির) ছটা সেখানে স্পষ্ট। আর এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই। এ কোন্ প্রান্ত, এ কোন্ সীমান্ত? একি মহাবিশ্বের সীমানা? এর পরে কি অন্য জগত? এর পরে কি বেহেশ্‌তের উদ্যান শুরু? বৈজ্ঞানিকগণ তো মহাবিশ্বেরই সীমানা খুঁজে পান নাই, তাই এখন তাদের কেউ কেউ বলছেন যে, এর কোন সীমানা নেই। মহাবিশ্বের পরের জগতের হদিস পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে পেতে হয়ত সময় লাগবে– হয়ত এর হদিস মানুষ

www.pathagar.com

রোজ কিয়ামতের পূর্বেও পাবে না। তবু সত্য সত্যই। আর একটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যায়। মুসলমান পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নীচের দু'টি উদ্ধৃতি নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পারেন। কোরআন বলে ঃ

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।" (৩৭ সূরা সাফফাত ঃ আয়াত ৬)।

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা।" (৩৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৫)।

এতে মনে হয় নক্ষত্ররাজি শুধু আমাদের "নিকটবর্তী আকাশে" বিরাজ করছে। আর "নিকটবর্তী আকাশের" পরিমাণ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পদার্থবিদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ বলছেন যে, মহাবিশ্ব সীমানাহীন। দূরবর্তী আকাশ যেখানে হয়ত তারকারাজি নেই, তার বৈজ্ঞানিক ধারণা এখনও করা যায় নাই। তা-ই কি বেহেশ্‌ত-দোযখ তথা আরশের এলাকা? সেই সীমান্তেই কি 'সিদরাতুল মুনতাহা' (প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষ)? মানুষ প্রাথমিক আকাশের হিসাবই মিলাতে পারে নাই এখন পর্যন্ত, আর কোরআনের ভাষা অনুযায়ী সাত আকাশের হদিস মানুষ কবে পাবে কে জানে। তবু মানুষের গবেষণা অব্যাহত থাকতে পারে। আর মানুষ এসবের হদিস পেলেও আল্লাহর ক্ষমতার কোনই কমতি হবে না। আর মানুষেরও অহঙ্কারী হয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না- কিছু একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের পরিণতিতে।

ডঃ হকিং-এর স্ব-বিরোধিতা

ডঃ হকিং "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পুস্তকে লেখেন :

"Any physical theory is always provisional, in the sense that it is only a hypothesis: you can never prove it. No matter how many times the results of experiments agree with some theory, you can never be sure that next time the result will not contradict the theory" (page 11). [অনুবাদ ঃ পদার্থবিদ্যার যে কোন থিওরি সাময়িক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে, এটা শুধু একটি অনুমান। তুমি কখনই এটাকে প্রমাণ করতে পার না। এটা যায় আসে না কতবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থিওরির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তুমি কখনই নিশ্চিত হতে পারবে না যে পরেরবার পরীক্ষার ফলাফল থিওরির বিরুদ্ধে যাবে না (পৃষ্ঠা ১১)।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ডঃ হকিং-র স্ব-বিরোধিতা প্রতীয়মান হবে। তিনি

www.pathagar.com

তার নতুন থিওরি প্রস্তাবিত মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম থিওরি দ্বারা ঈশ্বরকে বিতাড়িত করতে চাইলেও তার মন্তব্য থেকেই নতুন থিওরির বিপর্যয় ফুটে উঠেছে। ঠিকমত যাচাই না করে এসব থিওরি পুরাপুরি গ্রহণে বিপদ রয়েছে। সত্যিকারের জ্ঞানীগণ তা কখনও করবেন না।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন তাঁদের বইয়ের ২৬৬ পৃষ্ঠায় একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে "সময়ের দিক (The Direction of Time) শিরোনামে এক বক্তৃতায় হকিং বলেন যে, ভবিষ্যতে এক সময় মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হবে এবং তখন কাল বা সময় উল্টা পথে চলবে (Time would reverse)। তিনি বলেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণকালে যা যা হয়েছিল তা সবই আবার ঘটবে তবে উল্টো পথে– বিপরীতভাবে। অনেকেই তাঁর এই মতের সমালোচনা করেন। তাঁর সহকর্মী গবেষক ডন পেজও এ মত মানেন নাই। ১৯৮৬ সালে ১৮ মাস পরে হকিং শিকাগোতে আবার বক্তৃতা দিতে এসে বলেন যে, ১৯৮৫ সালে তিনি ভুল কথা বলেছিলেন। তিনি এবার বলেন যে, বিশ্ব সঙ্কোচনের সময়ে সময় বা কাল উল্টো পথে (reverse) যাবে না। হকিং তো নিজেই স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। তার বাকী গবেষণাসমূহও কি টিকবে ভবিষ্যতের গবেষণার উন্নতিতে?

ব্যক্তি হকিং

ডঃ হকিং একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ। পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে তিনি যা বলতে চান তা নিশ্চয়ই গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হতে পারে। তবে ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), দর্শন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গে তাঁর বিভ্রান্তিপূর্ণ মতামত গ্রহণ করা, না করা তাঁর পাঠকের মন-মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। ডঃ হকিং যেহেতু একজন বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদ, তাই তার মনের ঔদার্য প্রসারিত বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তার এক মন্তব্যে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে বাছাই করে করে কটাক্ষ করা কি সেই খৃষ্টীয় ক্রুসেডের অবশিষ্টাংশ? তিনি তো আবার মানুষের ডিএনএ-এর ভিতর মানুষের আগ্রাসনী প্রবৃত্তির নিহিতের থিওরিতে বিশ্বাসী। তবে কি তাঁর জিনে (gene) সেই মধ্যযুগীয় মুসলিম বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে?

ডঃ হকিং তাঁর "Blackholes and Baby Universes and other essays" বইয়ে "বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি" প্রবন্ধে লেখেন,

"ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে পূর্ব-পশ্চিমের ভিতরকার উত্তেজনা

www.pathagar.com

অনেকটাই কমেছে। এর অর্থ হল পারমাণবিক অস্ত্রের ভীতি গণচেতনার পিছনের সারিতে স্থান নিয়েছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হত্যা করার মতো অস্ত্র রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত বিপদও রয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলিতে পারমাণবিক অস্ত্রগুলিকে উত্তর গোলার্ধের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে প্রয়োজন শুধু কম্পিউটারের একটা ভুল কিংম্বা অস্ত্রগুলি চালনা করার দায়িত্ব যাদের রয়েছে– তাদের কয়েকজনের বিদ্রোহ। আর দুশ্চিন্তার বিষয় হল তুলনামূলকভাবে স্বল্প সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিও পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করছে। বৃহৎ শক্তিরা মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আচরণ করে এসেছে, কিন্তু লিবিয়া কিংবা ইরাক, পাকিস্তান, এমনকি আজারবাইজানের মতো রাষ্ট্র সম্পর্কে সে রকম বিশ্বাস থাকা সম্ভব নয়।"

একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিভাবে এমন নগ্ন মুসলমান বিরোধী মন্তব্য করতে পারেন? তাহলে কি তিনি যখন এ ধরনের কথা লেখেন, তখন তার জাতির অতীত ক্রুসেডি পোশাক পরে লেখেন?

পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহকারী ও পারমাণবিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ও ইসরাঈলকে কেন হকিং-এর চোখে পড়ে না? ইউরোপ ও বৃহত্তর আমেরিকার অন্য বহু রাষ্ট্র পারমাণবিক জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী। সামান্য নোটিশে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের যোগ্যতা ও মাল-মসলা তাদের হাতের মুঠায় রয়েছে।

ডঃ হকিং-এর মতে, "বৃহৎ শক্তিরা মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আচরণ করে এসেছে", কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রগুলি . . .। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে যুক্তরাষ্ট্র কি "যুক্তিপূর্ণ আচরণ" প্রদর্শন করে? নাগাসাকি ও হিরোশিমা কি ক্যান্টনমেন্ট ছিল? সেখানে তো সাধারণ, বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়। পৃথিবীতে তো প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র শ্বেতাঙ্গরাই নিক্ষেপ করল। এখনও তারাই এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। এ তথ্যটি "গিনিস বুকে" রেকর্ড হিসাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

কথায় বলে, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' এ নিবন্ধটির শেষ অংশ লেখার সময় ডঃ হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইটির বাংলা অনুবাদ (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত) আমার হাতে এল। অনুবাদক ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত। 'অনুবাদকের নিবেদন অংশে" তিনি লেখেন ঃ

"আমরা জানি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জন্মদিন ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর– অর্থাৎ কলম্বাসের বাহামা দ্বীপে অবতরণের তারিখ। না, কলম্বাস

www.pathagar.com

আমেরিকা আবিষ্কার করেননি। তিনি করেছিলেন আক্রমণ। কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেনঃ আদিবাসীদের সম্পদ আছে, কিন্তু মারণপ্রযুক্তিতে ওরা হীন। লুণ্ঠনের চাইতে লাভজনক কিছু নেই। লুণ্ঠন বজায় রাখতে হলে মারণপ্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োজন।"

"কলম্বাসের এই মহান আবিষ্কার আজও বিশ্বের লুণ্ঠনকারীদের জীবনদর্শন"। (পৃষ্ঠা ১৮)।

ডঃ হকিং-এর দ্বিতীয় বই "Black holes and Baby Universes and Other Essays" এর অনুবাদও হাতের কাছে পেলাম। অনুবাদ গ্রন্থের নাম "কৃষ্ণ গহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা"। একই অনুবাদক হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছেন। 'অনুবাদকের কথা' অংশে ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত লেখেন,

"বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখা হওয়ার ফলে অনেক সময় মনে হয়েছে– লেখক (হকিং) নিজেই নিজের মতের বিরুদ্ধতা করেছেন।

একটি উদাহরণ ঃ

একটি প্রবন্ধে লেখক (হকিং) আশা করছেন "ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার হলে মানুষ মহাবিশ্বের উপর প্রভূত্ব স্থাপন করতে পারবে।"

অনুবাদক মন্তব্য করেন,

"অপরের উপর প্রভূত্ব করতে মানুষ ভালবাসে। এমনকি ভবিষ্যতে প্রভূত্ব করার সম্ভাবনা কিংবা অতীতে প্রভূত্ব করার স্মৃতিও মানুষকে আনন্দ দান করে। কিন্তু কোনও জাতি কিংবা গোষ্ঠীর উপর প্রভূত্ব শুরু হয় আগ্রাসন দিয়ে। দিনের পর দিন সেই প্রভূত্ব বজায় রাখতে হলেও প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন আগ্রাসন।

অন্য জায়গায় লেখক (হকিং) একাধিকবার বলেছেন, মানুষের আগ্রাসন প্রবৃত্তি প্রোথিত রয়েছে মানুষের জিনে (gene) অর্থাৎ বংশগতিতে এবং এই আগ্রাসন প্রবৃত্তির অস্তিত্বের ফলেই মনুষ্যজাতির অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আগ্রাসন ইত্যাদির বিরুদ্ধে অধ্যাপক হকিং বার বার মত প্রকাশ করেছেন। তাহলে এ স্ববিরোধের কারণ কি?"

অনুবাদক লিখেন, "শ্বেতাঙ্গরা দু'তিন শতাব্দী পৃথিবীর উপর প্রভূত্ব করেছে। এই প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এর আগে দু'-তিন শতাব্দী প্রথিবীতে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা চালিয়েছে। নরহত্যা না বলে বোধহয় গণহত্যা

www.pathagar.com

শব্দটাই বেশী উপযোগী হবে, থুড়ি, সেটাও হল না। ওদের হত্যা করতে হয়েছিল উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, কৃষ্ণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার জনগণকে। তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের কি নামকরণ করা যায়? মহা হত্যা? মহা মহা হত্যা? না অষ্টোত্তর শত মহাহত্যা? কোনওটাই আমার পছন্দ হল না। এই হত্যাকারীদের সামনে তৈমুর লং আর চেঙ্গিস খাঁ নেহাতই শিশু।

আসলে এ হত্যাকাণ্ড প্রকাশ করার ভাষা নেই। বোধহয় সংস্কৃতে নেই, ইংরেজীতেও নেই।

এ ব্যাপারে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের ভিতর ইংরেজ জাতিই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এবং তাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য ইংরেজ উচ্চশ্রেণী।"

অনুবাদক লেখেন, "অধ্যাপক হকিং-এর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে দেখা যায়, তাঁর জন্ম ইংরেজ উচ্চশ্রেণীতে এবং ঐ শ্রেণীতেই তিনি পালিত, ।... শ্বেতাঙ্গ উচ্চশ্রেণীর মানুষদের মতো প্রভূত্বের এই আকাঙ্ক্ষা কি অধ্যাপক হকিং-এর রক্তেও জন্মসূত্রে প্রোথিত?"

আমরাও ইতিহাস ঘেটে দেখি মানবজাতির ইতিহাসে যদি সবচেয়ে বেশী মানুষ হত্যা হয়ে থাকে তা ইউরোপীয়ানদের হাতেই হয়েছে। রেডইন্ডিয়ান, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার আদিম অধিবাসী, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কয়েক কোটি মানুষ হত্যা, প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ– এইসবে রেকর্ড করেছে ইউরোপীয়গণ। ইংরেজরা বাংলা দখল করে যে সব দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে তাতে এ এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করেছে। নইলে বাংলাভাষী জাতি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারত আজ। এত কিছু সত্ত্বেও ডঃ হকিং মুসলমানগণকে বিশ্বাস করতে পারেন না, আর তাঁর কথায়, "বৃহৎ শক্তিরা মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আচরণ করে এসেছে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুই বিঘা জমি" কবিতার শেষ লাইনগুলো মনে পড়ে হকিং-এর পদার্থবিদ্যা বহির্ভূত মন্তব্যের জন্য ঃ

আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিগ মাগি মহাশয়!'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!'
আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে–
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে॥"

ডঃ হকিং-এর চোখে বৃহৎ শক্তিরা হলো সাধু, আর মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা যায় না।

ইংল্যাণ্ডের সেন্ট আলবানস শহরের সেন্ট আলবানস স্কুলে (যা একটি খ্রীস্টীয় গির্জা প্রাইভেট স্কুল) পড়াশুনার সময়ে হকিং সমকামে জড়িত ছিলেন। তাঁরই এক সহপাঠী তাঁদের সেই সমকামী দলের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন। Michael white এবং Dr.John Gribbin (মাইকেল হোয়াইট এবং ডঃ জন গ্রিবিন) তাঁদের "Stephen Hawking A life in Science" জীবনী গ্রন্থে লেখেন, "One of the group has science intimated that there was an undoubted tinge of school boy homosexuality about the whole thing" (Page 15).

(অনুবাদ ঃ দলের একজন পরবর্তীতে জানায় যে, পুরা ব্যাপারটিতে, যা ছিল মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে একত্রিত হওয়া, নিশ্চিতভাবে ছিল স্কুল জীবনের সমকামী কার্যকলাপ (পৃষ্ঠা ১৫)। হকিং এই সমকামী দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হকিং-এর জীবনী লেখক মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন লেখেন যে, হকিং-এর মা'র প্রভূত প্রভাব ছিল হকিং-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপরে। "Isobel (mother of Hawking) had an indisputable influence on her eldest son's (Hawking's) political ideas. She like many other English intellectuals of the period had been a member of the communist party in the thirties, gradually moving towards the Labour Party by the fifties . . . stephen (Hawking) did not become a communist but his interest in politics and left- wing sympathies have never left him (pages 13-14).

|অনুবাদ ঃ ইসোবেল (হকিং-এর মা)-এর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল তাঁর বড় ছেলের (হকিং) রাজনৈতিক ধ্যানধারণায়। সে সময়ের অনেক ইংরেজী বুদ্ধিজীবীর ন্যায় ইসোবেল বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন, আর পঞ্চাশ দশকে তিনি ধীরে ধীরে লেবার পার্টীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। . . . স্টিফেন (হকিং) কমুনিস্ট হন নাই, কিন্তু রাজনীতিতে আগ্রহ ও বামপন্থী ধ্যানধারণায় তাঁর সহানুভূতি কখনও লোপ পায় নাই। (পৃষ্ঠা ১৩-১৪)।

হকিং-এর এই বামপন্থী মনোভাব ও রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর ধর্মচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তাকে প্রভাবিত করে। আর তাই ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর কটাক্ষ সেই বাম ধারণার ফল। এ ধারণা বিজ্ঞানের গবেষণার ফল নয়, বাম মতবাদের ফল।

www.pathagar.com

কাজেই ঈশ্বর সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না– যুক্তির কষ্টিপাথরে।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন ব্রিটেনের Anglia Televison -এর এক প্রযোজক David Hickman (ডেভিড হিকম্যান)-এর মন্তব্য উদ্ধৃতি করে লেখেন ঃ

Cambridge University is a very tight community, there are numerous rivalries, jealousies, animosities". (page 281) [অনুবাদ ঃ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাসিবৃন্দ একটি আটসাট সমাজে বসবাস করে। সেখানে রয়েছে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা ও শত্রুতা (পৃষ্ঠা ২৮১)।]। আর ডঃ হকিংও এ থেকে দূরে নন– ক্যামব্রিজে বসবাস করে।

হকিং-এর বিবাহিত জীবন

চিকিৎসকগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, হকিং না তাঁর অসুখ থেকে বাঁচবেন, না জনক হতে পারবেন। মিস জেন ওয়াইল্ড (Jane wilde) নামে এক যুবতী হকিং-এর দুরারোগ্য ব্যাধি সত্ত্বেও তাঁকে বিবাহ করেন। জেন বলেন, "I've never known a fit, able-bodied Stephen. (সূত্র ঃ মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ৭০)। [অনুবাদ ঃ আমি কখনই সুস্থ, সবল হিসাবে স্টিফেন হকিংকে পাই নাই] জেন আরো বলেন, " I wanted to find some purpose to my existence and I suppose I found it in the idea of looking after him." (সূত্র ঃ ঐ, পৃষ্ঠা ৯০)। [অনুবাদ ঃ আমার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি মনে করি যে, হকিং-এর দেখ-ভাল করাতে আমি সে উদ্দেশ্য পাই]।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন, "For Hawking his engagement to Jane was probably the most important thing that had ever happened to him; it changed his life, gave him something to live for and made him determined to live. Without the help that Jane gave him, he almost certainly would not have been able to carry on or had the will to do so" . (পৃষ্ঠা ৭০)। [অনুবাদ ঃ জেনের সঙ্গে বিবাহের পাকাপাকি কথা হকিং-এর জীবনের সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বাঁচার জন্য একটা উপলক্ষ প্রদান করে এবং তাঁকে বাঁচতে মনোবল জোগায়। জেনের সাহায্য ছাড়া, হকিং এগুতে সুনিশ্চিতভাবে সমর্থ হতেন না, আর তাঁর ইচ্ছাও হতো না এগোতে]।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে হকিং ও জেনের বিয়ে হলো। মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিনের বর্ণনা অনুযায়ী জেন তার মাথায় ভেল' (পর্দা / মুখাবরণ) পরিধান করল (তাহলে মুসলমান মেয়েদের পর্দা, মুখাবরণ, ওড়না, স্কার্ফে এত আপত্তি কেন ইউরোপের?) বিয়ের অনুষ্ঠানে। জীবনী লেখকদ্বয় লেখেন যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ও অন্য সবাই জানতেন যে, হকিং আর মাত্র কয়দিন বাঁচবেন। "In fact according to medical predications he was already living on borowed time" (Page 91) . [অনুবাদ ঃ আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হকিং-এর ভিতরেই ধার করা সময় নিয়ে টিকে আছেন অর্থাৎ তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। পৃষ্ঠা ৯১]।

এদিকে ঘটনা প্রবাহ অন্য খাতে চলতে থাকে। ডেভিড ম্যাসন নামে ক্যাম্ব্রিজের এক কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ার হকিং-এর জন্য কম্পুটার চালিত ছোট আকারের ভয়েস সিনথেসাইজার (voice synthesizer) তৈরি করেছেন যা হকিং-এর হুইল চেয়ারে লাগানো যায়। এতে তিনি যেখানেই যান এই যন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলার সুবিধা পান। উল্লেখ্য যে, হকিং-এর নিউমোনিয়া হওয়াতে কণ্ঠের স্বর- যন্ত্রে অস্ত্রোপচার করার ফলে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা লোপ পায়।

১৯৯০ সালে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হকিং ও তাঁর স্ত্রী জেন পৃথক হয়ে গেলেন। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন শেষ হলো। একটি পঙ্গু মানুষের সঙ্গে এত দিনের ঘর করাকে একটি 'মডেল' (আদর্শ) হিসাবে দেখা হতো ক্যাম্ব্রিজে। ডঃ হকিংই তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে প্রথমে একটি ফ্ল্যাটে উঠেন যেখানে তাঁর দীর্ঘ দিনের সেবাকারিনী এক মহিলা নার্সকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম এলিন ম্যাসন (Elaine Mason)। এলিন ম্যাসনের সঙ্গে বছরের পর বছর দেশে-বিদেশে কাটাতে গিয়ে হকিং ও জেনের বিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। এই এলিন ম্যাসন হলেন ডেভিড ম্যাসনের স্ত্রী। আর ডেভিড ম্যাসন হলেন সেই ইঞ্জিনিয়ার– যিনি ডঃ হকিংকে সচল ও সবাক করতে তাঁর হুইল চেয়ারে একটি ছোট কম্পুটার বাকযন্ত্র সংযুক্ত করে দেন। সে দম্পতির দু'টি সন্তান; আর হকিং-জেন-এর বড় বড় তিনটি সন্তান রয়েছে। হকিং-এর বড় ছেলে রবার্টের বয়স ২৩, মেয়ে লুসি ২০, আর ছোট ছেলে টিমোথি ১১ বৎসরের এ সময়ে। বড় দু'সন্তান পিতা-মাতার বিচ্ছেদকে স্বাভাবিকভাবে দেখলেও, ছোট ছেলে টিমোথি বড় আঘাত পায় মনে। হকিং তাঁর সাহায্যকারী কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ারের বউকে নিজ ঘরে তুলে সাহায্যকারীর উপকারের যোগ্য প্রতিদানই দিয়েছেন! মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন,

"Stephen loves company of women, he enjoys flirting, he

www.pathagar.com

appreciates physical beauty: why else would he have a poster of marilyn Monroe in his office? Hawking's relatonship with Elaine Mason is not one based on pity or other such feeble foundations. According to Schramm (one of Hawking's oldest and closest friends who is now at the university of Chicago), who has spent a lot of time with the couple, there is a genuine love between them." (page 288) . [অনুবাদ ঃ স্টিফেন হকিং মেয়েদের সাহচর্য পছন্দ করেন, তিনি মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি উপভোগ করেন। তিনি শারীরিক সৌন্দর্যের কদর করেন, না হলে কেন তার দফতরে চিত্র-তারকা মেরিলিন মনরোর ছবি থাকবে? ডেভিড ম্যাসনের স্ত্রী এলিন ম্যাসনের সঙ্গে হকিং এর সম্পর্ক হকিং এর উপর করুণা বা অন্য কোন দুর্বল ভিত্তির উপরে ছিল না। ডেভিড স্ক্রামের (হকিং-এর একজন অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যিনি বর্তমানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত) মতে, যিনি হকিং ও এলিন ম্যাসনের সঙ্গে অনেক সময় কাটান, হকিং-এলিন জুটির ভিতরে সাচ্চা মহব্বত লক্ষ্য করেন। (পৃষ্ঠা ২৮৮)]।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিনের মতে, (পৃষ্ঠা ১২৬) হকিং-এর পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্ক্রাম জানিয়েছেন যে, হকিং অসংশোধনীয়ভাবে নারী আসক্ত ছিলেন ও তাঁর চোখ সাংঘাতিকভাবে খারাপ ছিল। স্ক্রামের মতে, হকিং বিখ্যাত হওয়ার পূর্ব থেকেই মেয়েরা হকিং-এর ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। হোয়াইট ও গ্রিবিন বলেন যে, ডেভিড স্ক্রামের স্ত্রী জুডি (Judy) হকিং-এর সঙ্গে প্রথম দেখা থেকেই হকিং-এর জন্য পাগল হয়ে যান এবং হকিং-এর মৌখিক ভঙ্গি দর্শনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

হকিং-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জেন দুঃখ করে বলেন যে, তিনি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারবেন না এটি ভেবে যে, ক্যাম্ব্রিজে হকিং-এর বাসাতে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ছিল তাদের ভাগ্য–যেন তা কৃষ্ণ গহ্বর-এর গভীরতম প্রদেশ থেকে ঝলমলে পুরস্কার-পদক পর্যন্ত। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হকিং-এর দুর্দিন ও সুদিন উভয়ই তার চোখের উপর দিয়ে গেছে।

ডঃ হকিংই যে বিয়ে ভাঙ্গতে দোষী তা বোঝা যায় তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, "আমার ট্রাকিওষ্টমি অপারেশনের পর আমার চব্বিশ ঘণ্টা নার্স লাগত। তার ফলে বিয়েটার উপর ক্রমশ বেশী বেশী চাপ পড়ছিল। শেষে আমি বেরিয়ে এলাম। এখন আমি থাকি কেম্ব্রিজে একটি নতুন ফ্ল্যাটে। আমরা এখন আলাদা থাকি"। (সূত্র ঃ কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা", স্টিফেন হকিং, পৃষ্ঠা ১৫৪)। উল্লেখ্য যে, এ সময় হকিং তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তাঁর নার্সকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকেন আর নার্সটি হলেন মিসেস এলেন ম্যাসন, যিনি হকিং-এর এক শুভাকাঙ্ক্ষীর বিবাহিতা স্ত্রী ও দু'সন্তানের জননী।

www.pathagar.com

হকিং ও ধর্ম

মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন লেখেন, "He (Hawking) had never been attracted by religion or any thought of an after life" (Page 62) . [অনুবাদ ঃ ডঃ হকিং কখনও ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন নাই; তিনি পরকাল সম্পর্কেও ভাবেন নাই (পৃষ্ঠা ৬২)]।

যুবক বয়স থেকেই হকিং-এর ধর্মে কোন আগ্রহ ছিল না। আর কিভাবেই বা থাকবে? খৃষ্ট ধর্মের চেহারা দেখে ও বিকৃত বাইবেল পাঠ করে একজন বৈজ্ঞানিক ধর্ম সম্পর্কে আরো বিরোধিতা করেন। তবে দুঃখ যে, ডঃ হকিং কোটি কোটি কিলোমিটার দূরের কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে আগ্রহী হলেও, ঘরের কাছের সত্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি কোরআন মজীদ পাঠ করলে এবং ইসলাম সম্পর্কে সামান্য আগ্রহ দেখালে হয়ত বদলে যেতে পারতেন।

পদার্থবিদ্যার ফাঁকে ফাঁকে ডঃ হকিং ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নানা বক্তব্য ও মন্তব্য করেছেন। এর বেশীরভাগই অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য। মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন, " The sign on his office door which reads 'Quiet please, The Boss is Asleep' must be read in the spirit in which it was intended as a joke (Page 290). [অনুবাদ ঃ তার দফতরের দরজায় লেখা আছে, 'চুপ করুন, সাহেব ঘুমাচ্ছেন'। এটাকে অবশ্য নিতে হবে সেই মনোভাবে যা এর উদ্দেশ্য— মশ্‌করা হিসাবে (পৃষ্ঠা ২৯০)। এতবড় একজন জ্ঞানী প্রফেসরের দরজায় এমন একটা মিথ্যা ঘোষণা, বিবৃতি কি শুধু মশ্‌করা হিসাবে নেওয়া হবে? এটা কি মানুষ হকিং-এর মনকে অন্যের সামনে তুলে ধরছে না? তাঁর এই ঘুমকে যেমন বিশ্বাস করা যায় না, তেমনি 'ঈশ্বর নেই' বা 'ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নেই' বা "ঈশ্বরের বাবা কে'– তাঁর এসব উক্তিকেও মশ্‌করা হিসাবে নিতে হবে–এসব উক্তিতে সত্য কি আছে? বিখ্যাত ইমাম বোখারী হাদীস সংগ্রহে বহুদূরে এক বুযুর্গ হাদীস বিশারদের বাড়ীতে গিয়ে বুযুর্গকে খাদ্যবিহীন পাত্র তার পলায়নপর ঘোড়াকে দেখিয়ে ঘোড়াটিকে ধরতে দেখে ইমাম বোখারী সেখান থেকে ফিরে আসেন; বুযুর্গের কোন হাদীসই গ্রহণ করেন নাই এ যুক্তিতে যে, তাঁর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ তিনি যদি একটি ঘোড়াকে ধোঁকা দিতে পারেন– পাত্রে খাদ্য না রেখে খালি পাত্র দেখিয়ে তাকে ধরতে, তাহলে তাঁর (বুযুর্গের) বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। হকিং যে 'ঈশ্বর নেই' বলে মশ্‌করা করছেন না, তা কে বলবে? তাই হকিং-এর ঈশ্বরতত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য

www.pathagar.com

নয়– গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশ্য মিথ্যা বলা মানুষকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? হোক না তা ছোট মিথ্যা।

মাইকেল হোয়াইট ও ডঃ জন গ্রিবিন লেখেন, "It is not only conventional religion for which Hawking feels extreme scepticism . . . and he has no time for mysticism or metaphysics in any shape or form (Page 170) .

[অনুবাদ ঃ শুধু প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে হকিং-এর প্রবল অবিশ্বাস নয় . . . মিসটিসিজম (অতীন্দ্রিয়বাদ) ও মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা / দর্শন) তা যে কোন ধরনের বা রূপেরই হোক, হকিং এর কোন সময় ছিল না তা অনুধাবনের জন্য। (পৃষ্ঠা ১৭০)]। হকিং ফিজিক্স (পদার্থবিদ্যা) নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, কিন্তু তার লেখা ও বক্তব্যে মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা/দর্শন) নিয়ে নানা কথা লেখেন ও বলেন। তবে মেটাফিজিক্স ও মিসটিসিজম সম্পর্কে তাঁর কোনই সময় ছিল না পড়াশুনা, আলোচনা বা জানার, কিন্তু সেসব বিষয়ে তিনি কাঁচা বক্তব্য ও মন্তব্য রাখেন যা শুধু বিভ্রান্তিই ছড়ায়। তিনি শুধু খৃষ্টবাদ, ত্রিত্ববাদ, গির্জা ও পোপ সম্পর্কেই জানেন তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থান থেকে। তবে তিনি ইসলাম সম্পর্কে কোন পড়াশুনা করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই খৃষ্টবাদের সমালোচনা ইসলামের উপর বর্তাতে পারে না। হকিংকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে ইসলাম, কোরআন ও হাদীসের কোন্ তত্ত্ব, মন্তব্য, বক্তব্য ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয় তাঁর কাছে।

"এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" থেকে ডঃ হকিং-এর আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন,

"So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end: it would simply be. What place, then for a creator? (pages 140-141).

[অনুবাদ ঃ যতদিন মহাবিশ্বের শুরু রয়েছে মনে করা হতো, আমরা মনে করতে পারতাম যে, একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি সত্যি সত্যি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। আর তার কোন সীমানা বা কিনারা নেই, এর কোন শুরু বা শেষ নেই, মহাবিশ্ব শুধু আছে, তাহলে স্রষ্টার কোন স্থান থাকে কি? (পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১)। আর মহাবিশ্বের কোন কিনারা বা সীমা নাই অর্থ হলো– মহাবিশ্বের স্থানের (space) অবস্থা হলো বেলুন বা পৃথিবীর পৃষ্ঠের ন্যায় ভাজ

www.pathagar.com

করা (folded)। (সূত্র ঃ মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ১৮১)। এ ধরনের অবস্থাকে কিনারাহীন ও সীমানাহীন বলে "স্রষ্টা নাই" উপসংহার টানা একটি অযৌক্তিক দাবী। বিশ্ব বা পৃথিবীর কিনারা বা সীমানা থাকলে ঈশ্বর আছেন, আর কিনারা বা সীমানা না থাকলে ঈশ্বর নেই– এ কোন্ যুক্তি? আমরা যদি বলি, বাংলাদেশে গণ্ডার নেই, উটপাখী নেই, হিপোপটেমাস নেই, কাজেই বাংলাদেশে মানুষ থাকে না, মানুষ নেই। মানুষের থাকা-না থাকা কি গণ্ডার, উটপাখী, হিপোপটেমাসের থাকা না থাকার উপর নির্ভরশীল? স্রষ্টা কি কিনারাবিহীন বা কিনারাওয়ালা বিশ্ব সৃষ্টিতে অক্ষম? এদিকে খোদ কিনারা, সীমানার ব্যাখ্যাই তো গোলকধাঁধার মত। ডঃ হকিং তো বলছেন যে, পৃথিবীরও কিনারা নেই, এটা গোলাকার, তাই লোক পৃথিবী থেকে পড়ে যায় না (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম-এর পৃষ্ঠা ১৪৩)।

বৃটেনের Anglia Televison ডঃ হকিং-এর উপর একটি টিভি ফিল্ম করে। এঙ্গলিয়া টিভির এক প্রযোজক ডেভিড হিকম্যান (David Hickman) বললেন যে, ফিল্মটি আসলে ঈশ্বর ও সময় সম্পর্কে ছিল। হিকম্যান বলেন,

"It's very interesting that Stephen (Hawking) has attracted over the religions aspects of his work, as well as the fact that he is close to a number of physicists with deep theological concerns, such as Don Page" . (সূত্র ঃ মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৪)।

[অনুবাদ ঃ এটা বেশ চমকপ্রদ যে, স্টিফেন হকিং-এর প্রতি সবার নজরের কারণ হলো তাঁর কার্যের ধর্মীয় প্রসঙ্গটা আর সেই সঙ্গে তিনি যে ডন পেজের মত ধর্ম পালনকারী পদার্থবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সেই প্রসঙ্গটাও (পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৪)। মোট কথা ফিল্মটা শেষ পর্যন্ত হকিং-এর উদ্ভট ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশের বাহন হয়ে গেল।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন, "Through his work Hawking's early agnosticism had become more overtly atheistic, and with his no-boundary theory he had effectively dispensed with notion of god altogether" (page 285).

[অনুবাদ ঃ হকিং-এর গবেষণার মাধ্যমে তার প্রাথমিক সংশয়বাদ প্রকাশ্য নাস্তিকতায় রূপ নেয় এবং তার সীমাহীনতার তত্ত্ব দিয়ে তিনি সফলভাবে গড্ এর ধারণাটি পুরাপুরিভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেন (পৃষ্ঠা ২৮৫)]। জীবনীকারের এই মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, হকিং শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি নাস্তিক হয়ে যান। যত সম্মান

www.pathagar.com

তাঁর বাড়তে থাকে পদার্থবিদ্ হিসেবে, তত বেশী তিনি নাস্তিক হয়ে যান। তিনি গড্‌কে তাঁর ল্যাবরেটরি (গবেষণাগার) বা বীজগণিতের সমীকরণে খুঁজে পান নাই, কাজেই তাঁর আর কি প্রয়োজন! আসলে খ্রীষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব একজন বৈজ্ঞানিককে কমই তৃপ্ত করতে পারে। দুর্ভাগ্য যে, ডঃ হকিং ইসলামের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার ফুরসত পান নাই।

ছাড়াছাড়ির এক পর্যায়ে হকিং পত্নী জেন এক সাংবাদিককে বলেন যে, তাঁর (জেনের) দায়িত্ব আর হকিং এর মত অসুস্থ মানুষকে দেখা নয়, "but to tell him that he's not god" (Source: Tony Osman, 'A Master of the Universe, and Michael White and John gribbin, 'Stephen Hawking a Life in Science' 'Page 289).

[অনুবাদ ঃ হকিং পত্নী জেন বলেন, "হকিং ঈশ্বর নয়" (সূত্র ঃ টনি ওসমান, 'এ মাস্টার অব দি ইউনিভার্স' এবং মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিনের 'স্টিফেন হকিং এ লাইফ ইন সাইন্স', পৃষ্ঠা - ২৮৯]। আসলে ডঃ হকিং আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত হয়ে পড়ায় নিজ সম্পর্কে বেশী ভাবতে শুরু করেন। বেশী ক্ষমতা, বেশী ধন, বেশী সৌন্দর্য, বেশী ভালো মানুষ– শেষ পর্যন্ত মানুষকে এসব বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করতে পারে। যে স্ত্রী হকিং-এর দুঃখের সময় তার সঙ্গে পঁচিশ বছর কাটালেন, তিনি যদি বলেন "he's not god" (তিনি ঈশ্বর নন) তাহলে এটি খতিয়ে দেখা দরকার। বিভ্রান্ত হকিং কি পদার্থবিদ্যার বড় পণ্ডিত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান? হকিং প্রশ্ন করেন– "Who created god" (সূত্র ঃ হকিং-এর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম', পৃষ্ঠা ১৮৪)। (অনুবাদ ঃ কে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন?) এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অতীতে ফেরাউন ও নমরূদ ঈশ্বরের দাবী করেছিল। অন্যদিকে তারা আসল ঈশ্বরকে অস্বীকার করে।

ডঃ হকিং মনে করেন যে, মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-অন্তর্ভুক্ত (self -contained)। তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে, মহাবিশ্বের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ঈশ্বরের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বাধা কোথায়? মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর ঈশ্বর অপরের উপর নির্ভরশীল, 'কে তার বাবা' এমন প্রশ্ন বাতিলযোগ্য। বাইবেল অধ্যয়ন করে যদি ঈশ্বরের গুণাবলী অনুধাবন না করা যায়, তাহলে ডঃ হকিং একবার কোরআন মজীদ পাঠ করে ঈশ্বরের গুণাবলী অনুধাবন করে নিতে পারতেন।

www.pathagar.com

হকিং-এর নাস্তিকতার বিভিন্ন স্তর

ডঃ স্টিফেন হকিং-এর ঈশ্বরতত্ত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করলে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। এ স্তরে প্রথম দিকে তাঁর ছিল ধর্মে ও ঈশ্বরে অনাগ্রহ। চূড়ান্ত পর্যায়ে তা প্রকৃত নাস্তিকতায় পর্যবসিত হয়। তাঁর যতই মানসম্মান, পুরস্কার, পদক, অর্থ বৃদ্ধি হতে লাগল ততই তিনি ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তা বোধ করতে থাকেন। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা যে বর্ণিত স্তরেই পরিবর্তিত হয়েছে তা নয়। কখনও কখনও এ স্তরগুলো কিছুটা এলোমেলোও হয়েছে, যার ফলে তাঁর ধারণায় একটা স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে।

যাই হোক, প্রাথমিক স্তরে দেখা যায় হকিং ধর্মে তেমন আকৃষ্ট হন নাই.বা পরকালের চিন্তাও করেন নাই (সূত্র ঃ মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ৬২)। চিরাচরিত ধর্মে ছিল হকিং-এর সংশয় (হোয়াইট ও গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ১৭০)।

দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত মনে করেন। তিনি বলেন যে, সম্ভবত 'গড' এমনভাবে কার্য করেন যা বৈজ্ঞানিক আইন দিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা যায় না (হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭)।

তৃতীয় স্তরে দেখা যায়, তাঁর ধারণা যে একশত সহস্র মিলিয়ন ছায়াপথের পার্শ্বদেশে অবস্থিত একটি সাধারণ তারকার (সূর্যের) একটি সামান্য গ্রহের নগণ্য জীব মানুষ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আছে? তাঁর মতে, ঈশ্বর যেন মানুষকে ধর্তব্যেই আনবেন না। (সূত্র ঃ বিবিসি টিভি সম্প্রচার, 'মাস্টার অব ইউনিভার্স'।

চতুর্থ ধাপে তিনি বলেন যে, ঈশ্বরের তেমন করার কিছু ছিল না বিগ ব্যাঙ্গ) (বৃহৎ বিস্ফোরণ)-এর পরে। তিনি অন্যভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে চাইলে তা হতো অনিয়মিত (arbitrary) (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব্ টাইম, পৃষ্ঠা ১২)।

পঞ্চম ধাপে দেখা যাচ্ছে যে, ডঃ হকিং মহাবিশ্বের সীমানাহীনতার তত্ত্ব (No boundary theory) প্রদান করলেন। তিনি বলেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনে প্রায় কোন স্বাধীনতাই ঈশ্বরের ছিল না। এমনকি প্রাকৃতিক বিধি, নিয়মগুলিও বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ঈশ্বরের ছিল না। এ অবস্থায় ঈশ্বরের ধর্ম, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা তোলার সুযোগ পান হকিং। (সূত্র ঃ 'এ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম', পৃষ্ঠা ১৮৪)। হকিং বলেন যে, সীমাহীন

www.pathagar.com

মহাবিশ্বে ঈশ্বরের কোন কার্য ও দায়িত্ব নেই। এ মহাবিশ্ব স্বয়ং অন্তর্ভুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কাজেই ঈশ্বরের কি প্রয়োজন এ মহাবিশ্বে? (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, পৃষ্ঠা ১৪৯)। "সীমাহীনতার তত্ত্ব প্রদানের পর হকিং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেন, তিনি পুরোপুরি নাস্তিক পণ্ডিত হলেন। (সূত্র ঃ হোয়াইট ও গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ২৮৫)। হকিং বলেন যে, সীমাহীনতার তত্ত্বে ঈশ্বরের কোন স্থান থাকে কি?" ('What place, then for a creator?) সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব্ টাইম', পৃষ্ঠা ১৪৯)।

শেষ একটি ধাপে দেখা যায় ডঃ হকিং বলেন "Who created god?" ('ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন? সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, পৃষ্ঠা ১৮৪)।

ডঃ হকিং গবেষণাগারে ঈশ্বরকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। গবেষণাগারে ঈশ্বরকে না পেয়ে ঈশ্বরকেই তিনি বেমালুম গায়েব করে দিয়েছেন। 'কে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন?' এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমাদের দিতেই হয়, তাহলে আমরা কেন প্রশ্ন করতে পারব না, কে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন? তাহলে মহাবিশ্ব কিভাবে 'স্বয়ম্ভু' হয়? 'আদি' একটিই থাকতে পারে; আদির আদি হয় না। আর আদিই হলেন আল্লাহ। কোরআন মজীদ বলে ঃ

"তিনি (আল্লাহ্) আদি, তিনিই অন্ত। তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৩)।

ডঃ হকিং নাস্তিকতা সমর্থন করলেও তিনি নিজের ফাঁদেই ধরা পড়েছেন। তিনি লেখেন, "যদিও একটি সম্ভাব্য সম্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্পর্কে থেকে থাকে, এটা হবে শুধু এক সারি বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুন ও বীজগণিতের সমীকরণসমূহ। এর ভিতর কি সে যা এই সমীকরণসমূহকে জীবন্ত করে এবং মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে তাদের বর্ণনা করতে?" (সূত্র ঃ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, পৃষ্ঠা ১৮৪) "কি সে শক্তি?" প্রশ্ন করেছেন ডঃ হকিং। এতো সেই আল্লাহ–যিনি আদি, যিনি অন্ত! ডঃ হকিং কোরআন মজীদ পাঠ করলে সে শক্তির সন্ধান পেতেন।

হকিং-এর নামের প্রচার

হকিং শরীর ও নার্ভের দিক দিয়ে অসুস্থ। তাঁর অসুখটা নিউরোলজিক্যাল (স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত)। একজন পঙ্গু ব্যক্তি হয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করে চলেছেন, এটা তার পক্ষে প্রচারে সহায়ক হয়েছে। মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন ঃ

www.pathagar.com

"One theorist has been quoted as saying, He's working on the same things everybody else is.He just recieves a lot of attention because of his condition' (Page 230). [অনুবাদ ঃ এক বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক বলেছেন, অন্য বৈজ্ঞানিকগণ যা করছেন, হকিংও একই বিষয়ে তাই করছেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার জন্য তিনি অনেক বেশী অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (পৃষ্ঠা ২৩০)]।

আসলে এই প্রচার ব্যক্তি হকিংকে উচ্চে তুললেও পদার্থবিদ্যার বাইরে তাঁর মতামত অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে। ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর একপেশে, অযৌক্তিক মন্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর নামের প্রচার পরোক্ষভাবে হলেও তাঁর বক্তব্য ইসলামের স্রষ্টাতত্ত্ব ও ইসলামের দর্শনকে আঘাত করতে পারে আর অনেক ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই এতবড় লেখার অবতারণা করা হয়েছে সত্য কথা বলতে।

হকিং-এর পক্ষে-বিপক্ষে

হকিং-এর বহু মন্তব্য, বক্তব্য, লেখা বিতর্কমূলক হলেও তাঁর "ব্ল্যাকহোল" (কৃষ্ণগহ্বর) সম্পর্কে গবেষণা প্রশংসার দাবী রাখে। এ সম্পর্কে অন্যের কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে গবেষণাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে কথা হলো যে, তিনি নিজেই নিজের মতামত প্রচুর পরিবর্তন করেছেন কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে। তাছাড়া কৃষ্ণগহ্বর সংক্রান্ত বিষয়গুলি ঠিকভাবে প্রকাশ করাও বড় কঠিন। মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন,

"Hawking's work is,of course, unproved". (page 188) [অনুবাদ ঃ হকিং এর গবেষণা কার্য নিঃসন্দেহে অপরীক্ষিত (পৃষ্ঠা ১৮৮)]।

তাছাড়া হকিং তাঁর গবেষণার ফলাফল কখনও কখনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেন। এর অর্থ হলো– এক সময় তিনি যা বলেছেন, পরবর্তীতে তা নিজেই নাকচ করলেন। হোয়াইট ও জন গ্রিবিন লেখেন,

"By this time (1976 trip to the States) he had completely reversed his ideas about black holes and thermodynamics, the very ideas that had created such arguments a few years earlier." (Page 172) . [অনুবাদ ঃ ১৯৭৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার প্রাক্কালে হকিং কৃষ্ণগহ্বর ও থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে মতামত সম্পূর্ণরূপে পাল্টান অথচ এই সব মতামত, ধারণার পক্ষে কয়েক বৎসর পূর্বে যুক্তির অবতারণা করা হয় (পৃষ্ঠা ১৭২)]।

www.pathagar.com

এছাড়া হকিং-এর অনেক মতামত দুর্বোধ্য। তিনি ঠিকমত পরিষ্কার করতে পারেন নাই তাঁর মতামত। কোন কোন মতামত কতকটা "সোনার পাথর বাটি" তত্ত্বের মত। কোন কোন সাধারণ পাঠক জ্ঞানী-গুণী ভাব দেখাতে হকিং এর বই কিনে শেলফে সাজিয়ে অন্যদের বোঝাতে চান যে, তাঁরা হকিংকে বুঝেছেন। অন্যদিকে খোদ গভীর চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পাঠ করে বলেছেন যে, বইটি দুর্বোধ্য ও লেখক কি বলতে চান তা স্পষ্ট নয়। হোয়াইট ও গ্রিবিন একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। রুশী পদার্থবিদ Andrei Linde (আন্দ্রে লিন্ডে) একবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উড়োজাহাজে যাচ্ছিলেন কোন সম্মেলনে যোগ দিতে। জাহাজে এক ব্যবসায়ীর পাশে তিনি বসেন। ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব্ টাইম" পাঠ করছিলেন। ব্যবসায়ী জানতেন না যে, লিন্ডে রাশিয়ার একজন সেরা পদার্থবিদ। ব্যবসায়ী লিন্ডেকে বলেন যে, হকিং-এর বইটি খুবই চমকপ্রদ। তিনি বলেন, "আমি না পড়ে বন্ধ করতে পারছি না। বৈজ্ঞানিক লিন্ডে উত্তর দেন, "Oh, that's interesting.I found it quite heavy going in places and didn't fully understand some parts." (অনুবাদ ঃ ও, তাহলে মজার ব্যাপার। আমার কাছে বইটি কঠিন কোন কোন জায়গায় এবং এর কিছু অংশ আমি পুরাপুরি বুঝি নাই। ব্যবসায়ী তখন হেসে বললেন, "Let me explain . . . (অনুবাদ ঃ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি . .) [সূত্র ঃ হোয়াইট ও গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ২৫০-৫১]। এই ঘটনা প্রতিপন্ন করে যে, অনেক ব্যক্তি হকিং-এর বই না বুঝেই তার সমর্থনে হইচই করছেন নিজেদের বুদ্ধিজীবীদের ভিতরে গণ্য করতে। অন্যদিকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণই হকিং-এর মতামত দুর্বোধ্য বলে তার সবকিছু হুবহু গ্রহণে দ্বিধান্বিত।

মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন বলেছেন,

"Ofcourse, a great many copies of *A Brief History of Time* have hardly been opened, left to adorn book shelves as fashion accessories" (page 292).

[অনুবাদ ঃ ঠিকই, 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' পুস্তকের বহু কপি কদাচিৎ খোলা হয়, ফ্যাশন হিসাবে পুস্তকের তাকে কপিগুলো রেখে দেওয়া হয়। (পৃষ্ঠা ২৯২)]।

আসলে ফ্যাশন হিসেবে বই ক্রয় করে হকিং-এর ভ্রান্ত দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্বকে না বুঝে সমর্থন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। খুব গভীরভাবে হকিং-এর বইখানা বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতে কতটুকু

www.pathagar.com

আসল বিজ্ঞান, আর কতটুকু দর্শন, মেটাফিজিক্স, ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব তা তলিয়ে দেখতে হবে।

আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার বিরোধী নই। আল্লাহতাআলা ও মহানবী গবেষণার (ইজতেহাদ) জন্য উৎসাহিত করেছেন কোরআন ও হাদীসে।

কোরআন মজীদ বলে,

"এবং তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। . . .

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি"; (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ২২ ও ২৫)।

আল্লাহ আকাশের দিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলেছেন,

"যিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে!" (৬৭ সূরা মুল্ক ঃ আয়াত ৩-৪)।

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই"। (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯০- ১৯১)।

"নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ৫)।

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১৯-২০)।

"ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী,

www.pathagar.com

পৃথিবী ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই ও আর এক নির্দিষ্টকালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তা হলে দেখত যে,ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৮-৯)।

উপরোক্ত পঙক্তিগুলোতে আল্লাহ মানুষকে, বোধসম্পন্ন মানষকে, জ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অর্থাৎ গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও বলেছেন, ইজতেহাদ (গবেষণা) করতে। তিনি এমনও বলেছেন যে, গবেষণায় ভুল হলে এক ছওয়াব, শুদ্ধ হলে দুই ছওয়াব। কিন্তু পদার্থবিদ্যার গবেষণার নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো কি গবেষণা? একি সত্যিকার জ্ঞান? কোরআন মজীদ জ্ঞানের দম্ভকারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

কোরআন বলে ঃ

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই ওদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত, তা তাদের কোন কাজে আসে নাই। ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রাসূল আসত, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই ওদের বেষ্টন করল।" (৪০ সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৮১-৮৩)।

"সে (কারূন যে মূসা নবীর সময়ে প্রচণ্ড বিত্তশালী ছিল) বলল, 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি!' . . . অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না"। (২৮ সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৭৮ ও ৮১)।

হকিং কেন বিভ্রান্ত ?

ডঃ হকিং-এর ন্যায় এত বড় বিজ্ঞানীর কাছে সবাই আশা করে সত্যের আবিষ্কার। ফিজিক্সের সত্য উদঘাটনে তিনি মেটাফিজিক্সে অসত্য সৃষ্টি করলেন। তবে কথা হলো সবাই সব বিষয়ে একই পাণ্ডিত্য অর্জন করে না। তাই দেখা যায় অঙ্কের জাদুকর ইতিহাসে ফেল করছে। ইংরেজী সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র অঙ্কে ফেল করছে পরীক্ষাতে। কেউ পদার্থবিদ্যায় ভালো তো জীববিজ্ঞানে কাঁচা।

www.pathagar.com

কাজেই ডঃ হকিং যে ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে একই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করবেন তা আশা করা যায় না। তাঁর বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহের ভিতর প্রক্ষিপ্ত দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্ব আমরা নিজেরাই বাতিল করতে পারি নিরপেক্ষ যাচাই-বাছাই করে।

দ্বিতীয়ত ঃ ডঃ হকিং-এর স্নায়ুতন্তুর অসুস্থতা (নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ) কি তাঁর বিভ্রান্তির জন্য দায়ী? সেন্ট আলবানস স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি "ক্লামজি" (এলোমেলো) হয়ে পড়েন। তাঁর কথাবার্তা জড়িয়ে যেতে লাগল। মদের গ্লাসে মদ ঢালতে তাঁর অসুবিধা হতে লাগল। সবই প্রায় গ্লাস থেকে টেবিলে পড়ে যায়। এমনকি, তাঁর তৎকালীন প্রেমিকা জেন (যিনি পরবর্তীতে তাঁর প্রথম স্ত্রী হন) দেখলেন যে, কি যেন একটা হচ্ছে হকিং-এর, যার উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ডাক্তারগণ সমানে পরীক্ষা করলেন তাঁর দেহ। তাঁরা শুধু ভিটামিন ছাড়া আর কিছু দিলেন না। মৃত্যুর ছায়া দেখতে লাগলেন সবাই। ডাক্তাররা অবশেষে বললেন যে, হকিং একটি বিরল ব্যাধিতে আক্রান্ত, যা সারবার নয়– নাম Amyotrophic lateral sclerosis যাকে সংক্ষেপে ALS বলা হয়। ইংলন্ডে এর নাম হলো মোটর নিউরণ ব্যাধি।

এএলএস ব্যাধি স্পাইনাল (মেরুদণ্ড) কর্ডকে আক্রমণ করে এবং ব্রেনের সেই অংশকেও যা ঐচ্ছিক 'মোটর' কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত সেলসমূহ আরো বেশী নষ্ট হতে থাকে ধীরে ধীরে এবং শরীরের মাসলগুলো শুকিয়ে গিয়ে প্যারালাইসিস (অবশতা) সৃষ্টি করে। চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি ঠিক থাকে। শরীর নষ্ট হতে থাকে, তবে মন ঠিক থাকে। নড়াচড়া রোহিত হয়ে যায়, কঠিন প্যারালাইসিস (অবশতা) আসে। এ রোগে শ্বাস 'মাসল' অকার্যকর হয়ে নিউমোনিয়া বা শ্বাসরোধ হয়ে অবশেষে মৃত্যু হতে পারে। "ক্রনিক ডিপ্রেশন" (জটিল হতাশাগ্রস্ততা) আসে রোগীর। এই একুশ বৎসর বয়সে হকিংকে ডাক্তারগণ মাত্র দু'বছর জীবনের আশা দিলেন। এটা শুনে হকিং গভীরভাবে হতাশাগ্রস্ত হলেন। তিনি নিজের অন্ধকার ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে লাগলেন; মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে লাগলেন। মানসিক যাতনা ভোগ করতে থাকলেন। তিনি এর ভিতর ক্যাম্ব্রিজে পিএইচডিতে ভর্তি হয়েছিলেন গবেষণা করতে। পিএইচডি করার আশা থাকল না তাঁর। তিনি মনে করতে লাগলেন, আর কিসের জন্য বাঁচবেন? যদি দু-একবছরে মরতেই হয়, কেন এত কসরত করবেন? হাসপাতালে থাকার সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখতে লাগলেন যে, তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। তাঁর ব্যাধি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর প্রেমিকা জেন তাঁকে পেলেন "Confused and lacking the will

www.pathagar.com

to live" (মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন, পৃষ্ঠা ৬৩)– এলোমেলো, হতবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বাঁচার ইচ্ছাহীনতায়।

হকিং-এর হাঁটতে কষ্ট হতে লাগল, লাঠি নিয়ে হাঁটতে লাগলেন, দু'কদম হাঁটতে গিয়েও মাঝে মাঝে মাটিতে পড়ে আহত হয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ নিতে হতো তাঁকে। কথাবার্তা জড়িয়ে যেতে লাগল ভীষণভাবে। তাঁর কথা কেউ বুঝতে সক্ষম হলো না। উনিশ শত ষাট দশকের শেষ অর্ধেকে হকিং-এর শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ হতে লাগল। এবার লাঠি ছেড়ে 'ক্রাচ' নিয়ে তাকে চলতে হল। স্টিফেনের বাবা নিজে ডাক্তার। এখন তিনি অন্য ডাক্তারের উপরে হতাশ। নিজেই ছেলের অসুখের উপর গবেষণা করে কিছু ঔষধ ও ভিটামিন দিতে লাগলেন যা ১৯৮৬ সালে তাঁর (পিতার) মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

ক্যাম্ব্রিজে সেন্ট মেরিস লেনে হকিং-এর বাসাতে হকিং-এর প্রায় পনর মিনিট লাগত প্রথম তলা থেকে দ্বিতীয় তলাতে শোয়ার ঘরে যেতে। উনিশ শত ষাট দশকের শেষে স্টিফেন ক্রাচ ছেড়ে হুইল চেয়ার নিলেন।

১৯৬৮ সালে হকিং ক্যাম্ব্রিজের "ইনস্টিটিউট অব এস্ট্রনমি"তে স্টাফ সদস্য হলেন। হোয়াইট ও গ্রিবিন লেখেন,

"Mitton (administrative head of the Institute) recalls that Hawking was not the easiest person to work with. He found him irritable and impatient . . . Such moods were perhaps a symptom of man's conditions" (Pages 119-120).

[অনুবাদ ঃ ইনস্টিটিউট অব এস্ট্রনমির প্রশাসনিক প্রধান মিটন বলেন যে, হকিং-এর সঙ্গে কাজ করা খুব কঠিন। তিনি হকিংকে বদমেজাজি ও অস্থিরমতি পান। . . . এই স্বভাব সম্ভবত তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য"। (পৃষ্ঠা ১১৯-১২০)]।

হোয়াইট ও গ্রিবিন আরো লেখেন, "His favourite move, when he is annoyed by something someone has said, is to drive over their toes" (Page 16). [অনুবাদ ঃ হকিং কারো কথায় কারো উপর রাগান্বিত হলে সেই ব্যক্তির পায়ের পাতার উপর দিয়ে তাঁর মোটর চালিত হুইল চেয়ার চালিয়ে দিতেন। এটা তার প্রিয় চাল ছিল (পৃষ্ঠা ১৬২)]।

হোয়াইট ও গ্রিবিন লেখেন ঃ "He (Hawking) has a stubborn streak and difinite strains of a rebellious nature, partly cultivated

www.pathagar.com

by his circumstances, which give him an appetite for dispute". (page 193) [অনুবাদ ঃ হকিং-এর ছিল একগুঁয়ে স্বভাব চিহ্ন এবং বিদ্রোহী প্রকৃতির নিশ্চিত চাপ। এটা তার (শারীরিক) অবস্থার কারণে হয়। আর এটা তাকে অন্যের বিরোধিতা করার জন্য উৎসাহী করে। (পৃষ্ঠা ১৯৩)।

হকিং ১৯৮৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভাস্থিত 'সার্ন (CERN)' গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যান। সেখানে তাঁর সাংঘাতিক নিউমোনিয়া হয়- যা এএলএস রোগীদের হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কৃত্রিম উপায়ে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো হয় হাসপাতালে। এর পর তাঁর জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁর স্বরযন্ত্রে "ট্রাকিওস্টমি" (Tracheostomy) অপারেশন করা হয়। এতে তার পূর্বের কথা বলার যে ক্ষমতাটুকু ছিল তাও খতম হয়ে গেল। পরবর্তীতে কমপিউটার ও বাক্য সংশ্লেষক (Speech Synthesizer) যন্ত্রের সাহায্যে তিনি কথা বলার কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উপরে হকিং-এর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার কি কোন প্রভাব নেই তার ঈশ্বর চিন্তায়? কেউ কেউ বলবেন যে, তাহলে তো তিনি আরো ধার্মিক হতেন পঙ্গু হওয়ার জন্য। আমরা বলব, ডঃ হকিং তো নিজেই 'রির্ভার্স" (বিপরীতমুখী) তত্ত্বের সমর্থক। মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে সঙ্কুচিত হতে পারে। সময় সামনে এগোতে গিয়ে সঙ্কোচনের সময়ে পিছনে যেতে পারে ইত্যাদি। তাহলে পঙ্গুত্ব ঈশ্বর-প্রেম সৃষ্টি না করে ঈশ্বর- বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও ডঃ হকিং দ্বিতীয় আইনস্টাইনের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ঈশ্বর থেকে তাঁর হয়ত নেওয়ার আর কিছু নেই। কোরআন মজীদের ভাষায় এক ব্যক্তি বলেছিল ঃ

"এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের জোরে পেয়েছি" (২৮ সূরা কাসাস ঃ ৭৮ আয়াত)। সে ছিল 'দেমাগী', 'দাম্ভিক' কারূন।

হকিং-এর পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও পদার্থবিদ্যার গবেষণায় নাম করেছেন, সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি যে আবার ঈশ্বরতত্ত্ব ও অধিবিদ্যাতেও (মেটাফিজিক্স) একই ফল পাবেন এর কি নিশ্চয়তা আছে? বিজ্ঞান অনিশ্চয়তাবাদ (the uncertainty principle) আবিষ্কারের পরে একই অবস্থায় একই ফলাফল আর নিশ্চিত নয়। উনিশ শ' কুড়ির দশকে ওয়ার্নার হাইজেন বার্গ (wearner Heisenberg), এরভিন শ্রয়েডিংগার এবং পল ডিরাক বলবিদ্যার পুনর্গঠন করে কণাবাদী বলবিদ্যা (quantum mechanics) নামক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন তত্ত্বের ভিত্তি হল অনিশ্চয়তাবাদ। ডঃ হকিং নিজেই বলেন,

www.pathagar.com

"সাধারণত কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি পর্যবেক্ষণের একক সুনিশ্চিত ফল থাকে না। তার বদলে সে ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকে অনেকগুলি পৃথক পৃথক (different) ফলশ্রুতি। তাছাড়া থাকে ফলগুলির প্রতিটির কতটা সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ কেউ যদি বহুসংখ্যক সমরূপতন্ত্রের (similar system) একই মাপ নেন এবং তাদের প্রতিটি যদি একইভাবে শুরু হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে পাবেন বিশেষ সংখ্যক ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে 'ক'। ভিন্ন আর কিছু ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে 'খ' এবং এই রকম (and so on)। কতবার ফল 'ক' হবে সে সম্পর্কে একটা আসন্ন (approximate) সংখ্যা ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকতে পারে। কিন্তু একক একটি মাপনের বিশেষ ফল (Specific result) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। সুতরাং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছে ভবিষ্যদ্বাণী করার অসম্ভাব্যতা কিম্বা একটা এলোমেলো অনিশ্চিত অবস্থা (randomness)। এই পরিস্থিতি এড়ানো অসম্ভব্য। (সূত্র কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস– এর অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৭১-৭২)।

ডঃ হকিং আরো বলেন, "কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) আবির্ভাবের পর আমরা মেনে নিয়েছি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এবং কিছু মাত্রায় অনিশ্চয়তা সব সময়ই থাকে।" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭৩)। যদি আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করি ,তাহলে তার অর্থ এই হবে না যে, সাধারণভাবে আমরা ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। তার দু'টি কারণ। প্রথম কারণ কণাবাদী বলবিদ্যা আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার উপর একটা সীমা আরোপ করে। এই সীমা অতিক্রম করার কোনো উপায় আমাদের নেই। (সূত্র ঃ কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫)।

ডঃ হকিং-এর বক্তব্যানুযায়ী অনিশ্চয়তাবাদের জন্য কোন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশ্‌কিল। তাই কেমন করে বলা যাবে যে অসুস্থ হকিং সুস্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিলেও, তার ঈশ্বরতত্ত্বও যে, সুস্থ হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? এমনকি মানুষের মস্তিষ্কও যে অনিশ্চয়তার অধীন এ সম্পর্কে আমরা খোদ ডঃ হকিং-এর মন্তব্য উপস্থিত করতে পারি। তিনি বলেন, "মানুষের মস্তিষ্কও অনিশ্চয়তার অধীন। যেমন– কণাবাদী বলবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অসম্বদ্ধতার উপাদান মানুষের আচরণে রয়েছে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে জড়িত শক্তি অল্প, সেই জন্য কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা একটি ক্ষুদ্র অভিক্রিয়া মাত্র। মানবিক আচরণ সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করার অসামর্থের সত্যিকারের কারণ এ কাজটা খুব

www.pathagar.com

শক্ত। আমরা বর্তমানে মস্তিষ্কের ক্রিয়া শাসনকারী মূলগত ভৌত বিধিগুলি জানি। তুলনায় তারা সরল কিন্তু কয়েকটি কণিকা বেশী জড়িত থাকলে সমীকরণ সমাধান খুবই শক্ত। এমনকি সরলতর নিউটনীয় তত্ত্বেও নির্ভুলভাবে সমীকরণ সমাধান করা যায় শুধুমাত্র দু'টি কণিকার ক্ষেত্রে। তিনটি কিংবা ততোধিক কণিকা থাকলে আসন্নতার (approximation) দ্বারস্থ হতে হয়। কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠিন্যও বাড়ে। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় $১০^{২৬}$ কিংবা ১০০ মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন কণা আছে। মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা এবং স্নায়ুবিক উপাত্তগুলি (datas) তাতে প্রবেশ করছে সেটা জানা থাকলে বোঝা যাবে এ সংখ্যা এত বেশী যে আমরা কোনও দিনও মস্তিষ্ক কি রকম আচরণ করবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। আসলে আমরা অবশ্য মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা মাপতে পারি না। তার কারণ সেটা করতে গেলে মস্তিষ্কটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে প্রস্তুতও হই, তাহলেও আমাদের এত কণিকার হিসাব রাখতে হবে যা সম্ভব নয়। তাছাড়া সম্ভবত প্রাথমিক অবস্থা সাপেক্ষ মস্তিষ্ক খুবই স্পর্শকাতর। প্রাথমিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন পরবর্তী আচরণে বিরাট পার্থক্য নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং যদিও আমরা মস্তিষ্ক শাসনকারী মূলগত সমীকরণগুলি জানি, তবুও আমরা মানবিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে একেবারেই অপারগ।" (সূত্র ঃ "কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা", পৃষ্ঠা ১২২-১২৩)। ডঃ হকিং-এর কথা অনুযায়ী যদি মস্তিষ্কের এই অবস্থা হয়, কিভাবে বলা যাবে যে, অসুস্থ, পঙ্গু হকিং পদার্থবিদ্যার চমৎকার তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি প্রদান করলেও, ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে একই দক্ষতা দেখাতে পারবেন? মস্তিষ্ক কি এ নিশ্চয়তা দিতে পারে? ঈশ্বরতত্ত্বের কাছে গিয়ে হকিং পদার্থবিদ্যার মত দক্ষতা প্রদর্শনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

সে যাই হোক, হকিং স্নায়ুরোগের (নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ) রোগী। এ অবস্থা তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণায় প্রভাব ফেলা স্বাভাবিক।

খৃষ্টধর্ম ও বিজ্ঞান

মার্কসীয় দর্শনের কতা হলো–

"There is no non-human or superhuman consciousness. The absolute idea, the absolute spirit, god, is essentilly human consciousness artificially separated from man, absolutized and deified."(G. Kursanov, editor:

www.pathagar.com

Fundamentals of Dialectical Materialism, P. 54)

বস্তুসমূহের উর্ধ্বে কিছু নেই, বস্তুজগতকে অতিক্রম করে কিছু নেই। 'সবার উপরে বস্তু সত্য, তাহার উপরে নাই।' Matter is inexhaustible- 'বস্তু অবিনশ্বর', এই ধারণাটির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক মূল হলো বিশেষতঃ "Conservation of mass and energy" তত্ত্বটি। এই তত্ত্বটির আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে এবং এটাকে এক অপরিবর্তনীয় চির সত্য মনে করে কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক এঞ্জেলস সোৎসাহে বলে উঠেছিলেন এর দ্বারা "The last ventige of an extra mundane creator is obliterated" (Anti Duhring; Ibid)

বস্তুর ভর ও শক্তির অবিনশ্বরতার ঐ তত্ত্বটির উপরে এবং চার্লস ডারউইনের বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্বগুলির উপরে নির্ভর করেই প্রধানতঃ মার্কসীয় বস্তু দর্শনের বিকাশ। লেলিনের কথায়–

"Darwin put an end to the view of animal and plant species being created fortuitious, 'created by god' and immutable" (Collected Works, vol I, ibid)

অবশ্য, ডারউইন নিজে নাস্তিক বা খোদাদ্রোহী ছিলেন না। খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা হলো ঃ "The mystery of the begining of all things is insoluble by us, and I for one must be content to remain an Agnostic." (Auto- biography)

তথাপি, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বকে যাচাই করতে গিয়ে মানুষের খোদা বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠলো, এবং তা পরিণামে অবিশ্বাসে রূপ নিল। মানুষ মনে করতে শুরু করলো যে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা সাপে-নেউলে। ত্রিত্ববাদের বিবেকঘাতি বিশ্বাসটাকে অনেকেই সংস্কারের বশে মেনে চললেও মনে মনে প্রায় সবাই নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়লো; এও মনে করতে থাকলো যে, বিজ্ঞানীরা বুঝি সবাই নাস্তিক হয়ে থাকেন। (শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, আল্লাহ্ কি লৌকিক? পৃষ্ঠা ১৩১–১৩২)।

ডাঃ হকিংকে বিকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা হৃদয়ে পোষণের জন্য পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। তিনি খৃষ্ট জগতে লালিত-পালিত। খৃষ্টবাদ, বাইবেল, পাদরী কেউ তাঁর মত একজন শিক্ষিত, আধুনিক মানুষ, বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট করতে পারে না, কারণ এসবই বিকৃত, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের বাহক। অন্যদিকে ইসলামের প্রতি অযথা বিদ্বেষের জন্য এইসব

www.pathagar.com

পশ্চিমা শিক্ষিত ব্যক্তি ইসলাম থেকেও দূরে। ইসলামের যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব ও স্রষ্টাতত্ত্বের ধারণা তাঁদের কাছে অনুপস্থিত। বিজ্ঞান ও ধর্মের এই সংঘাত সম্পর্কে ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলীর "দি বাইবেল, দি কুরআন এণ্ড সাইন্স" গ্রন্থের উদ্ধৃতি বিষয়টিকে পরিস্ফুট করতে পারে।

ডাঃ মরিস বুকাইলী লিখেন, "আধুনিক যুগে অনেকের চোখেই ধর্মশাস্ত্রের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার সম্পর্ক অনেকটা যুদ্ধংদেহী। বিষয়টি যতই আপাতঃ সত্য হোক, দেখা যাচ্ছে, অধুনা বিজ্ঞানও এই ধর্ম-নিরপেক্ষ তথা সেকুলার ভাবধারার কথাই বলে থাকে। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সেকুলার ভাবধারার সাথে ধর্মীয় শাস্ত্রের সম্পর্ক অনেকটাই বিরোধপূর্ণ। তাছাড়া এ কথাটিও সত্য বলে মানতে হয় যে, আজকের যুগের বেশীরভাগ বিজ্ঞানী বস্তুবাদী-থিওরি তথা চিন্তাধারার সাথে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছেন, তবে তাঁরা সংখ্যায় খুব বেশী নন। এই নগণ্যসংখ্যক বিজ্ঞানীর কথা বাদ দিলে বেশির ভাগ বস্তুবাদী মনোভাব সম্পন্ন বিজ্ঞানীকে দেখা যায়, তাঁরা যখন প্রচলিত কোন কাহিনী কিংবা উপকথায় ধর্মীয় কোন প্রশ্ন দেখতে পান, তখন সে বিষয়ে তাঁরা শুধু অনাগ্রহ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন না, অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন। এদিকে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে যখন কোন আলোচনা চলে তখন সবাই সাধারণত ধর্ম বলতে ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের কথা বুঝে থাকেন ও বলে থাকেন। ঘুণাক্ষরেও কেউ ইসলামের কথা ভাবে না বা বলেন না। তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যে এত বেশী মাত্রায় ভুল ব্যাখ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণা গড়ে উঠেছে যে, ইসলামের আসল রূপ যে কি, সে সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব উপস্থাপন সত্যি কঠিন।" (অনুবাদ ঃ আখতার-উল-আলম, পৃষ্ঠা ১৪৫)।

ডাঃ মরিস বুকাইলী আরো লেখেন, "ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক দেশে-দেশে কালে-কালে কোন সময়ই একরকম ছিল না। একথা সত্য যে, একত্ববাদী কোন ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের বিরোধিতা কিংবা নিন্দাসূচক কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিজ্ঞানীরা যে নিদারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা চলে না। যদিও ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে কোন নির্দেশ ছিল না, তবুও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরুগণ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে গেছেন এবং এই বিরোধিতা তাঁরা করেছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মনগড়া ধারণার বশবর্তী হয়েই। আমরা জানি, কিভাবে এইসব ধর্মগুরু তাঁদের সময়কালের বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বিশেষতঃ যাঁরা বিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এমনও দেখা গেছে, ওইসব ধর্মগুরুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে বিশেষত ধর্মদ্রোহী হিসাবে পুড়ে মরার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীদের দেশ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। যাঁরা দেশ ত্যাগ করেননি, তাঁদের হয় নিজেদের অভিমত প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে নতুবা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন জানাতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর উদাহরণ সব সময়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। গ্যালিলিওর অপরাধ ছিল, তিনি কোপারনিকাস আবিষ্কৃত পৃথিবী ঘূর্ণনের অভিমত সমর্থন করেছিলেন। আসলে বাইবেলের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে নিয়ে গ্যালিলিওকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বাস্তবে বাইবেলে এমন কোন বক্তব্য নেই যা গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যেতে পারে।" (পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)।

ডাঃ বুকাইলী লিখেন, "বলে রাখা ভালো যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় কিতাবেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি কোন অনীহা ছিল না; কিন্তু সেকালে ওই দুই ধর্মের সেবক হিসাবে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন নানা প্রতিবন্ধকতা। এর পর এল রেনেসাঁর যুগ। সেই রেনেসাঁর যুগে বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই ধর্মীয় কর্মকর্তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। অল্প প্রতিশোধ স্পৃহার ধারা অদ্যাবধি জারি রয়েছে। ফলে আজও পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক মহলে যখন কেউ সৃষ্টিকর্তার কথা বলেন, তখন তাঁকে একঘরে হয়ে পড়তে হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি–এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের উপরেও সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীরাও এই অশুভ প্রভাব থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না।" (পৃষ্ঠা ১৫৩)।

ডাঃ বুকাইলী আরো লেখেন, "সুকঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েও মানুষ নিজেকে তুচ্ছ বা নগণ্য ভাবতে পারছে না। বরং বিনয়ের পরিবর্তে তার মধ্যে মাথাচাড়া দিচ্ছে ঔদ্ধত্য ও অহংবোধ।-এই অবস্থায় মানুষ যেমন তার আনন্দ ও ভোগের পথে চলতে গিয়ে সকল রকম প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করতে চায়, ঠিক তেমনিভাবেই মানুষ আজ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব। এটাই বাস্তব আধুনিক বস্তুবাদী সমাজের মানসিক প্রতিচ্ছবি এবং আজকের পাশ্চাত্য জগতে (এবং শিক্ষিত সমাজে) বস্তুবাদী এই ভাবধারাই বিস্তার লাভ করছে অধিক মাত্রায়"। (পৃষ্ঠা ১৫৪)।

www.pathagar.com

ডাঃ বুকাইলী বলেন, "আজকের যুগে বস্তুবাদী চিন্তাধারার এই যে উত্তাল তরঙ্গ এবং পাশ্চাত্যের বুকে (সেই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে) নাস্তিকতার এই যে অব্যাহত হামলা তা মোকাবেলা করার ব্যাপারে কি ইহুদী ধর্ম অথবা কি খ্রীষ্টধর্ম–কোনটারই তেমন কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। সর্বোপরি, এ ব্যাপারে উপরোক্ত দুই ধর্মের এই অপারগতাও এখন আর কোন লুকানো-ছাপানো বিষয় নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলায় অধুনা এই দুই ধর্ম হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। ফলে, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলা করার যে টুকু ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ওই দুই ধর্মের মধ্যে ছিল, আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই তাও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। বস্তুবাদী ও নাস্তিকেরা এখন সনাতন খ্রীষ্টধর্মকে মানুষের তৈরি একটা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য করছেন না। কেননা, তাঁদের নিকট এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষই–হাজার দু'য়েক বছর আগে সাধারণ মানুষের উপরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে– সুপরিকল্পিতভাবে খ্রীষ্টানদের এই সব ধর্মীয় বিধানের উদ্ভব ঘটিয়েছে। তাঁরা আরও দেখতে পাচ্ছেন, বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন কিতাবে তাঁদের সমৃদ্ধ ভাবধারার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন ভাবধারা যেমন অনুপস্থিত তেমনি ওই দুই ধর্মের কোন ধর্মীয় গ্রন্থেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সামান্যতম অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। শুধু তাই নয়, ওইসব ধর্মগ্রন্থ বরং যতসব অবাস্তব স্ব-বিরোধী গাঁজাখুরি বিষয় ও ভাবধারায় পরিপূর্ণ। সেগুলি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে ওইসব আজগুবি গাল-গল্প ও উপাখ্যানকে ধর্মতত্ত্ববিদগণ সমগ্র ধর্মগ্রন্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে যতই রায় দিন না কেন– বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদীরা সে সবকিছুকেই অসত্য বলে রায় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করছেন না। অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতি যা, তাতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করার কোন কারণ তাঁদের থাকার কথাও নয়।" (পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫)।

ডাঃ বুকাইলী বলেন, "কোনো ধর্মগ্রন্থের উপরে বিশেষভাবে কোনো গবেষণা পরিচালনার কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো সমস্যা – যা সময়ে জটিল হয়ে দাঁড়ায় –তার মূল উদঘাটন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য সেই গ্রন্থের পাঠ বা বাণীর দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কোন ধর্মগ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের নামে তথাকথিত গবেষণামূলক যে সব পুঁথি-কিতাব বাজারে চালু রয়েছে সেগুলি পাঠ করলে নিরাশ হতে হয়। কেননা, সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বেলায় এইসব পুস্তকে আত্মপক্ষ

www.pathagar.com

সমর্থনে এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, মনে হয় লেখক যেন সেই সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা চিন্তার ক্ষমতা রাখেন ও নিরপেক্ষ রায় প্রদানের সাহস প্রদর্শন করেন, তাঁরাও কিন্তু নিজেদের আজগুবি ধারণা ও স্ববিরোধিতা ঢেকে রাখতে পারেন না। আরো দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যতো তর্কই করা হোক আর যতো যুক্তিই দেখানো হোক, সে সবের মোকাবেলায় কেউ কেউ নির্দ্বিধায় বাইবেলের অংশবিশেষকেই প্রমাণ ও দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তাঁরা বুঝতেও চান না যে, বাইবেলের এইসব বক্তব্য কতোটা ভ্রান্ত ও ধাঁধায় পূর্ণ। তাছাড়া এইসব লেখক একবারও ভেবে দেখেন না যে, তাঁদের এই ধরনের যুক্তিহীনতা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী শিক্ষিত লোকদের মনোভাবের উপরে কি ধরনের বিরূপ ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।" (পৃষ্ঠা ৬)।

ডাঃ বুকাইলী বলেন, "আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর সাথে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বলে কথিত ধর্মগ্রন্থসমূহের যে দ্বন্দ্ব তা সব সময় মানুষের চিন্তার খোরাক জুগিয়ে এসেছে। প্রথমে মনে করা হতো যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটাই বুঝি কোনো ধর্মগ্রন্থের বাণীর সঠিকত্ব ও নির্ভুলত্বের প্রয়োজনীয় প্রমাণ। সেন্ট অগাস্টাইন তাঁর ৮২ নং পত্রে ধর্মগ্রন্থের সঠিকত্ব বিচারের এই নিয়ম প্রবর্তন করেন। . . . কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি যখন সাধিত হলো, দেখা গেলো বিজ্ঞানের সাথে বাইবেলোক্ত সুসমাচারসমূহের অসঙ্গতি খুবই স্পষ্ট। পরিশেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অতঃপর ধর্মগ্রন্থের (বাইবেলের) তুলনামূলক বিচার পর্যালোচনার ধারণা স্থগিত থাকবে। আর এই সিদ্ধান্তের ফলেই আজ এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে এসে বাইবেলের ভাষ্যকার ও বিজ্ঞানীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যা হোক, যে গ্রন্থের বাণী পুরোপুরিভাবে নির্ভুল নয়, তাকে আমরা ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারি না। এক্ষেত্রে অবশ্য সামঞ্জস্য বিধানের একটা পথ খোলা থাকে। আর তা হলো, বিজ্ঞানের যে বক্তব্য ধর্মগ্রন্থের আলোকে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, সে বক্তব্যকে অসত্য বলে বিবেচনা করে সান্ত্বনা লাভ করা। কিন্তু এ পন্থাও ধর্মীয় নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে ধর্মগ্রন্থের অখণ্ডতা ও তার প্রতিটি বাণীর সত্যতার উপরে সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের সুসমাচারসমূহের প্রতিটি বাণীকে সত্য বলে চালাবার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। অথচ কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই এই ধরনের অযৌক্তিক কোনো বিষয়কে সমর্থন করা সম্ভব নয়।"

www.pathagar.com

বাইবেলের বেলায় সেন্ট অগাস্টাইন যেভাবে মনে করতেন, সেভাবে ইসলামের অনুসারীরাও সব সময় মনে করে আসছেন যে, আসমানী কিতাবের বক্তব্য পুরোপুরিভাবেই বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থক। উল্লেখ্য যে, আধুনিককালে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার পরেও এ মনোভাব পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না। পরবর্তীকালে আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বহু বিষয় কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে এবং কোরআনের বাণীসমূহ বাইবেলের বাণীর তুলনায় পুরোপুরি নির্ভুল। বাইবেলে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বক্তব্য কম - মাত্র কিছু সংখ্যক; কিন্তু সেগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য কোরআনে প্রচুর এবং তার সবগুলিই সত্যভিত্তিক। বস্তুত কোরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না– যেটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী"। (পৃষ্ঠা ৭-৮)।

ডাঃ মরিস বুকাইলী নিজে একজন বিজ্ঞানী– চিকিৎসা বিজ্ঞানী– তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তবে তিনি পশ্চিমের বিজ্ঞানীদের নাস্তিক হওয়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সত্য। পশ্চিমের লোকজন খ্রীষ্টবাদ ও ইহুদী ধর্ম দেখে স্রষ্টার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, খ্রীষ্টবাদ ও ইহুদী ধর্ম যুক্তিসম্মতভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় বই-পুস্তকও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ভরা। অন্যদিকে দুঃখের সাথে বলতে হয়– পশ্চিমের লোকজনের ইসলাম, কোরআন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি উন্নাসিকতার জন্য তারা ও সেই সঙ্গে পশ্চিমা অনেক বিজ্ঞানীও স্রষ্টার একটি 'পজিটিভ' (হ্যাঁ সূচক) উপস্থাপন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কয়জন পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক ডাঃ মরিস বুকাইলীর মত কোরআন মজিদ অন্ততঃ একটি অনুবাদ, অধ্যয়ন করেছেন? আসলে আমাদের মুসলমান বিজ্ঞানী ও ইংরেজী শিক্ষিত ভাই-বোনদের ভিতরেও বহুজনকে পাওয়া যাবে যারা কোরআন মজীদ অন্ততঃ একটি অনুবাদ জীবনে একবারও পাঠ করেছেন কি না, কিন্তু তাদের অনেকেই ডঃ হকিং-এর মত দাম্ভিকতার সঙ্গে আল্লাহর অনস্তিত্বের কথা এখানে–ওখানে বলে থাকেন, সেই সঙ্গে উঠতি বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরাও সেই সব বিভ্রান্ত প্রবীণদের খপ্পরে পড়ছে।

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীগণ (সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম যদিও সেখানে শতকরা একশত ভাগ শিক্ষার হার) কয়জনে ইসলামের ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করেছেন? আমার মত সাধারণ ব্যক্তির (আমি বুদ্ধিজীবী হওয়ার মত

www.pathagar.com

যোগ্যতার দাবী করি না) ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহের তাকে আমার নিজস্ব ধর্ম ইসলাম ধর্ম ছাড়াও খ্রীষ্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্ম, কাদিয়ানী ধর্ম, বাহাই ধর্ম, ইত্যাদি ধর্ম-অধর্ম গ্রুপের বই পুস্তক রয়েছে। বাইবেল (ইংরেজী ও বাংলা উভয়ই), বেদের অনুবাদ, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি রয়েছে। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের কেন এই উন্নাসিকতা? কোরআন মজিদ পাঠ না করেই ইসলাম ও আল্লাহ সম্পর্কে একতরফা রায় প্রদান কি বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক কার্যক্রম? ডঃ হকিং কোরআন মজীদ পাঠ না করেই স্রষ্টাকে বাতিল করে অবৈজ্ঞানিকের ন্যায় কার্যকলাপ করেছেন। এদেরই কোরআন মজীদ বলেছে প্রকৃত অন্ধ, বধির ও বোবা। কোরআন বলে,

"আর আমি তো বহু জীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে ওরা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না– এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। এরাই উদাসীন।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)।

"তুমি কি মনে কর যে, ওদের বেশিরভাগই শোনে বা বুঝে? ওরা তো পশুরই মতো এবং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৪৪)।

আমরা যদি বড় বড় ডিগ্রী, তকমা, মেডেলে ভূষিত হই কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান প্রত্যক্ষ না করি, সত্যিকারের জ্ঞানের কথা না শুনি, সত্যিকারের জ্ঞানের কথা না বলি, তাহলে আমাদের ডিগ্রীর ভার থাকলেও আল্লাহর চোখে আমরা হয়ে যাব অন্ধ, বধির ও বোবা এবং "পশুর চেয়েও পথভ্রষ্ট"।

সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ

সব কিছু নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে তার পরে বিশ্বাস করলে বিশ্বের বহু কিছুই অনেক মানব মনে স্থান পাবে না। নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর তথ্য গ্রহণযোগ্য। "একজন হাকিম কি করে নিজে না দেখে সাক্ষীর কথার উপর আস্থা করে একটা মানুষকে ফাঁসি দিতে পারেন? আর এই সাক্ষীর উপরই বিচার নির্ভরশীল। আর এই সাক্ষ্য ছাড়া বিচার বিভাগই অচল"। (খন্দকার আবুল খায়ের, 'যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব", পৃষ্ঠা ২৭)।

মায়ের সাক্ষ্যতে মানুষ পিতার পরিচয় পাচ্ছে। মায়ের সাক্ষ্যতে তবে মানুষ বিশ্বাস করছে কি করে? কেউ কি নিজের পিতা সম্পর্কে নিজেই কোন পূর্ণ গ্যারান্টি দিতে পারে? রাসূল (সাঃ) একবার বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নে তাদের প্রকৃত

www.pathagar.com

পিতৃপরিচয় প্রদান করলে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যারা তাদের পিতা হিসাবে যাদের জানতেন তা ভুল প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলামে এক সময়ে পারিবারিক বন্ধন শিথিল ছিল। রাসূল (সাঃ) আল্লাহর তরফ থেকে সে সত্য ও তথ্য পেয়েছিলেন বলেই প্রশ্নকারীদের প্রকৃত পিতৃপরিচয় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। রাসূল (সাঃ) এখন নেই। আমরা তো আমাদের মায়ের সাক্ষীতেই পিতৃপরিচয় পাচ্ছি।

নবী রাসূলগণের সাক্ষ্যে স্রষ্টাকে কেন বিশ্বাস করা যাবে না? স্রষ্ঠা যে রয়েছেন তা হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ন্যায় জগৎবিখ্যাত নবীগণ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। নিউটন আইনস্টাইনের সাক্ষ্য যেমনভাবে মানা হয়, তার চেয়েও নবীদের সাক্ষ্য বেশী খাঁটি। বৈজ্ঞানিকদের বহু তথ্য ও তত্ত্ব পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। নবীদের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। তবে ভণ্ডনবী বা ভণ্ড মহাপুরুষদের সাক্ষ্য এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

"সূর্যকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা দ্বারা অর্থাৎ চোখ দ্বারা দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতার মধ্যে, কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চাইতে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় যা আমরা বিশ্বাস করি তা কি আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি? এর দ্বারা কি প্রমাণ হল না যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও জ্ঞানের একটা পৃথক অবস্থান আছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বহু জিনিস বিশ্বাস করি।"

. "আমরা বিশ্বাস করি, চাঁদে বায়ু নেই। সেখানে যেতে হলে কৃত্রিম অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে। এটা কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল? এখানে কি প্রমাণ হল না যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধি ছাড়াও আরও জ্ঞান আছে যে জ্ঞান নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম।" (খন্দকার আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা ২৮)।

বহু ধর্মে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে বলেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে লোপাট করা যায় না। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইসলামকেও পরখ করে দেখা উচিত। ইংলন্ডের সাবেক পপসঙ্গীত তারকা ক্যাট স্টিভেন্স (বর্তমান নাম ইউসুফ ইসলাম) খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, অন্য ধর্মের থেকে ইসলাম একটু আলাদা এবং এর বাণীতে বেশ তাৎপর্যতা, বিবেকবুদ্ধি, উপলব্ধি রয়েছে। তিনি লেখেন, "On reading the Qur'an, I now realized that all the Prophets sent by god brought the same message. why then were the Jews and Christians different? I

www.pathagar.com

know now how the Jews did not accept jews as messiah and that they had changed His word. Even the Christians misunderstood God's word and called Jesus the son of God everything made so much sense. This is the beauty of the Qur'an; it asks you to reflect and reason, and not to worship the sun or moon but the One who has created everything." (weekly Dhaka Courier, 23 April, 1999).

[**অনুবাদ** ঃ কুরআন পাঠ করে আমি এখন অনুধাবন করলাম যে, স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরীত সব নবী– পয়গম্বরগণ একই বাণী প্রচার করেন। হ্যাঁ, তবে কেন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা আলাদা? এখন আমি জানি, কিভাবে ইহুদীগণ হযরত ঈসাকে মসীহ্ –নবী হিসাবে মানে নাই এবং স্রষ্টার বাণীসমূহ বিকৃত করে। এমনকি খৃষ্টানরাও স্রষ্টার বাণীকে ভুল বোঝে এবং হযরত ঈসাকে স্রষ্টার পুত্র বলতে থাকে। ইসলামের এই ব্যাখ্যায় বেশ যুক্তি, বিবেকবুদ্ধি রয়েছে। এই হলো কুরআনের সৌন্দর্য; এটা একজনকে চিন্তা ও অনুধাবন করতে বলে এবং চন্দ্র-সূর্যকে পূজা করতে বলে না; বরঞ্চ যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁকে পূজা করতে বলে। (সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৯)]।

খৃষ্টান ক্যাট স্টিভেন্স ইসলামে ঠিকই যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় পেয়েছেন। কিন্তু সবাই কি তাই পেয়েছে? কোরআন বলে, "হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে ও লোককে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করে। যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মারাত্মক শাস্তির খবর দাও।" (৯ সূরা তওবা ঃ ৩১-৩৪ আয়াত)। নাস্তিকদের চোখে এইসব শোষক ধর্মবিদদেরই দেখা মিলল। তারা ইসলামের মহান ব্যক্তিদের চোখে দেখ্‌ল না; তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী ও কোরআন পড়ে দেখ্‌ল না।

কোরআন বলে, "তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" (২ সূরা বাকারা ঃ ২৮ আয়াত)।

কোরআন বলে, "তিনিই (আল্লাহই) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; যখন তিনি বলেন, 'হও', তখনই হয়ে যায়; তাঁর কথা সত্য; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (মহাবিশ্ব ধ্বংসের জন্য) সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।" (৬ সূরা আন্‌আম ঃ আয়াত ৭৩)।

www.pathagar.com

উপরের বাক্যাবলী থেকে বোঝা যায় যে, মহাবিশ্বের সবই ধ্বংস হবে, কিন্তু স্রষ্টা ঠিক থাকবেন। তাই সর্বেশ্বরবাদ যে একটি মিথ্যা মতবাদ তা বোঝা যায়। সবকিছু ঈশ্বর হলে, সেগুলো ধ্বংস হতো না। স্রষ্টা ছাড়া অন্য সবকিছু স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু মাত্র, তাদের কারও কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।

কোরআন বলে, "মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ বা রিভিলেশন) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ৫১ আয়াত)।

"মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের, তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেহ তার সহিত বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির (দোজখের) দিকে।" (২২ সূরা হাজ্জ ঃ ৩-৪ আয়াত)।

কুরআনের সত্যতা ও প্রমাণ

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে জগৎ সংসারে। circumstantial evidence (অবস্থাঘটিত বা আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য) বলে একটি সাক্ষ্য বা প্রমাণ রয়েছে। একজন দূরের আগুন দেখতে পাচ্ছে না। তবে সে উপরে প্রচুর ধোঁয়া দেখছে। এতে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে যে, সেখানে আগুন লেগেছে। ধোঁয়াকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে?

পৃথিবীর লেখকগণ গ্রন্থ রচনায় তাদের রচনায় কতবার লেখালেখি, মুসাবিদা, কাটাকাটি, নব সংস্করণ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। রাসূল (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত কুরআন তিনি যা মুখে ডিক্টেট করেছেন তার "সেক্রেটারী" (কাতিব)দের, তাই রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। রাসূল (সাঃ) তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন নাই; তাঁর তো কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না। একজন নিরক্ষর নবীর মুখ থেকে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ বের হয়ে এল যার বিষয়বস্তু ধর্ম, সংস্কৃতি, শাসন, বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস, আইন, পরিবার, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শান্তি, এবাদত-বন্দেগী ও আরো কত কি। এ সব বিষয় ভিত্তিক লেখার বা ভাষার, ভুলত্রুটি সংশোধনের কোনই প্রয়োজন পড়ে নাই, না তাঁর জীবদ্দশায়, না পরবর্তীতে। এমনকি বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহেরও

www.pathagar.com

কোন তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ছে না– যা কুরআনে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) তো বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। অতীতের বা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও তাদের বৈজ্ঞানিক মতামত বারবার পরিবর্তন করছেন সত্যে পৌঁছুতে। পদার্থবিদ হকিং তার ছোট্ট "ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" বইটি যে কতবার মুসাবিদা করে সংশোধন করেছেন তার সীমা সংখ্যা নেই। আর তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মতামতও পরিবর্তন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের এ হাল কেন? নিরক্ষর হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর বা তথ্যের বা তত্ত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন পড়ে না কেন? এটি কি একটি "সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স" নয়? কুরআন যে মানুষ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নয়, স্বয়ং স্রষ্টার বাণী, এটি কি এতে প্রমাণিত হয় না? কুরআনের পিছনে স্রষ্টা উপস্থিত, তাই এতে ভুল নেই। "ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম"-এর পিছনে স্রষ্টা নেই। আছে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, তাই ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা পড়ছে এতে। মানুষ যতবড় জ্ঞানীই হোক, তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অসীম জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষই নয়।

কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী আর হাদীস (রাসূলের নিজস্ব বাণী) যে নয়, তা বোধগম্য হবে কুরআন ও হাদীসের ভাষা ও বাচনভঙ্গির পার্থক্যের জন্য। হাদীসের ভাষা ও বাচনভঙ্গির চাইতে কুরআনের ভাষা ও বাচনভঙ্গি পৃথক। হাদীস যদি জমিন হয়, কুরআন আসমান, কুরআনের গুরুগাম্ভির্য, মাহাত্ম্য, ভাষাগত উৎকর্ষতা, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য, যৌক্তিকতা ইত্যাদি হাদীস অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চতর। দু'টি পাঠকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যদি দু'টির প্রণেতা একই ব্যক্তি হতেন– তাহলে এ পার্থক্য থাকার কথা নয়। যেহেতু দু'টির প্রণেতা দু'জন তাই এই পার্থক্য। কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম,কবি জসীম উদ্দিন প্রমুখের লেখা পাঠ করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকের লেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কবি জসিম উদ্দিনের লেখা আর কবি নজরুল ইসলামের লেখার ভাষাগত ও বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। হাদীস ও কুরআনও এই প্রকারের। যদি কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর লেখা বা প্রণয়নের প্রচেষ্টা হোত, তাহলে তা হাদীস থেকে পৃথক স্টাইলের হোত না। কুরআনই আল্লাহর অস্তিত্বের একটি বড় প্রমাণ।

কুরআনের সূরা 'নসর' এর বরাতে রাসূল (সাঃ) নবম হিজরীতে বিদায় হজ্বে ঘোষণা করেন যে, সামনের বছর জনসাধারণ তাঁকে আর নাও পেতে পারে।

www.pathagar.com

কুরআন স্রষ্টার বাণী না হলে রাসূল (সাঃ) একথা বলতে পারতেন না। কারণ, তিনি নিজে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা রাখতেন না বলে বার বার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে যতটুকু তথ্য প্রদান করেন– তাই তিনি প্রচার করতেন।

কুরআনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে সত্য হিসাবে প্রকাশিত হয়। কুরআন সত্য না হলে এমনটি হওয়ার কথা নয়।

কুরআন বলে, "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।" (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ ৪০ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ) চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত"। (৩১ সূরা লোকমান ঃ ২৯ আয়াত)।

"এবং আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে।" (১৩ সুরা রা'দ ঃ ২ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ) সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। (৩৫ সূরা ফাতির ঃ ১৩ আয়াত)।

"সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি (আল্লাহ) করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কালপর্যন্ত।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৫ আয়াত)।

উপরের আয়াতগুলোতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এসেছে তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জেনে প্রকাশ করেছেন? বরঞ্চ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে চন্দ্র-সূর্যের উভয়ের পরিক্রমণ ব্যাপারে কোন ঐকমত্য ছিল না পণ্ডিতদের ভিতর। অনেক পরে মধ্যযুগে গ্যালিলিও, ব্রুনো প্রমুখ খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকদের সত্য বলাতে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন যে, পৃথিবীর চারদিকে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘোরে। টলেমী, যিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন, পরবর্তীতে জোর দিয়ে বললেন একই কথা। তদানীন্তন জ্যোতির্বিজ্ঞানের গৃহীত তত্ত্বের বিরুদ্ধে সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন বলছে অন্য কথা। কুরআন তখনকার বৈজ্ঞানিকদের মত বলে নাই যে, পৃথিবীর চারদিকে জ্যোতিষ্কসমূহ ঘুরছে। কুরআন বলল যে, চন্দ্র-সূর্যসহ সব জ্যোতিষ্কই সাঁতার কাটছে অর্থাৎ ঘুরছে নিজস্ব কক্ষপথে। ইউরোপে ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) বললেন যে, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য নয়। ফলে তাকে ভেনিসের খৃষ্টধর্মীয় আদালতে সাত বছরের বিচার শেষে

www.pathagar.com

জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। নিকোলাস কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও (১৫৬৪–১৬৪২ খৃষ্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণনের তত্ত্ব প্রচার করলেন। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও কৌশল করে ধর্মীয় গুরুদের শাস্তি এড়াতে পারলেন। কুরআন বা ইসলাম পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে কোন কলহের সৃষ্টি করে নাই। এটা করেছে অতীত গ্রীস ও মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্মগুরুগণ। কুরআনের এ সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন নিরক্ষর ব্যক্তি হিসাবে এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব পেশ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই কুরআন যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নয়, আল্লাহর গ্রন্থ, এটি প্রমাণিত হয়। একসময়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, সূর্য স্থির। কিন্তু কুরআন স্পষ্ট বলে যে, সূর্যও তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কুরআনের কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ সংশোধনের প্রয়োজন পড়েনি এ চৌদ্দশত বৎসরেও।

কুরআন বলে, "আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত তোমার প্রতিপালকের হতে তোমার (হযরত মুহাম্মদ) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ ১ আয়াত)।

কুরআন বলে,

"যদি আমি (আল্লাহ্) এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তুমি দেখতে উহা আল্লাহর (হুকুমের) ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য– যাতে তারা চিন্তা করে।" (৫৯ সূরা হাশ্‌র ঃ আয়াত ২১)।

কুরআন বলে, "ইহা (কুরআন) অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ– কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– অগ্র হতেও না, পশ্চাত হতেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (৪৯ সূরা হামীম-আস্ সাজদা ঃ ৪১–৪২ আয়াত)। এতে বোঝা যায় যে, কোন মিথ্যা কুরআনে প্রবেশ করবে না। চৌদ্দশত বছর কুরআনের 'টেক্স' অবিকৃত থাকা এরই প্রমাণ। পৃথিবীর অনেক গ্রন্থ সম্পর্কে তা বলা যাবে না। এইসব গ্রন্থের বিভিন্ন 'টেক্সট' পাওয়া যায়।

কুরআন বলে, বল, "তোমরা ভেবে দেখ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?"

"আমি (আল্লাহ্) ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে

www.pathagar.com

এবং ওদের নিজদিগের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, উহাই (কুরআন) সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত?" (৪১ সূরা হামীম-আস্ সাজ্‌দা ঃ ৫২-৫৩ আয়াত)।

"তুমি (হে মুহাম্মদ) তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বস্তুত যাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদিগের অন্তরে এ স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন অস্বীকার করে।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ ৪৮ -৪৯ আয়াত)।

কুরআন বলে, "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও হতো তবে তারা ওতে অনেক অসংগতি পেত"। (৪ সূরা নিসা ঃ ৮২ আয়াত)।

যদি কুরআন মিথ্যা হতো তাহলে বহু ভুলভ্রান্তি তাতে থাকত। কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব যা বর্তমানে প্রমাণিত হচ্ছে তা কিভাবে কুরআনে এলো, এটা কি ভেবে দেখতে হবে না? কুরআন স্রষ্টার সৃষ্ট বলেই সৃষ্টির অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক রহস্য এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ মরিস বুকাইলি খৃষ্টান হয়েও গবেষণা করে কুরআনে কোন বৈজ্ঞানিক অসংগতি বের করতে পারেন নাই।

কুরআন বলে,

"বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জীন্ সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।" (১৭ সূরা বনী ইস্‌রাইল ঃ ৮৮ আয়াত)। আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জ চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত রয়েছে। কুরআনের অনুরূপ এর ভাব ও ভাষার অনুরূপ গ্রন্থ তৈরির চ্যালেঞ্জ এখনও জারি রয়েছে। কুরআন শুধু একটি গ্রন্থই নয়, এটি একটি জীবন বিধান, একটি দর্শন, একটি বিজ্ঞান, একটি আধ্যাত্মিক সমাধান, একটি সাহিত্য এবং আরো কিছু।

কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ) আমার বান্দার (হযরত মুহাম্মদের) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ কুরআন গ্রন্থ) তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর,

www.pathagar.com

মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩-২৪)।

কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ্) রাসূলকে (হযরত মুহাম্মদকে) কাব্য রচনা করতে শিখাই নাই এবং উহা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহা (কুরআান) তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; যাতে সে (হযরত মুহাম্মদ) সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে এবং যাতে কাফিরদিগের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৬৯-৭০)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলতে চান যে, কুরআন কাব্যমণ্ডিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য হল উপদেশ প্রদান। তবে একথা থেকে বোঝা যায় যে, আরবের পণ্ডিতগণ কুরআনের ভাষা ও ভাব মাধুর্যে একে কাব্য ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কবি ধরে নেয়। এ ধারণা সত্য না হলেও কুরআন যে হেলাফেলার বিষয় নয়, তা বোঝা যায়।

কুরআন বলে, "নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সে (হযরত মুহাম্মদ) যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।" (৬৯ সূরা হাক্কা ঃ আয়াত ৪০-৪৭)।

আল্লাহ প্রতিবাদ করে বলেন যে, "কুরআন কবির রচনা নয়। আর এটা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রচনাও নয়।"

কুরআন বলে, "ওরা কি বলে, এই কুরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং ওরা অবিশ্বাসী। ওরা যদি সত্যবাদী হয় এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না! ওরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং ওরা তো অবিশ্বাসী।" (৫২ সূরা তূর ঃ আয়াত ৩৩-৩৬)।

কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জ করেছে মানুষকে অনুরূপ গ্রন্থ সৃষ্টি করতে। ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আধ্যাত্মিক ভাবনা সব নিয়ে এমন গ্রন্থ পৃথিবীতে কি আর দ্বিতীয়টি রয়েছে?

www.pathagar.com

কুরআন বলে, "শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী (হযরত মুহাম্মদ) বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়, আর সে নিজের ইচ্ছামতো কথা বলে না। এ ওহী (প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ বা রিভিলেশন) যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাকে শিক্ষা দেয় মহা শক্তিধর (জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা)। সে উচ্চ দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছিল। তারপর সে তার কাছে এল, খুব কাছে– যার ফলে তাদের দু'জনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। তখন তিনি (আল্লাহ্‌) তাঁর দাসের প্রতি যে প্রত্যাদেশ করার, সেই প্রত্যাদেশ করলেন। সে (হযরত মুহাম্মদ) যা দেখেছিল তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তর্ক করবে?" (৫৩ সূরা নজ্‌ম আয়াত ১–১২)।

"মানুষের জন্য একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের (হযরত মুহাম্মদ) কাছে ওহী পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর ও বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য বড় মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ-তো এক স্পষ্ট জাদুকর'।"(১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ২)।

"তিনি (আল্লাহ) মহান মর্যাদার অধিকারী আরশের (স্রষ্টার সিংহাসন বা কেন্দ্রের) অধিপতি। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা নিজের আদেশ দিয়ে ওহী পাঠান, যাতে সে কিয়ামত-দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ১৫ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতে বোঝা যায় স্রষ্টা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার বলে যাকে খুশী ওহী গ্রহণের যোগ্যতা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্য কারো কোন এক্তিয়ার নেই।

কুরআন বলে, "হা-মিম। আইন-সিন-কাফ। শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ এভাবে তোমার (হযরত মুহাম্মদের) ওপর প্রত্যাদেশ করেছেন ও এভাবেই তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের ওপর প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই। তিনি সমুন্নত মহান।" (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ১–৪)।

"এ দেহধারীদের জন্য নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহী ছাড়া, অন্তরাল না রেখে বা কোনো দূত প্রেরণ না করে– যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাঁর অনুমতিক্রমে। তিনি তো সবার উপরে তত্ত্বজ্ঞানী। এভাবে আমি তোমার (হযরত মুহাম্মদের) কাছে এক ফেরেশতা জিব্রাইল প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। তুমি জানতে না কিতাব কি, বিশ্বাস কি। কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি;

www.pathagar.com

তুমি কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর–আল্লাহর পথ। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই (আল্লাহরই)। সব ব্যাপারের পরিণতিই আল্লাহর দিকে।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ৫১–৫৩ আয়াত)।

"তোমার পূর্বে আমি (আল্লাহ) প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম– তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দের (কিতাবীদের) জিজ্ঞাসা কর।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ ৭ আয়াত এবং ১৬ সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪৩ আয়াত)।

"তোমার (হযরত মুহাম্মদ) কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে আর ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের কাছে আর আমি দাউদকে দিয়াছিলাম যাবুর।" (৪ সূরা নিসা ঃ ১৬৩ আয়াত)।

ডাঃ মরিস বুকাইলি লিখেন, "আসলে কোরআনের মানব-প্রজনন সংক্রান্ত সব বক্তব্য আধুনিক যুগের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে নতুন করে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। অন্য কথায় কোরআনের বর্ণিত তথ্যাবলী আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এখানেই প্রশ্নঃ

মোহাম্মদের (দঃ) যুগে বসে কিভাবে কারো পক্ষে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানা সম্ভব? এ কথাতো কারো অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভ্রূণতত্ত্বের এতসব তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছে কোরআন নাজিলের হাজার বছর পরে একান্ত হালে, আধুনিক যুগে এসে। সুতরাং বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এই ইতিহাসই আজ আমাদের সবাইকে একটিমাত্র স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে দিচ্ছে, আর তা হল ঃ 'কোরআনের এতদ সংক্রান্ত এইসব বাণী ও বক্তব্য কোন মানুষের বাণী ও বক্তব্য হতে পারে না। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে ঐশী বক্তব্য; এই বাণী নির্ভুলভাবেই আসমানী ওহী।'

(দি অরিজিন অব ম্যান, পৃষ্ঠাঃ ১৯২)।

কিছু কিছু পশ্চিমী পণ্ডিত কুরআনকে সমালোচনা করলেও, বহু বিখ্যাত পণ্ডিত কুরআনকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বসওয়ার্থ স্মিথ লিখেছেন, "It was one miracle claimed by Muhammad his 'standing miracle', he called it and a miracle indeed it is." (Muhammad, P-290)। [অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ একটিমাত্র অলৌকিক জিনিস দাবী করেন তা হলো– কুরআন, তিনি এটিকে তাঁর 'স্থায়ী ও খ্যাত অলৌকিক বস্তু' বলেন এবং সুনিশ্চিতভাবে এটি একটি অলৌকিক বস্তু।]

www.pathagar.com

পামার (Palmer) তাঁর কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেন, "That the best of the Arab writer has never *succeeded* in producing anything equal in merit to the Qur'an itself is not surprising". (P. LV) . (অনুবাদ ঃ আরবের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ যে কুরআনের ন্যায় প্রতিভাদীপ্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারেন নাই তা আশ্চর্যের কিছু নয়।"]

ডাঃ মরিস বুকাইলি 'দি অরিজিন অব ম্যান' গ্রন্থে লেখেন, "কোরআনের মূলসূত্র সম্পর্কে এই যে প্রচারণা (অর্থাৎ কোরআন 'মেহোমেট'-এর রচিত একখানি পুস্তক– যা বাইবেল নকল করে লেখা)– যা শিক্ষা প্রদানের নাম করে প্রচার করা হয়ে থাকে, তা কিন্তু আসল সত্যের ধারে কাছেরও কিছু নয়। তবুও কোরআন সম্পর্কে এই অসত্য শিক্ষা কখনো সরাসরি, আবার কখনো সুকৌশলে সর্বত্র প্রচার করা হচ্ছে। আর এই ধরনের শিক্ষায়, শিক্ষিত হয়ে যারা 'বড়' হচ্ছেন, তারা যে দেশের বা যে ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন যে, বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে বাইবেলে যে ধরনের ভুলের গোনজায়েশ রয়েছে, কোরআনও তা থেকে মুক্ত নয়।

আসলে কোরআন সম্পর্কে যে সব 'শিক্ষা' ও 'প্রচার' সর্বত্র চালু রয়েছে, তাতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেই প্রচারণায় অনুপ্রাণিত যে-কারো পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো খুবই স্বাভাবিক। অথচ কে তাঁদের বুঝাবে যে, তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটি তো বটেই,–সেই সিদ্ধান্তের মূলে কার্যকর যে শিক্ষা ও প্রচারণা– তাও আগাগোড়া অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।" (পৃষ্ঠা ১২৪)

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান লেখেন, "একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'আপনি কেন মুসলমান? আপনার বিশ্বাসের পিছনে কোন অলৌকিক ঘটনা আছে কি?' বিশ্বাসী মুসলমান তখন কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে বলবেন, 'আমার বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে একটিমাত্র অলৌকিক বস্তু আছে, সে অলৌকিক হচ্ছে কোরআন শরীফ। চৌদ্দশ্য বছর আগে এটা যেমন ছিল,আজও তেমনি আছে। চৌদ্দশ' বছর আগে এটাকে অবলম্বন করেই মুসলমানরা যেভাবে ধর্মকর্ম নির্বাহ করত, আজও তাই করে। খ্রীষ্টানদের অলৌকিকতা যীশু খ্রীষ্টের জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু আজ আর কোন খ্রীষ্টান মৃততে জীবনে আনতে পারে না। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে মুসলমানদের জন্য যা অলৌকিক ছিল, আজও একই অবস্থায় তা অলৌকিক।

সকল পয়গম্বরেরই কিছু না কিছু নিদর্শন ছিল। সে সব নিদর্শনের সাহায্যেই তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। হযরত মূসা যাদুকরদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে এবং ফেরাউনের বিরুদ্ধে অলৌকিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে রোগমুক্ত করেছেন এবং মৃতকে প্রাণ দিয়েছেন। সর্বশেষ পয়গম্বরকে একটিমাত্র নিদর্শন দেয়া হয়েছিল। সে নিদর্শন হচ্ছে পবিত্র কোরআন, এ নিদর্শনটি এখনো আমাদের কাছে আছে। যেহেতু শেষনবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে গেছে, সে কারণে কোরআন শরীফের বিদ্যমানতা একান্তই স্বাভাবিক এবং যথার্থ। চৌদ্দশ' বছর আগের মুসলমানরা ধর্মীয় যে আচরণের মধ্যে বাস করত, আজকের মুসলমানরাও সেই একই আচরণের মধ্যে বাস করে। রাসূলে খোদার নিকটে যারা ছিলেন, তাদের জন্য যেমন কোরআন শরীফ ছিল– আমাদের জন্যও তেমনি কোরআন শরীফ আছে। এটা তাদের জন্য যেমন 'নিদর্শন' ছিল আমাদের জন্যও এটা তেমনি 'নিদর্শন'।

এখন আমরা কোরআন শরীফের সত্যতা নিয়ে এবং অলৌকিকতা বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ধরা যাক, আমি একজন লোককে বললাম, 'আমি তোমার পিতাকে জানতাম।' লোকটি কিন্তু সহজে আমার কথা মেনে না-ও নিতে পারে। সে প্রশ্ন করতে পারে, 'আপনি বলছেন আপনি আমার পিতাকে জানতেন, বলুন তো তিনি হ্রস্বকায় ছিলেন, না দীর্ঘকায় , তাঁর মাথার চুল কি কোঁকড়ানো ছিল? তিনি কি চশমা পরতেন?' আমি যদি তার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেই তাহলে সে বিশ্বাস করবে যে, আমি সত্যিই তার পিতাকে জানতাম।

কোরআন শরীফ একটি গ্রন্থ। তার লেখক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি দাবি করছেন যে, বিশ্বসৃষ্টির সূচনালগ্নে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জীব সৃষ্টির সূচনালগ্নেও। আমরা আল্লাহকে প্রশ্ন করতে পারি, 'আপনি আমাদের প্রমাণ দিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে এবং জীবন যখন আরম্ভ হল তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন।' কোরআন শরীফের সূরা আম্বিয়াতে এর উত্তর আছে ঃ

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, সকল আকাশ এবং ভূ-মণ্ডল একটি একক ছিল এবং আমিই তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম? প্রতিটি জীবিত প্রাণকণাকে আমরা পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০)।

এখানেই কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহর উপস্থিতির প্রমাণ হয়। প্রমাণ যে, সৃষ্টির আদিতে তিনি ছিলেন এবং সৃষ্টির সকল রহস্য তার সম্মুখেই উদঘাটিত হয়েছে। আমরা বর্তমানে জানি যে, বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যের মূল্যে বিজ্ঞানীগণ একটা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। সে তত্ত্বটিকে ইংরেজীতে বলা হয়, 'বিগ ব্যাংগ থিয়োরী'। এই তত্ত্ব অনুসারে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে,

www.pathagar.com

আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী যাকে বলা হয় 'মনোরক' অকস্মাৎ এক সময় বিদীর্ণ হয় এবং চতুর্দিকে বিস্তারিত হতে থাকে। এভাবেই আমরা পৃথিবীকে পেয়েছি। এটি আধুনিক সময়েরই বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা একই কথা বলেছেন।

কয়েক বছর আগে একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় এই 'বিগ ব্যাংগ থিয়োরী' আবিষ্কারের জন্য। এছাড়া প্রায় দু'শ' বছর আগে একজন ডাচম্যান অনুবীক্ষণকে বিশুদ্ধ করেন এবং তার সাহায্যে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, প্রতিটি জীবকোষে প্রায় আশিভাগ পানি আছে। এভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা কোরআন শরীফে আল্লাহ'র সাক্ষ্যটি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছি যে, বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে বিধাতা ছিলেন, তিনিই পৃথিবীকে একটি সত্তকে ভেঙে নির্মাণ করেছেন এবং তিনি পানি থেকে জীবকোষ নির্মাণ করেছেন।

আধুনিক বিশ্বে বিগ ব্যাংগ তত্ত্বটির আবিষ্কারক ব্রাসেলস-এর পদার্থ ও অংকশাস্ত্রবিদ জর্জ ল্যাসাৎর। তিনি বলেন, 'শত শত কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ একটিমাত্র পরমাণুতে সংহত ছিল। পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সৌরজগতের জন্ম দেয়।'

তত্ত্ব আলোচনা করতে অথবা কোন ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে গেলে কোন না কোন একটা বিশ্বাসে আমাদের স্থির নিশ্চিত হবে। যদি তা না হয় তাহলে প্রশ্নের কোন অন্ত থাকবে না এবং কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছা একেবারে অসম্ভব হবে। একটি ঠিক জায়গায় আমাদের পা রাখতে হবে। তারপরই তো অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন। পৃথিবীতে একটি প্রমাণের আরো প্রমাণ এবং আরো অধিকতর প্রমাণ হতে পারে না। একটি প্রমাণেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিজ্ঞানীরা যখন একটি অনুসন্ধান করা আরম্ভ করেন তখন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এবং দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। যখন দেখা যায়, সব অনুসন্ধানই একটি সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে তখনই বলা হয়, আমরা যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌছেছি।

আমরা যখন কোরআন শরীফকে পরীক্ষা করে এবং এর অলৌকিক উৎস সন্ধান করতে চাই তখন আমরা ইসলামের বিশ্বাসে এসে উপনীত হই। এই একটা পদ্ধতি রয়েছে যা প্রতিটি মুসলমান মান্য করে। কিন্তু যারা মুসলমান নয়, তাদের বিশ্বাসের জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা যদি অন্যান্য ধর্মের পয়গম্বরগণ কি বলেছেন সেগুলো ঠিকমতো পরীক্ষা করতে পারি এবং

www.pathagar.com

পরীক্ষা করে ইসলামের বিশ্বাসে এসে উপনীত হই তাহলে আমরা বলতে পারব–'সর্বদিক থেকে পরীক্ষা করে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, মহাগ্রন্থ কোরআন অলৌকিক।' এভাবেই আমরা মহাবিশ্ব যে বিস্তারিত হয়ে চলেছে– কোরআন শরীফের সাহায্যে যেমন সে সত্যকে আবিষ্কার করি, আবার ল্যাসাৎর-র এর আবিষ্কারের সাহায্যে একই সত্যে এসে পৌঁছি। এভাবেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল না, ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রভু আল্লাহর বাণীর সুস্পষ্ট অর্থ না বুঝতে পেরে শুধুই বলতাম, একমাত্র আল্লাহ্ই এর অর্থ জানেন। কিন্তু এখন আর সেকথা না বুঝে বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সিদ্ধান্তের বহু পূর্বেই আল্লাহ নিজেই মহাবিশ্বের বিস্তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোরআন শরীফের ঊননব্বই সূরার সপ্তম আয়াতে 'ইরাম' নামক একটি শহরের কথা বলা হয়েছে। ইরাম শহরের নাম ইতিহাসে নেই। কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাকাররাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হননি।

তারা সম্ভবত এটা প্রতীকগত কোন নাম– এ রকম কথা বলেছেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে সিরিয়ার 'এরলূস' নামক একটি পুরানো শহরে খনন কার্যের ফলে কিছু পুরানো লিখন পাওয়া যায়। এ লিখনগুলো মাটির ফলকের ওপর খোদিত ছিল। এ সমস্ত লিখন পরীক্ষা করে চার হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে 'ইরাম' শহরের উল্লেখ আছে। এরলূস অঞ্চলের লোকজন 'ইরাম' শহরের লোকজনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এ সত্যটা আমরা আবিষ্কার করলাম মাত্র সেদিন–১৯৭৩ সালে। তাহলে কোরআন শরীফের মধ্যে এই শহরের নাম এলো কি করে? এর উত্তর এখন আমরা সহজেই দিতে পারি। যেহেতু কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং তিনি সৃষ্টির সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিলেন, তাই ইরাম শহরকে তিনি জানতেন এবং আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তাঁর রাসূলকে প্রথম জানিয়েছেন এবং বর্তমানে আমরাও এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি।

কোরআন শরীফের বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

'তোমরা কি দেখোনি কিভাবে তোমাদের প্রভু আদ জাতির প্রতি ব্যবহার করেছিলেন, কি করে তিনি উচ্চ স্তম্ভযুক্ত ইরাম শহরকে ধ্বংস করেছিলেন, যার সমতুল্য আর কোন শহর পৃথিবীতে ছিল না।' (৮৯ সূরা আল-ফজর ঃ ৬৬–৬৮)

আল্লামা ইউসুফ আলী উক্ত আয়াতের টীকায় বলেছেন, 'ইরাম সম্ভবত আদ

www.pathagar.com

জাতির রাজধানীর নাম ছিল। কোন কোন ব্যাখ্যাকার ইরামকে আদ জাতিদের একজন প্রথিতযশা বীরের নাম হিসাবে ধারণা করেন।'

দেখা যাচ্ছে যে কোন টীকাকারই ইরামের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে পাননি, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে পাননি এবং পৃথিবীর লোক-পুরাণেও পাননি। সুতরাং পৃথিবীর কোন মানুষ ইরাম নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ইরামের অস্তিত্ব জানতেন শুধু আল্লাহ্। তাই তিনি ইরামের উদাহরণ দিয়েছেন এবং আজ আমরা বিস্মিত হয়ে অনুভব করছি যে, কোরআন শরীফ মানুষের সৃষ্টি নয়। এ গ্রন্থ আল্লাহ্র বাণীসম্বলিত একটি অলৌকিক অভিজ্ঞান।

বর্তমানে বিশ্বে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের পর ক্ষুদ্রতম বস্তু সম্পর্কে মানুষের একটি ধারণা জন্মেছে। অতীতে এ ধারণাটি ছিল না। কোরআন শরীফ যখন ঐশীবাণী হিসাবে অবতীর্ণ হয় তখন পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কোন অগ্রযাত্রাই ছিল না এবং ক্ষুদ্রতম বিষয় সম্পর্কে ভাববার কোন সুযোগ পৃথিবীর মানুষের ছিল না। কিন্তু কোরআন শরীফে ক্ষুদ্রতম বস্তুর বিষয়ে সংকেত আছে। কোরআন শরীফে 'যাররাহ' বলে একটি শব্দ আছে। বর্তমানে এই শব্দটির অর্থ করা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অণু হিসাবে যাকে আমরা 'এ্যাটম' বলি। যখন বৈজ্ঞানিকগণ যাররাহ শব্দটির সন্ধান পেলেন তখন তারা বললেন যে–'যাররাহ'এ্যাটম হতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ্যাটমের চেয়েও তো ক্ষুদ্রতম অণু আছে।

এর উত্তরও কোরআন শরীফে পাওয়া যায়। কোরআন শরীফে সূরা ইউনুস-এর ৬১ তম আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন– 'কোন কিছুই বিশ্ব বিধাতার কাছ থেকে লুক্কায়িত নয় অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন কিছু তা-ও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই। এ সমস্ত কিছুই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে।'

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান বিজ্ঞানের অণু-পরমাণু এবং তাদের বিভাজন সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআন বহু পূর্বেই ইঙ্গিত করেছে। (আল্লাহর অস্তিত্ব, বাড পাবিলকেশন্স, ঢাকা, পৃঃ ৮–১১)।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ সৈয়দ আলী আহসান আরো লেখেন, "কোরআন শরীফের সূরা আল আরাফ-এ ১৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলছেন ঃ

'যারা আমাদের সুস্পষ্ট চিহ্নগুলো অস্বীকার করে তাদের তুলনা হচ্ছে কুকুরের সঙ্গে।'

www.pathagar.com

গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, 'যারা আমাদের সুস্পষ্ট চিহ্নগুলো অস্বীকার করে'– এই কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে কোরআন শরীফে এসেছে এবং মোট পাঁচবার এসেছে। তেমনি আল কাল্‌ব অর্থাৎ কুকুর শব্দটি মোট পাঁচবার এসেছে। এ রকম অনুসন্ধান করলে আরো অনেক শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে উপমান ও উপমেয়-এর মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফের বাণী এবং উচ্চারণ সর্বসময়ের জন্য পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। এগুলো এমন এক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ এবং এমন এক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত যে, পৃথিবীর কোন মানুষের সাধ্য নেই এগুলোর মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বের করে। এ এক অলৌকিক পরিপূর্ণতা যার কারণে কোরআন শরীফ নিজেই নিজের তুলনা। এই তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো যেখানে তুলনাটি অসম, সেখানে দুইটি উল্লেখের সংখ্যাও অসম। যেমন– কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 'সুদ' এবং 'বাণিজ্য' এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই শব্দ দু'টির একটি কোরআন শরীফে এসেছে ছয়বার এবং অন্যটি এসেছে সাতবার। এভাবে আরো অনেক উদ্ধৃতি দেয়া যায়, যেখানে অসমতা প্রমাণের জন্য দুইটি শব্দের উল্লেখেরও তারতম্য ঘটানো হয়েছে।

এর একটি ব্যতিক্রম কোরআন শরীফের এক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটা ব্যতিক্রম নয়। সূরা আল-মায়েদা-এর ১০০ আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

'বল, যা পাপ এবং অপবিত্র তার সঙ্গে শুভ এবং কল্যাণের তুলনা হয় না। যদিও পাপের অতিরিক্ততা তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং তোমরা যারা জ্ঞানবান, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় পাবে– যেন তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারো।'

কোরআন শরীফে পাপের জন্য 'আল খাবিস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুণ্য কল্যাণের জন্য 'আল তাইব' ব্যবহার করা হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, কোরআন শরীফে এ শব্দ দু'টির উল্লেখের মধ্যে সমতা আছে। দু'টি শব্দই সাতবার করে এসেছে। এটা কি করে হল? আমরা সূরা 'আনফাল'–এ যদি যাই তাহলে দেখতে পাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

'অপবিত্রকে পবিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপবিত্রকে একের পর একে পুঞ্জীভূত করে এবং সেগুলোকে নরকের আগুনে ফেলে দেয়।'

উক্ত আয়াত পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পাপের সংখ্যা বেশী, যদিও পাপ শব্দটি সাতবার এসেছে। 'পুঞ্জীভূত করা' বলার মধ্য দিয়ে পাপের

www.pathagar.com

সংখ্যা যে বেশী তা বোঝানো হয়েছে। এহেন বিস্ময়কর বিবেচনা এবং নিরীক্ষণ পৃথিবীতে একমাত্র কোরআন শরীফেই আছে, আর কোথাও নেই।

পাশ্চাত্য-সমালোচকগণ দীর্ঘকাল ধরে এটা বলে আসছেন যে, কোরআন শরীফে চান্দ্রমাস অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। তার কারণ কোরআন শরীফ যার লেখা, সৌরবর্ষ সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। তাঁরা এই যুক্তিটি উপস্থিত করেছেন এই বলে যে, সৌরবর্ষই হচ্ছে যথার্থ বর্ষ গণনা। কেননা, চান্দ্রবর্ষে আমরা প্রতিটি বছরের ১১টি দিন কম পাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই বিশ্লেষণ যে সত্য নয়, তার প্রমাণ রয়েছে সূরা আল ক্বাফ'-এ। সেখানে আল্লাহ্তায়ালা সময় গণনার এবং সময় হারিয়ে যাওয়ার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার সাহায্যে টীকাকারগণ এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সূরা 'আল ক্বাফ'-এর বিশ্লেষণ অনুসারে তিনশত সৌরবর্ষ, তিনশত নয় চন্দ্র বর্ষের সমান।

কোরআন শরীফে 'মাস'-এর আরবী প্রতিশব্দ 'শহর'। এই 'শহর' শব্দটি কোরআন শরীফে বারো বার এসেছে। আমরা জানি যে, বারো মাসে এক বছর হয়। বারো মাস আমরা যখন পেলাম, তখন আমরা অনুসন্ধান করে দেখব যে, কয়টি দিবসে এক বৎসর হয়– তা কোরআন শরীফে আছে কি না। দিনের আরবী হচ্ছে 'ইয়াউম'। এ শব্দটি কোরআন শরীফে ৩৬৫ বার এসেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোরআন শরীফের রচয়িতার সৌর বছর এবং মাস গণনার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

২৫ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর মানুষ জানতো যে, চন্দ্র-সূর্য এবং পৃথিবী প্রতি ঊনিশ বছর একই সরলরেখায় অবস্থান গ্রহণ করে। একজন গ্রীক পণ্ডিত এটাকে প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম ছিল মেতন, এবং তাঁর নামেই এ ঘটনাকে বলা হয় 'মেতনীয় বৃত্ত'। কোরআন শরীফের শব্দসূচি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে 'সানাহ্' শব্দটি পবিত্র গ্রন্থে ঊনিশবার এসেছে। 'সানাহ্' আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বছর।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল ধরে, বিশেষ করে মধ্যযুগে কোরআন শরীফের মধ্যে নানা ধরনের অসামঞ্জস্য বের করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে বিশেষ করে কম্পিউটার প্রয়োগের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি যে, কোরআন শরীফের শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে সুশৃঙ্খল। খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ এরকম সন্দেহ কখনো কখনো প্রকাশ করেছেন যে, যে কোরআন শরীফ আমরা পাচ্ছি এখন সেটা সর্বাংশে বিশুদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির দ্বারা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ওহী যখন নাযিল হয়েছিল তখন কোরআন শরীফের শব্দগুলো যে রকম ছিল এখনো অবিকল সে রকম আছে। বহুদিন পর্যন্ত কোরআন শরীফের শব্দগত ভারসাম্য এবং যুক্তিযুক্ত বিন্যাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরাএকটি বিস্ময়কর উপলব্ধিতে এসেছি যে, কোরআন শরীফের শব্দ ব্যবহারের মধ্যে কোন প্রকার অসতর্কতা নেই। কোরআন শরীফের 'ক্বালু' শব্দটি অর্থাৎ 'তারা বলে' এ কথাটি ৩৩২ বার এসেছে। স্বাভাবিকভাবে এ শব্দের বিপরীতটি অর্থাৎ 'কুল' শব্দটি ঠিক একই সংখ্যকবার কোরআন শরীফে এসেছে। 'কুল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বলা'। এটি একটি অনুজ্ঞা।

কোরআন শরীফের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে– এর উৎস সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর এ মহাগ্রন্থের অভ্যন্তরেই আছে। এর উৎস সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয়ের উত্তর কোরআন শরীফ নিজেই দিয়েছে। খ্রীষ্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় বিশ্বকোষ আছে। যার নাম 'ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া'। সেখানে কোরআন শরীফের উৎস সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে বলা হয়েছে যে–'বহু শতাব্দী ধরে কোরআন শরীফ কোন্ উৎস থেকে এবং কিভাবে এসেছে তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু এ তত্ত্বগুলির কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

ক্যাথলিকদের বিশ্বকোষে উক্ত কথাগুলো থাকায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় একটু অসুবিধায় পড়েছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকে একথাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, কোরআন শরীফ একজন মানুষের লেখা অথবা একজন মানুষের কথা।

কিন্তু আমরা জানি যে, রাসূলে খোদার কথকতা হচ্ছে হাদীস এবং হাদীসের ভাষা হচ্ছে রাসূলে খোদার নিজস্ব ভাষা এবং এ ভাষার সঙ্গে কোরআনের ভাষার মিল নেই। কোরআনের ভাষা একটা বিস্ময়কর অলৌকিক নির্মিতি– যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন ভাষা পৃথিবীতে কোথাও নেই।

কোরআন শরীফে সূরা 'আননিসা'-তে ৮২ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বল্ছেন ঃ

'তারা কি কোরআন বুঝবার চেষ্টা করবে না? যদি এ গ্রন্থটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে আসত তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য এবং অসামঞ্জস্য খুঁজে পেতো।'

www.pathagar.com

এটা (কোরআন শরীফ) যখন নাযিল হয় তখন এবং এখনো বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহতায়ালার একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করেছেন। বলেছেন যে, তোমরা যদি পারো তাহলে এর সমতুল্য একটি গ্রন্থ উপস্থিত করো।

'বহু যুগ ধরে খ্রীষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায় কোরআন শরীফের অভ্যন্তরে নানারকম বৈসাদৃশ্য বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কখনো পারেনি। কোন একজন পণ্ডিত বিবাহ ব্যাপারে কোরআন শরীফের মধ্যে 'অসামঞ্জস্য' খুঁজে পেয়েছিলো। এক জায়গায় কোরআন শরীফে বলা হয়েছে–'যদি সকলের জন্য সমান স্বাচ্ছন্দ্য না আনতে পারো তবে এক স্ত্রীর বেশী স্ত্রী গ্রহণ করো না।'

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে– 'চারজনের বেশী স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না।' এ কথা দু'টিকে অনেকে স্ববিরোধিতা বলছেন। কিন্তু এ বিচারটি যথার্থ নয়। তার কারণ, প্রথম উক্তিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উক্তিতে ক'জনকে বিয়ে করা যাবে সে বিষয়ে একটা সীমা টেনে দেয়া হয়েছে। উক্তি দু'টির মধ্যে বিরোধিতা নেই। কিন্তু বাইবেলে বহু দাবির স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই এবং কোন প্রমাণ নেই। খ্রীষ্টানরা দাবী করেন– 'যীশু খ্রীষ্ট আল্লাহ্‌র সমতুল্য।' কিন্তু তিনি যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য তার কোন প্রমাণ তারা বাইবেল থেকে দিতে পারে না। খ্রীষ্টানরা কোরআন শরীফ রাসূলে খোদার লেখা এবং তাঁর কথকতা– এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে বলে থাকে–'এটা অবশ্য ঠিক যে, কোরআন শরীফ মুহম্মদের লেখা নয়, তাহলে নিশ্চয় এটা শয়তানের লেখা। কেননা, এটা তো বাইবেল নয়।' খ্রীস্টান আচার্যগণের এ সমস্ত উক্তি থেকেই 'স্যাটানিক ভার্সেস' কথাটি এসেছে। এ অভিযোগের উত্তর কোরআন শরীফের সূরা 'আস্‌শুআরা'-তে আল্লাহ্‌তায়ালা দিয়েছেন ঃ

'এবং এই অলৌকিক লেখনী কোন প্রেতাত্মার দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। যখন তারা নিজেদের মতামতের সঙ্গে মিলাতে পারে না তখনই তারা একথা বলে এবং এটা যে মানুষের লেখা একথা প্রমাণ করবার ক্ষমতাও তাদের নেই। মূলত তারা বধির এবং কোরআন শরীফ শ্রবণ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। (২৬ঃ২১০–২১২)।

যীশু খ্রীষ্টের জীবনের একটি ঘটনা এখানে আমরা উপস্থিত করতে পারি। ইহুদীরা যীশু খ্রীষ্টকে জানত এবং তাঁর বিরোধিতা করত। শেষ পর্যন্তও তারা বিরোধিতা করেছিলো। বাইবেলে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে– যেখানে যীশুখ্রীষ্ট 'ল্যাজারাস' নামক একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করেছিলেন। মৃত ল্যাজারাসকে

www.pathagar.com

চারদিন পর কবর থেকে জীবন্ত তোলা হয়। ইহুদীরা এ অলৌকিক ঘটনা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল–'এ লোকটি যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছে তাতে অতিসত্বরই সাধারণ মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবে। সুতরাং তাকে হত্যা করবার জন্য আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

তখন তারা ঘোষণা করল– 'যীশু হচ্ছে প্রেতসিদ্ধ এবং শয়তানের সাহায্যে সে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে থাকে।'

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের কথা উপস্থিত করে। এটা চিরকাল হয়ে এসেছে। ইহুদীরা যেমন যীশু খ্রীষ্টকে ব্যঙ্গ করেছে, খৃষ্টানরাও অবিকল তেমনি কোরআন শরীফকে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বলে ব্যঙ্গ করে থাকে।

ইহুদী, খৃষ্টনরা কোরআন শরীফের সমালোচনার সূত্রে প্রায়-ই অভিযোগ তুলে যে, রাসূলে খোদা ইহুদী এবং খৃষ্টান পুরাণ থেকে কোরআন শরীফ নকল করেছেন। এটা যে কোনক্রমেই সত্য নয় তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা উপস্থিত করেছি। কোরআন শরীফে মিশরের এক সম্রাটের কথা বলা হয়েছে– যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কোরআন শরীফে তার নাম দেয়া হয়েছে– 'ফিরাউন'। ইহুদীদের এবং খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে এবং তাদের পুরাণে 'ফিরাউন' শব্দটি নেই। আছে ফেরাও। এখন এই 'ফেরাও' এবং 'ফিরাউন' কি এক? গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস একজন মিশরীর সম্রাটের কথা বলেছেন যার নাম ছিল ফিরাউন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোরআন শরীফ ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র বা পুরান থেকে কিছুই নকল করেনি।

খৃষ্টানরা বলে থাকেন–'তেত্রিশ বছর বয়সে যীশু খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।'

কিন্তু কোরআন শরীফে বলা হয়েছে–'যীশুখৃষ্ট মাতৃক্রোড়ে যখন ছিলেন তখনই তিনি কথা বলেছেন মানুষের কাছে এবং পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি কথা বলে গেছেন।' এটা কোরআন শরীফের 'আলে ইমরান' সূরায় আছে। সুতরাং কোরআন শরীফ যীশু খ্রীষ্টের জীবনধারার ব্যাপারে বাইবেল থেকে কিছুই গ্রহণ করেনি।

ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে রাসূলে খোদার আগমনের ইঙ্গিত আছে। অনেক হাজার বছর ধরে প্রচলিত পারসিকদের ধর্মগ্রন্থে একটা বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখটা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

'যখন পারসিকরা নীতি এবং আদর্শ বঞ্চিত হবে তখন আরবদেশে এমন মানুষের জন্ম হবে, যার অনুসারীরা পারসিকদের সিংহাসন, ধর্ম এবং সবকিছু বিনষ্ট করবে। যে গৃহে অনেক মূর্তি রক্ষিত ছিল, সে মূর্তিগুলো ফেলে দেয়া হবে এবং লোকেরা এ গৃহের দিকে মুখ করে তাদের উপাসনা করবে। তার অনুসারীরা ফারস, এনতাউস এবং বাল্‌খ দখল করবে এবং আশপাশের আরো অঞ্চল দখল করবে। পারস্যের বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী তাকে অনুসরণ করবে।'

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, এই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যি হয়েছিল। যে গৃহের কথা বলা হয়েছে, সে গৃহ হচ্ছে– কাবা এবং যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে ব্যক্তি হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ)।

বাইবেলে 'ডিউটারোনোমি'র অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যৎ-বাণী পাচ্ছি। তিনি বলছেন–'আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইসরাইলীদের মধ্য থেকে মূসার মতো একজন নতুন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করবে।'

খৃষ্টানরা এই উক্তির মধ্য থেকে যীশু খৃষ্টের আগমনের উল্লেখ খুঁজে পায়। কিন্তু এটা সত্য নয়। তার কারণ "যীশু খৃষ্ট কোনক্রমেই হযরত মূসা (আঃ)-এর মতো ছিলেন না। যীশু খ্রীষ্টের পিতা ছিল না, স্ত্রী ছিল না, সন্তানাদি ছিল না। তিনি মূসার মতো বৃদ্ধ বয়সে মারা যাননি এবং তিনি তাঁর জীবিতকালে কোন জাতির নেতৃত্ব দিতে পারেননি। মূসার জীবনে এ সবকয়টি ছিল এবং রাসূলে খোদার জীবনেও এ সবকয়টি আমরা পাই। সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) যে নবীর আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন তিনি যীশুখ্রীষ্ট নয়, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

বাইবেলের, 'এ্যাকটস' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে–'পিটার জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছেন, যীশু খ্রীষ্টকে উর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি স্বর্গেই অবস্থান করছেন। তিনি সেখানেই থাকবেন, যতদিন না বিধাতা মূসার মতো একজনকে ইসরাইলীদের মধ্য থেকে নবী হিসাবে গ্রহণ করেন।"

একথায় এটা সুস্পষ্ট যে, যীশুখ্রীষ্ট একদিন প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু তখনই প্রত্যাবর্তন করবেন– যখন মূসার মত একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন।

খৃষ্টানরা বলে থাকে, যীশুখ্রীষ্ট একজন প্যারাক্লিটের আগমনের কথা বলেছেন। এই প্যারাক্লিট যে কি– তা আমরা জানি না। খৃষ্টানরা বলে থাকে, এই প্যারাক্লিট কোন মানুষ নয়, এ হচ্ছে একটি স্পিরিট বা আত্মা। কিন্তু তাদের

www.pathagar.com

এ বিচার সত্য নয়। তার কারণ, যীশুখ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে বলেছেন–'প্রভূ তোমাদের নিকট আমার মতই একজনকে পাঠাবেন।' এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে, আত্মার কথা বলা হয়নি। গ্রীক ভাষায় 'একই রকম' এবং 'অন্য রকম' এ দু'টির জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে 'Aloes' অপরটি হচ্ছে 'Heteroes'। গ্রীক বাইবেলে দেখা যায়, যীশু খ্রীষ্ট 'Alees' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তিনি প্যারাক্লিট বলে যাঁর কথা বলেছেন তিনি হচ্ছেন– রাসূলে খোদা স্বয়ং।

কোরআন শরীফে সূরা 'আল-আরাফে' ১৫৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন ঃ 'তৌরাত এবং পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে যে উম্মী পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে তাঁকে যারা অনুসরণ করবে তারাই ত্রাণ পাবে।'

এভাবেই আমরা কোরআন শরীফের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সাহায্যে এ অমোঘ বাণী যে মহান প্রভূ আল্লাহ্'র তা প্রমাণ করতে পারি এবং তাঁর নির্ধারিত শুদ্ধমত ধর্ম যে ইসলাম তা-ও প্রমাণিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করেছেন।"

(আল্লাহ্র অস্তিত্ব, পৃঃ ১৪–১৯)।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতাই কমে যায়। ২৬শে মার্চ ৯৯ শুক্রবার বিবিসি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন দেখছিলাম রাত্রি পৌনে দশটায়। 'হার্ডটক' প্রোগ্রামে ব্রিটিশ– স্কটিশ লেখক লুডোভিক কেনেডি (Ludovic Kennedy) যিনি 'ফেয়ারওয়েল টু গড' বই এর লেখক, 'বোগাস প্রফেসি' (মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর) কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রটেসট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম মতবাদে এসব মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

আসলে বিকৃত বাইবেল থেকে সত্য ভবিষ্যদ্বাণী বের করা কষ্টকর বটে। পাদরিদের নানা পরিবর্তনে বাইবেলের যে অবস্থা হয়েছে তাতে সত্য ভবিষ্যদ্বানী পাওয়া অনেক সময় কষ্টকর। তবে লুডোভিক কেনেডি যদি কষ্ট করে কুরআন ও হাদীস পাঠ করতেন– সত্য ভবিষ্যদ্বাণী তিনি পেতেন। কুরআন চৌদ্দশত বছরে সম্পূর্ণ অবিকৃত। এতে মিথ্যা ও বিকৃতি প্রবেশের কোন সুযোগ পায় নাই।

কুরআন মজিদ একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ নিঃসৃত আল্লাহরই বাণী। এটি যে একটি অলৌকিক বই– তা এ বইয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা

www.pathagar.com

সংঘটিত হওয়ার পরে সুনিশ্চিত বলে ধরা যেতে পারে। এ বইটি স্রষ্টার না হলে এমনটি হতো না।

কুরআন বলে, "আলিফ-লাম-মীম। রোম (সাম্রাজ্য) পরাজিত হয়েছে (আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে কয়েক বছরের মধ্যেই। সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। সেদিন মুসলমানগণ উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ইহা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" (৩০ সূরা রূম ঃ ১-৬ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল অমুসলমান। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় দলের ভিতর পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃষ্টান- আহ্‌লে কিতাব। ফলে রোমকগণ ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি-যথা পরকালে বিশ্বাস, নবী (প্রফেট), ওহীতে (রিভিলেশন) বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে রোমক সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এই ধরনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আহ্‌লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য হতে পৃথক হয়ে পূর্ব রোমক বা বাইযান্‌টাইন নামে যে সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়- এই আয়াতে সেই সাম্রাজ্যের কথা বুঝান হয়েছে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। হাফেজ ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী কুরআনের আয়াতের "নিকটবর্তী অঞ্চল" হোল হিজাযের উত্তর-পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন শামের (সিরিয়া) আয্‌রুআত ও বুস্‌বার মধ্যবর্তী স্থান। পূর্বরোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস (heraclius) ও পারস্য সম্রাট খুস্‌রাও পারভেজ এর মধ্যে এখানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কায় পৌত্তলিকগণ পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা,

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, রোমকগণ বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও কতিপয় নীতির দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু ফল হল এই যে, তখনকার মত অগ্নিউপাসক পারসিকগণ এ যুদ্ধে জয়লাভ করে। এমনকি বিজিত এলাকায় পারসিকদের ন্যায় উপাসনার জন্য মক্কার পৌত্তলিকগণ উৎফুল্ল হয়েও বলতে থাকে, আমরাও অচিরে মুসলমানদের পরাজিত করব। যাই হোক এই বিজয়ই ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম সূত্রে জানা যায়– পারসিকদের এই বিজয়ে মক্কার পৌত্তলিকগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়, বরং আহ্‌লে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।

ইবনে জরীর ও তিরমিযী হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়– হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) যখন রোমকদের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কীয় কুরআনী আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুর্পার্শ্বে এবং পৌত্তলিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।' পৌত্তিলিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না। একথা বলে হযরত আবূ বকর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি।' কুরআনে এর জন্যে "বিদ'ই ছিনীন" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন সূত্র মতে,

www.pathagar.com

সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হন।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় বসবাসের জন্য যাওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্‌ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবূ বকরও মক্কা ত্যাগ করে বিদেশে হিজরত করতে যাবেন, তখন সে বলল, 'আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশত উষ্ট্রী পরিশোধ করবে।' হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

"বিদ'ই ছিনীন" অর্থ "তিন হতে দশ বৎসর"। কুরআনের আয়াতটিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অনধিক নয় বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর জয়ী হবে। ৬২৩–২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সেই বছরই (২রা হিজরী সাল/ ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ) বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ মক্কার পৌত্তলিকদের পরাজিত করে।

রুহুল-মা'আনী কিতাবে উল্লেখ আছে, যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করেন, তখন সেগুলো নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো দান করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আস্‌কেরে বারা ইবনে আয়েব থেকে এ স্থানে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে ঃ 'এটা হারাম' একে সদকা (দান) করে দাও। ফেকাহ্ বিদগণ বলেন, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন (জুয়া হারাম বলে ইসলামে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল দান করে দেয়ার আদেশ দেন। এটা এমন, যেমন মদ নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) কখনই মদ পান করেননি।

কুরআনে আছে, "(যেদিন রোমকরা পারসিকদিগের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে) সেদিন মুসলমানগণ উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে" (৩০ সূরা রূম ঃ ৫ আয়াত)। তফসীর মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৩৭)

www.pathagar.com

বলে, "বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তাদের জিত হয়।"

"এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহতায়ালা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করেছেন। যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। -(রুহুল মা'আনী)।"

যাইহোক, ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, রোমকগণ পারস্যবাসী দ্বারা ৬১৫-৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাভূত হয়েছিল, তার ফলে পার্সীগণ দামেস্ক ও জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমকগণ পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট মিডিয়া পর্যন্ত জয়লাভ করে। এইভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

এসব লেখার উদ্দেশ্য হলো কুরআন যদি মিথ্যা হতো, আল্লাহর বাণী না হতো, তাহলে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতো না। কুরআন সত্য, আল্লাহর বাণী সত্য, তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত আল্লাহর বাণী সত্য হলো। এতে আল্লাহর অস্তিত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

কুরআনে আছে, "আর তিনি (আল্লাহ্) দান করবেন তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসন্ন; বিশ্বাসীদের সুখবর দাও।" (৬১ সূরা আস্সফ ঃ ১৩ আয়াত)।

"যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" (১১০ সূরা নসর ঃ ১-৩ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে যে "বিজয়" এর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছ তা মূলতঃ মক্কা বিজয় তথা সমগ্র আরব বিজয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ্

www.pathagar.com

জানালেন আগাম বিজয়ের বার্তা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাই হয়েছিল শেষে। আরবের এক এতিম, দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষ, আল্লাহর রহমতে আরবের শক্তিশালী শাসকে পরিণত হলেন। কুরআন যে আল্লাহর বাণী ও আল্লাহ্ যে সম্পূর্ণ পূর্ণ কর্তৃত্বে রয়েছেন এটি তারই প্রমাণ।

একাধিক হাদীস ও নবী (সাঃ) এর সাহাবীর (সহচরের) উক্তিতে আছে যে, কুরআনের সূরা নসরে নবী (সাঃ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করুন ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মুকাতিল (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর সহচরদের এক সমাবেশে সূরাটি পাঠ করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু নবী (সাঃ)-এর অন্যতম সহচর ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূল (সাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার মৃত্যুর সংবাদ লুকিয়ে আছে। রাসূল (সাঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বোখারী হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাতে আরও আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।– (সূত্র ঃ কুরতুবী)।

৯ম হিজরী সনের হজ্জের মাঠে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নিকট থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দুনিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর সামনের বছর তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। কাজেই তাঁর জীবনের শেষ উপদেশবাণী (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যেন সবাই গ্রহণ করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খবর না পেলে দুনিয়ার কোন্ মানুষটা বলতে পারে যে, আর এক বছর পরে তাকে আর পাবে না। আর ইতিহাস থেকে এটা কেউই কি প্রমাণ করতে পারবে যে, অমুক সুস্থ ব্যক্তি কোন বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, এইটাই তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ এবং সামনের বছর এই মাস পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন না? আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণের কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কি? (সূত্র ঃ যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব, খন্দকার আবুল খায়ের, জামেয়া প্রকাশনী, ৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭)।

কুরআনের ৪৮তম সূরা আল-ফাতাহ-এ রয়েছে আল্লাহর প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী। একসময়ের ক্ষুদ্র দরিদ্র মুসলমানগণ যে ভবিষ্যতে বহু বিজয় ও ধনসম্পদের মালিক হবে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে এ সূরাতে। কুরআনে আছে ঃ

www.pathagar.com

"গৃহে অবস্থানকারী মুরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়।" (৪৮ সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ ১৬ আয়াত)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর এ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে। ইমাম কুরতুবীর মতে, এ আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ, কেসরা ও কায়সরের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর আমলে জেহাদ হয়েছে।

কুরআনে আছে, "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে (হুদায়বিয়া প্রান্তরে) আপনার (হযরত মুহাম্মদ সাঃ-এর) কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ– যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন– যাতে এটা মুসলমানদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করে। আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১৮–২১)।

উপরের "আসন্ন বিজয়" অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর এ বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এ আয়াতসমূহে খায়বর-এর যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেও বোঝানো হয়েছে, যদ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যা এখনও তাদের *ক্ষমতাসীন নয়।* এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ (ব্যাখ্যাকারক) মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপকহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। "মুসলিমদের জন্য ভবিষ্যতে আরও বহু বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।" (আল কুরআনুল করীম, পৃষ্ঠা *৮৪৪, ফুটনোট ২৭৩)।* ইতিহাস সাক্ষী যে, মদীনায় যেখানে কোন রাষ্ট্র বা সরকার ছিল না, তা নবী (সাঃ) শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠা করে, সে রাষ্ট্র সমগ্র আরব জয় করে আর পরবর্তীতে মুসলমানগণ চীনের সীমা থেকে ফ্রান্সের সমতলভূমি

www.pathagar.com

পর্যন্ত বিজয়কে প্রসারিত করে। এটি আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা বৈ আর কি?

কুরআনে আছে, "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে (হযরতকে) সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই (মক্কার) মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। তিনিই তাঁর রাসূলকে (হযরতকে) হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহই যথেষ্ট।" (৪৮ সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ আয়াত ২৭-২৮)।

মদীনা থেকে দেড় হাজার সাথীসহ মক্কার সন্নিকটে হুদায়বিয়া পর্যন্ত এসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মক্কায় ওমরা (সংক্ষিপ্ত তীর্থযাত্রা) না করে মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে মদীনায় ফিরে যেতে হয়। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরবর্তী বছর সাথীগণসহ কাযা ওমরা করলেন মক্কায় প্রবেশ করে।

'আসন্ন বিজয়'কে কোন কোন ব্যাখ্যাকার হুদায়বিয়ার সন্ধিকে, আর কেউ কেউ খায়বর বিজয়কে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, "এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল।"

কুরআন বলে, "যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ) তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে (মা'আদে) ফিরিয়ে আনবেন।" (২৮ সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৮৫)।

সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মা'আদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষতঃ মসজিদুল হারাম ও কাবা ঘরকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে নেবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের সময় রাত্রি বেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন

www.pathagar.com

করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাগেবের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ কাবাঘর ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই ফেরেশ্তা জিব্রাইল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছে দেয়া হবে। এটা মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ।

কুরআন বলে, "যারা কুফরী করেছে (অর্থাৎ মক্কার মূর্তিপূজকগণ) তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় (ক্বারি'আতুন) ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাঁদের আশপাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৩১)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন 'ক্বারি'আতুন" শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। পৌত্তলিকগণ দুনিয়াতেও আল্লাহর কাছ থেকে আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন– মক্কার পৌত্তলিকদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদরযুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারও উপর বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বালা-মসীবতে আক্রান্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর সে ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমনকি পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং পৌত্তলিকগণ পরাজিত ও পর্যুদস্তু হয়ে যাবে। এর পূর্বেও পৌত্তলিকগণ কিছু কিছু সাজা ভোগ করবে। কুরআন ও আল্লাহ সত্য, এই ওয়াদা পূরণে তা প্রমাণিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে জয়ী হবে– সে ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে সূরা রূমে। কুরআন বলে, "রোমকগণ পরাজিত হয়েছে (আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু ওরা ওদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেই দিন বিশ্বাসীগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে।" (৩০ সূরা রূম ঃ ২-৫ আয়াত)। রোমকগণ ৬২৩-৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণীর সেই বিজয় লাভ করার বছর মুসলমানগণও

www.pathagar.com

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে (দ্বিতীয় হিজরী সনে) বদরের যুদ্ধে মক্কায় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জয়ী হল। আর সেই দিন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ে "হর্ষোৎফুল্ল" হয়েছিল। এটিও বদর যুদ্ধ বিজয়ে আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

কুরআন বলে, "ওরা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?' এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,"। (৫৪ সূরা কামার ঃ আয়াত ৪৪-৪৫)। এই আয়াতে বদর যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদের উপরে মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

কুরআন বলে, "আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব" (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৫০-১৫১)।

ওহুদ যুদ্ধের পরে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের পরে আল্লাহ মুসলমানদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি মক্কার মূর্তিপূজকদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন। এর ফলে মুসলমানদের সাময়িক পরাভূত করা সত্ত্বেও মূর্তিপূজকগণ ওহুদ থেকে নিকটস্থ মদীনা শহরে প্রবেশ না করে মক্কায় ফিরে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে মূর্তিপূজকদের অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এতে পালিত হলো।

কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ্) ওদেরকে (হযরত মুহাম্মদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে) যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি তোমাকে (হযরত মুহাম্মদকে) দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করে দেই, ওদের প্রত্যাবর্তন যে আমারই নিকট; এবং ওরা যা করে আল্লাহ তার সাক্ষী।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৬)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদিগকে তাঁর ভীতি প্রদর্শনের কিছু দেখিয়েই দেন। এর ফলে বিরুদ্ধবাদীগণ পরাজিত হতে হতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এটিও আল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্যে পরিণত হয়।

কুরআন বলে, "কোন রাসূলের (আল্লাহর দূতের) এমন সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। আমি তাদের সাথে (শাস্তির) যে ওয়াদা করেছি, তার কোন

www.pathagar.com

একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি– আপনার দায়িত্ব তো (আল্লাহর বাণী) পৌছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের (পৌত্তলিকদের) দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশকে রদ করার কেউ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৮–৪১)।

উপরের আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে আল্লাহতায়ালা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লজ্জিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার মৃত্যুর পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্যে তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন– আমি কাফেরদের ভূখণ্ড চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি; অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের দখলে চলে আসছে। ফলে পৌত্তলিকদের জায়গা কমে যাচ্ছে। এভাবে এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ নেবে। নির্দেশ তো স্রষ্টার হাতেই। তাঁর নির্দেশ রদ করার কেউ নেই। তিনি হিসাব গ্রহণে দ্রুত ব্যবস্থা নেন। যাই হোক, উপরের আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের ও পরবর্তী সময়ের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে– বিশ্ব যা প্রত্যক্ষ করেছে।

কুরআন বলে, "যৎসামাণ্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা (বিরুদ্ধবাদী) তোমাদের (মুসলমানদের) ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।" (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১১১)।

আল্লাহর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য মুসলমানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে কোন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদীরা জয়লাভ করতে পারেনি। ইহুদী গোত্রগুলো মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে পরিণামে তারা মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কৃক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিজিয়া কর ধার্য করা হয়েছে।

কুরআন বলে, "(হে মুহাম্মদ) উহাদিগকে উপেক্ষা করে চল সেদিন পর্যন্ত, যেদিন ওরা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে, সেদিন ওদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে

www.pathagar.com

না এবং ওদেরকে সাহায্যও করা হবে না। ইহা ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে জালিমদের জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছ।" (৫২ সূরা তূর ঃ আয়াত ৪৫-৪৮)।

শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, 'আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন' অর্থাৎ আমার নিরাপত্তায় আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বেঁচে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না।' ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার বহু প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তাঁর দ্বারা ইসলামের 'মিশন' পূর্ণ করেন।

কুরআন বলে, "তোমরা (মুসলমানগণ) হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।" (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৩৯)।

এ আয়াতে আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথী মুসলমানগণই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিরুদ্ধবাদীদের সব প্রচেষ্টা ভেস্তে যায় এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় শেষ পর্যন্ত আরবের বুকে প্রাথমিকভাবে।

কুরআন বলে, "নূন-শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা (ফেরেশতা. ভিন্নমতে মানুষ) লিপিবদ্ধ করে, আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আপনি আবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। সত্বরই আপনি (হে মুহাম্মদ) দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে, কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত।" (৬৮ সূরা ক্বলম ঃ আয়াত ১-৬)।

উপরের আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য প্রমাণিত হয়ে থাকবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাগল ছিলেন না, যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। ফলে অচিরেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশন জয়যুক্ত হলো ও তিনি স্বীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এভাবে আল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো।

বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই হযরত আর বলেছিলেন-শীঘ্রই এই সংঘবদ্ধদল পরাভূত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে-৫৪ সূরা 'কামার' ঃ ৪৫

www.pathagar.com

আয়াত। ইতিহাস পাঠে দেখা যায়– মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।

আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, 'তোমাদের ভিতর যারা বিশ্বাসী এবং সৎকার্যকারী তাদিগকেই তিনি দুনিয়াতে রাজত্ব প্রদান করবেন'– ২৪ সূরা 'নূর' ঃ ৪৫ আয়াত। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে মুসলমানগণ দুনিয়ার অধিপতি হয়ে প্রায় সহস্র বৎসরের অধিক রাজত্ব করেছিল। এখন মুসলমানদের রাজত্ব নাই, কেননা তারা অনেকেই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং সৎকার্যকারী নহে।

কুরআন বলে, "তাই তুমি (হযরত মুহাম্মদ) আল্লাহর পথে অভিযান কর, দায়িত্বশীল নহ তুমি নিজের ছাড়া অন্যের (অন্যের দায় দায়িত্ব তোমাতে বর্তাবে না)।

আর মুসলমানদের উৎসাহিত কর, সত্বর আল্লাহ্ খর্ব করে দেবেন অবিশ্বাসীদের শক্তি; আল্লাহ্ শক্তিতে অতীব দৃঢ় এবং অতি কঠোর শাস্তিদাতা।" (৪ সূরা নিসা ঃ ৮৪ আয়াত)।

আমরা জানি, কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তথা ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দলিল ও রেকর্ড। হীনবল ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম দিকে। আল্লাহ্ তাকে অভিযানে বের হতে উৎসাহিত করেছেন এবং গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে, সত্বর আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্তি খার্ব করে দেবেন। পৃথিবী দেখেছে যে, মূল আরব ভূমি থেকে নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অবিশ্বাসীরা উৎপাটিত হয়েছিল। কুরআন খোদায়ী গ্রন্থ না হলে, কিভাবে এ গ্যারান্টি এতে সন্নিবেশিত হোল?

কুরআন বলে, "হে রাসূল (হযরত মুহাম্মদ)! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর– তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।" (৫সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৭)।

এ আয়াতে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, প্রচারকার্যে বিরুদ্ধবাদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁর দেখাশোনা করবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীসে আছে– এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে পাহাড়া দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহতায়ালা স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন; প্রচার কার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। (তাফসীরে-কবীর)।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। (তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৫)।

কুরআন বলে, "আল্লাহর মাধ্যম (বা প্রতিশ্রুতি) কিম্বা মানুষের মাধ্যম (বা প্রতিশ্রুতি) ব্যতীত ওরা (ইহুদীগণ) যেখানেই অবস্থান করেছে, সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর ক্রোধ। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্য যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা অবাধ্যতা করেছিল এবং সীমা লংঘন করত।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ১১২ আয়াত)।

উপরের আয়াতে ইহুদীদের গলগ্রহতার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বৃদ্ধ, নারী, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি, মঠে বসবাসকারী সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদির উপর হাত তোলা নিষেধ, ইহাই আল্লার প্রতিশ্রুতি। আর সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান, ইহা মানুষের প্রতিশ্রুতি।

কুরআন বলে, 'আর তাদের (ইহুদীদের) উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগণকে (প্রফেটগণকে) অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমা লংঘনকারী।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৬১)।

কুরআন আরো বলে, "এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ইহুদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৬৭)।

• উল্লেখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা

www.pathagar.com

এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও ক্রোধের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথীগণ ও সাথীগণের শিষ্য তাবেয়ীনদের বর্ণনানুসারে ইহুদীদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ কুরআনের প্রখ্যাত ভাষাকার ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ "তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসে– সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।"

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায়, এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ ঃ ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে। তৃতীয় সূরা আলে-ইমরানে ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি। "আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম (বা ওয়াদা) ব্যতীত তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।" (১১২ আয়াত)।

আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহপাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়াছেন। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানব প্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে।

আয়াতে "মানব প্রদত্ত মাধ্যম" বলা হয়েছে "মুসলমান প্রদত্ত মাধ্যম" বলা হয় নাই। তাই এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। (তফসীর মা আরেফুল, কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩)।

মোদ্দা কথা, ইহুদীরা উপরোক্ত দু' অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। (ক) আল্লাহ প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিম্বা (খ) শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদের এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সঙ্গেও সম্পন্ন হতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

দেওয়া যেতে পারে। কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না, অথচ বাস্তবে প্যালেস্টাইনে তাদের একটি অস্বাভাবিক জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ কৃত্রিম রাষ্ট্রটি ইহুদীদের নয় বরং যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের একটি সাময়িক ঘাঁটি। এ রাষ্ট্র নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে কয়েকদিনও টিকতে পারবে কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার জন্য মুসলিম এলাকার মধ্যখানে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের একটি বশংবদ, অনুগত, আজ্ঞাবহ, ষড়যন্ত্রকেন্দ্রস্বরূপ। ইসরাঈল পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্য আরব ভূমি থেকে চলে যাবার পূর্বে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে বসিয়ে যায় তাদের গোলামী করার জন্য– পাশ্চাত্যের গোলামী করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য নিজেরা আরব ভূমি ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেই ইহুদীদের সেখানে বসায় তাদের হয়ে "প্রক্সি" দেওয়ার জন্য। এটি একটি কৃত্রিম "সারোগেট"' "টেস্টটিউব বেবি"র ন্যায়। এ সন্তানের আসল পিতা পাশ্চাত্য।

অন্যদিকে কুরআন তো স্পষ্ট বলেছে যে, কিয়ামতের পূর্বে তিনি ইহুদীদের একত্রিত করবেন।

কুরআন বলে, "এরপর (ফিরআউন ও তার বাহিনী সমুদ্রে ডুবে মরার পর) আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৪ আয়াত)।

এ আয়াতে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন যে, ইহুদীদের আল্লাহ ভবিষ্যতে একত্রিত করবেন। প্যলেস্টাইনে ইহুদীদের পুনরায় একত্রিত হওয়া আল্লাহরই ইচ্ছা– কেয়ামতের নিদর্শন হিসাবে। আল্লাহ্ ইহুদীদের একত্রিত করে কি করবেন তার বর্ণনা হাদীসসমূহে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদান করেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একত্রিত হওয়াতে তাদের জন্য সমূহ বিপদই রয়েছে বলে মনে হয়। আসলে খৃষ্টানগণ ইহুদীদের কোন সময় ভালবাসে নাই। খৃষ্টান সম্প্রদায় ইহুদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজস্ব মতলব হাসিল করতে চায়। হিটলার ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রত্যক্ষ সচেষ্ট ছিল। বর্তমান পাশ্চাত্য ইহুদীদের পাশ্চাত্যের নিজেদের যুদ্ধের জন্য তাদেরকে কামানের খোড়াক বানিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছে। যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়– তাহলে ইহুদীদের ছড়িয়ে থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা আছে বলে মনে হয়; আরব মুলুকে একত্রিত হওয়া কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ।

কুরআন বলে, "আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো– কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাঁদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।" (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৫ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তা হলো "আর যারা তোমার (হযরত ঈসার) অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। অর্থাৎ তোমাকে অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে তোমার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসার (আঃ) নবুওতে (প্রফেটহুডে) বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী। জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খৃষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খৃষ্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ায় যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৭৯)।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনী ছাড়া কিছু নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়,তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। এ কারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদী রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র

www.pathagar.com

ধরে নেয়া হয়, তবুও খৃষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি অপাংক্তেয় রাষ্ট্র তা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্যে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং হাদীস শরীফেই দেয়া হয়েছে। যদি মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হাদীসের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না। (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৭৯)।

কুরআনে আছে, "সমুদ্রে বিচরণশীল সুদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (আল্লাহরই) নিয়ন্ত্রণাধীন।" (৫৫ সূরা আর-রহমান ঃ ২৪ আয়াত।

এ আয়াত দ্বারা ৭ম শতাব্দীতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, পর্বতের সমান জাহাজসমূহ সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে। এটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনেই হবে।

কুরআন বলে, "নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) তোমাকে (কুরআন) পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়। আমি তোমার জন্য সুগম করে দিব পথ।" (৮৭ সূরা আ'লা ঃ ৬-৮ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রথমদিকে যখন ফিরিশতা জিব্রাইল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরআনের কোন আয়াত শোনাতেন তখন তিনি (হযরত) আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিব্রাইল (আঃ)-এর সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ কুরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিব্রাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কুরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র কুরআন শরীফ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখস্থ ছিল, যদিও তিনি নিরক্ষর এবং মুখস্থের জন্য কোন কসরত করেন নাই। তাঁর মুখস্থ হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক-'অটোমেটিক'। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে আবার সঠিক হলো। এ সম্পর্কে কুরআনে আরো রয়েছে "তাড়াতাড়ি ওহী (কুরআন) আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর (ওহীর) সহিত সঞ্চালন করো না। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (আল্লাহ্রই)। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর, অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।" (৭৫ সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯ আয়াত)।

www.pathagar.com

যখন ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল (আঃ) কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিব্রাইল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা কুরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। এরপর বলেছেন, আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল (আঃ) কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কুরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিব্রাইলের পাঠ শ্রবণ করা। অবশেষে বলা হয়েছে, আপনি এ চিন্তা করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

কুরআন বলে, "আমিই (আল্লাহই) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ ৯ আয়াত)।

চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত কুরআনের সমস্ত টেক্স এক্‌ই রকম পাওয়া যাচ্ছে। অন্য পুরাতন গ্রন্থসমূহের নানা টেক্সট্ ও "ভারসন" হয়েছে। তাই কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী এটি প্রমাণিত হয়। বাইবেলের বহু "ভারসন" রয়েছে। ইহুদীদের বাইবেল ও খৃষ্টানদের বাইবেল এক নয়। ইহুদীরা খৃষ্টানদের বাইবেল পাঠ করে না।

কুরআনে আছে ঃ

"(আল্লাহ বলেন, ফেরাউন!) আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে খেয়াল করে না।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ ৯২ আয়াত)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে হযরত মূসার সঙ্গে কলহরত মিশরীয় রাজার পানিতে ডুবে মৃত্যুর কথা রয়েছে। আল্লাহ্ বলছেন যে, তিনি ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ করবেন, তবে অনেক মানুষই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বেখয়াল। প্রায় তিন হাজার বৎসর পর্যন্ত ফিরাউনের লাশ সম্পর্কে মানুষ বেখেয়াল থেকে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে মিশরে। কুরআনের এ আয়াতে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক বাস্তবায়ন হয়েছে। কুর'আন আল্লাহ'র অস্তিত্বের এক বড় প্রমাণ।

নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

গিরিগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাত্রা করলেন আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মরু পথে। চাচা ওরাকা ইবনে নওফেল আজ বেঁচে থাকলে সঙ্গী হতেন হিজরতে। প্রথম ওহী প্রাপ্তির পর তিনিই প্রথম তসদিক করেছিলেন এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন–'হায়! তোমার দেশবাসী যেদিন তোমাকে দেশছাড়া করবে, সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকতাম।' পূর্ণ হলো মহর্ষি ওরাকার সেই ভবিষ্যদ্বাণী। পূর্ণ হলো বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীও –"সেই নবীকে তাঁর স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।" বিতাড়িত 'সেই নবী" চলেছেন মরুভূমির দিগন্তহারা পথে। সঙ্গে প্রিয় সাথী আবূ বকর। কণ্ঠে পাক কালামের অমিয়বাণী। হৃদয়ে আল্লাহ্ প্রেমের তারঙ্গমালা। প্রাণে মাখলুকাতের অতল মমতা!। চক্ষে তৌহিদের শপথ। ললাটে ঐশী তজল্লীর বিচ্ছুরণ। নবী চলেছেন। যে মানুষের মুক্তির দূত তিনি, তারা ছুটছেন পেছনে অনুসন্ধানে তাঁরই, হত্যার মানসে। ছুটছে শত শত রক্তপিয়াসী কোরেশ ও বেদুঈন। ছুটছে সোরাকাও। ছুটছে সে দুরন্ত আসপে তাজীর পিঠে। অশ্বের নিঃশ্বাসে আগুন ঝরছে মরুভূপথে। সোরাকার চোখে চক্ চক্ করছে সহস্র সোনালী উট, আর সহস্র স্বর্ণ-দিরহাম। প্রয়োজন শুধু একটা শির। মাত্র একটা। ছুটছে সে লালসার টানে দূর নির্জন আকাবার পথে। ঐ দেখা যায় আবূবকর; ঐ তো মুহাম্মদ, ঐ মুহাম্মদের শির। কষাঘাত করে সে অশ্বে। জোরে, আরো জোরে। ছুটছে, ছুটছে সোরাকা। উড়ছে মাথার আকাল। সহসা হোঁচট খেল, উল্টে পড়ে গেল আসপে তাজী। উল্টে আছড়ে পড়লো সোরাকাও। আকালের আঁচলে কপাল মুছলো, আবার যাত্রা করল ত্বরিত বেগে। আবার আছড়ে পড়লো। আবার,–আবার। খড়ি হতে গণনা করল সোরাকা। নাহ্ যাত্রা নাস্তি। মুহাম্মদ অবধ্য। কিন্তু লালসা-তাড়িত সোরাকার মন আক্রমণে উদ্যত হয়ে উঠে আবার। কিন্তু আবারও ব্যর্থ হয় সে। অবশেষে পরিবর্তন আসে তার হৃদয়ে। সত্য ও সুন্দরের মৃদু সমীরণে নিভে যায় হিংসার হুতাশন। নিঃসঙ্গ পথিকের নিশান উড়ায় সে। কাছে এসে দেখতে পায়। আল্লাহ্র নবী চলেছেন নির্লিপ্ত অতলচিত্তে, কণ্ঠে তাঁর কুরআনের ললিত বাণী। পিছনে বিশ্বস্ত বন্ধু

www.pathagar.com

আবূবকর। সালাম জানালো সোরাকা। বললো– হন্তা নই আমি আর, মনে পরিবর্তন এসেছে আমার। অভয় দিয়ে বললেন আল্লাহ্‌র নবী–ফিরে যাও সোরাকা। কিন্তু, বলবে না কারও কাছে– 'আমরা এই পথে যাচ্ছি, খামাখা কষ্ট করবে ওরা। আর শোন সোরাকা, তুমি যে স্বর্ণদিনার ও সোনালী উটের লোভ ছেড়েছ, বদলায় তার পারস্য সম্রাটের স্বর্ণের বাজুবন্দগুলি দেওয়া হবে তোমাকে।'

তাজ্জব সোরাকা, ভাবছিল,–একী!বলে কী মুহাম্মদ! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সম্রাট শাহান-শাহ্‌-ই-ইরান, তাঁরই সোনার বলয় দিবে সে আমাকে? এও কি সম্ভব! এই নিঃস্ব মুহাম্মদ, এই অসহায় মুহাম্মদ; যে আজ স্বজন, স্বজাতি কর্তৃক বিতাড়িত, যে আজ অজানা মরুভূর বুকে দিশাহারা পথচারী; যার কোনও আশ্রয় নেই, সহায়-সম্বল নেই, এক বেলার খাবার পর্যন্ত নেই, সেই মুহাম্মদ দিবে আমাকে রাজাধিরাজ খসরুর স্বর্ণবলয়? একি স্বপ্ন, নাকি সত্য! যদি সত্যিই হয় তবে নিশ্চয় মুহাম্মদ খোদার নবী। নইলে বুঝিবা পাগল হয়ে গেছে সে– মানুষের অত্যাচারে অত্যাচারে! ... ...

খলিফা ওমরের শাসনামালে বিজিত হয়েছে বিশাল পারস্য-সাম্রাজ্য। সম্রাটের সকল ধনদৌলত, মুকুট-মণি-মাণিক্য, অস্ত্র-অলংকার সব এসে পৌঁছেছে মদীনায়,–দারুল খিলাফতে। খলিফা বললেন– "সোরাকা, পারস্য-সম্রাটের ঐ স্বর্ণবলয় তুমি তোমার বাজুতে পর। ইতস্ততঃ করছেন সোরাকা,–স্বর্ণালঙ্কার, সে তো মুসলিম পুরুষের জন্য নয়। তার সে মনোভাব বুঝতে পারলেন আল্লাহ্‌র খলিফা। বললেন, পর সোরাকা, আমি তো খলিফাতুর রাসূল বলছি। পরলেন সোরাকা সম্রাটের সেই সোনার বাজুবন্দ। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, খলিফা ওমর,–সোরাকা! সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হলো আজ অক্ষরে, অক্ষরে, যে অঙ্গীকার হিজরতের মরু পথে তোমার সাথে করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)।

ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের পরবর্তী নিঃশ্বাসের নিশ্চয়তা মানুষ কি দিতে পারে? পারে না। অথচ, সোরাকাকে পারস্যরাজের ঐ স্বর্ণের বাজুবন্দ দানের ঐ অঙ্গীকারের মধ্যে এ কথাও নিহিত ছিল যে, যতদিন না ঐ অঙ্গীকার পালিত হবে, ততদিন মরবে না সোরাকা। মানুষের আয়ু সম্পর্কে তো এরূপ ঘোষণা কেবল তিনিই দিতে পারেন– যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক, যিনি মহাকালের মহান অধিপতি। অতএব, সেদিনের সেই অমিত শক্তিধর সম্রাটের পতন এক আপাতদুর্বল, নিঃস্ব ও অক্ষম ব্যক্তির হাতে ঘটাবার মত অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন যিনি, সোরাকার আয়ুরও সংবাদ দিয়েছিলেন তিনিই এবং তিনিই তো

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদের (সাঃ) উপাস্য আল্লাহ্। তিনি কি মনগড়া? কল্পিত?

রাজাধিরাজ খসরু প্রবল পরাক্রমশালী অগ্নিপূজারী খসরু মদীনার ইহুদীদের হীন প্ররোচনায় ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলো রাসূলে পাকের বিরুদ্ধে। ফরমান পাঠালেন তিনি ইয়েমেনের গভর্নরের কাছে ঃ 'কোরেশদের যে লোকটি নবুওতের দাবী করছে– গ্রেফতার করো তাকে, চালান দাও শাহী দরবারে। জনা কয়েক সামরিক অফিসার পাঠালেন গভর্নর বাজান, মদীনায় পৌঁছে তারা তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে রাসূলে খোদার কাছে। কর্ণপাত করলেন না তিনি। বরং আলোচনা শরু করলেন তৌহিদের। অফিসাররা তাঁর সে তবলীগে মন দিতে পারে না। কারণ, তাদের কথা হলো ঃ "খোদাওন্দের (শাহানশাহের) হুকুম অবশ্যই মান্য করতে হবে, নইলে ধ্বংস করে দিবেন তিনি আপনার মদীনা, নিধন করবেন আপনাকে, আপনার অনুসারী সবাইকে; আপনার উচিত আত্মসমর্পণ করা "আল্লাহ্র নবী বললেন, 'আজ নয়, আগামীকাল কথা হবে।' পরদিন তিনি আবারও শুরু করলেন তৌহিদের তাবলীগ। কিন্তু বাজানের অফিসারদের ঐ এক কথা ঃ তাদেরকে তামিল করতে হবে তাদের খোদাওন্দের হুকুম। নইলে কারো নিস্তার নেই, নিস্তার নেই গভর্নর বাজানেরও খোদাওয়ান্দের হাত থেকে।– 'তোমরা খোদওয়ান্দ খোদাওয়ান্দ করছ যাকে, সে তো মরেছে কাল রাতে'–বললেন আল্লাহ্র রাসূল। বললেন, 'আমার যিনি খোদাওয়ান্দ কেবল তিনিই চিরঞ্জীব। তিনি জানিয়েছেন, 'খসরু তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে গতরাতে, আমার বিরুদ্ধে আর কোনও পরওয়ানা নেই, তোমরা যেতে পার।' (দিনটি ছিল সম্ভবতঃ ১০ই জমাদিউস্সানি)। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বাজানের সামরিক অফিসাররা। ইয়েমেনে বাজানের কাছে প্রকাশ করলো সব কথা। 'এ কথা সত্য প্রমাণিত হলে, অবশ্যই সাব্যস্ত হবে যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র নবী; অন্যথায় ভণ্ডামির শাস্তি সে নিশ্চয়ই পাবে– বললেন বাজান, 'অপেক্ষা করো'। দিন কয়েকের মধ্যেই পারস্যরাজের দরবার থেকে এলো নতুন বাদশার এক নতুন শাহী ফরমান– 'অত্যাচারী পিতাকে নিহত করে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আমি। আমিই এখন শাহানশাহ্-ই-ইরান। অতএব, নতুন শপথ নিবে আমার নামে, . . . খাজনা খিরাজ পাঠাবে, . . . এবং কোরেশদের মধ্য থেকে নবুওয়তের দাবীদার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করেছিল আমার পিতা, তা বাতিল ঘোষিত হলো।' বিস্মিত ও অভিভূত গভর্নরও, পরিষদবর্গের অনেকেই সেদিনই স্বতঃস্ফূর্তভবে ঘোষণা করেছিলেন– 'মুহাম্মদের দাবী সত্য, সত্যিই তিনি আল্লাহ্র নবী, আমরাই তার সাক্ষী–আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

www.pathagar.com

মদীনার উপকণ্ঠে বদর প্রান্তর। লড়াই চলছে সেখানে। ঘোরতর অসম লড়াই। সত্যের প্রদীপ নেভাতে মিথ্যার কূপিত বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা। সত্য-উৎখাতের শপথে মিথ্যার সর্বাত্মক লড়াই। বুঝিবা মিথ্যার জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য মিথ্যার এই 'যাচাই দিবসে' তাঁবুর ভিতরে সিজদারত আল্লাহ্‌র রাসূল কাঁদছেন অঝোরে–'প্রভূ হে, এই গুটিকতক মুসলিম যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তোমার এবাদত করার কেউ থাকবে না আর পৃথিবীর বুকে।' শের-এ-খোদা আলী তাঁর মুখের কাছে কান পেতে শুনলেন– 'ইয়া হাইয়ো, ইয়া-কাইউমো বলে বলে আকুল প্রার্থনা করছেন রাসূলে খোদা,–হে প্রভূ চির ীব, চিরস্থায়ী। তুমি জীবন দাও, স্থায়ীত্ব দাও।' আকুল সেই প্রার্থনার পর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন আল্লাহ্‌র নবী 'দুষমণ পরাজিত হবে, অবিলম্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তারা"। –(৫৪ ঃ ৪৬)।

বহু পূর্বেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এই অঙ্গীকারের ঘোষণা, আবারও ঘোষিত হলো। তাই, এই প্রার্থনাও করেছিলেন রাসূলেপাক সেদিন যুদ্ধের ময়দানে,–

'প্রভূ হে, তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো তুমি, তোমার অঙ্গীকার পূরণ করো আজ। ফায়সালা করে দাও সত্য ও মিথ্যার মধ্যে।'

বলা প্রয়োজন যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যুদ্ধক্ষেত্রে অপর প্রান্তে প্রার্থনা করেছিল কোরেশ-নেতা আবূ জেহেলও এই বলে, 'প্রভূ হে, সেই দলকে, যারা স্বজন ও স্বদেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যারা ধর্মে বেদাত ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তাদের তুমি এই প্রান্তরে আজ পর্যুদস্ত করে দাও, ধূলিসাৎ করে দাও' এবং ঠিক এই প্রার্থনাই করেছিল মক্কাবাসীরা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালেও সমবেতভাবে কাবার গিলাফ ধরে। অধিকন্তু, বদর প্রান্তরে আবূ জেহেল এই প্রার্থনাও করেছিল,–

'হে আমাদের প্রভূ, যদি মুহাম্মদের আনীত ধর্মই সত্য হয়, তাহলে আমাদের উপরে তুমি আসমান থেকে পাথর বৃষ্টি করো, কিংবা কোন প্রচণ্ড গযব নাযেল করে আমাদেরকে ধূলিসাৎ করে দাও, ধ্বংস করে দাও।'

সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফায়সালার জন্য আবূ জেহেলের এই দোয়ার চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্‌ সেদিন কবুল করেছিলেন। যুদ্ধারম্ভের সাথে সাথে এই দুর্ধর্ষ রণকুশলী বীর যোদ্ধার মৃত্যু ঘটেছিল দু'টি কিশোর বালকের হাতে এবং–

আল্লাহ্‌র নবীর একমুঠি-ধূলি নিক্ষেপে প্রবল ধূলিঝড় উঠেছিল সেদিন বদর

www.pathagar.com

প্রান্তরে। আশ্চর্য যে, ঐ এক মুঠি ধূলিকণাই আঘাত হেনেছিল সহস্র সৈন্যের চোখে, মুখে, তাদের উট ও অশ্বগুলির নাকে, চোখে। একমুঠি ধূলি মাত্র, অথচ তার প্রচণ্ড তুফানে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল মক্কার সেনাবাহিনীর সব ছাউনী ও ছামান। দারুণ নাস্তানাবুদ হয়ে আবূ জেহেলসহ সত্তর জন কোরেশ বীরের লাশ পশ্চাতে ফেলে পালিয়েছিল মক্কার সেনাদল। সেই ধূলিমুঠি সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহপাক,

"যাহা তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা তুমি কর নাই; বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।" . . .

এই কথা ঘোষণা করে প্রমাণিত করা হয়েছিল যে, মদীনার মাত্র তিনশ' তেরটি মানুষ, যাদের অনেকেই ছিল কচি-কিশোর, অনেকেই যুদ্ধে অনভিজ্ঞ; অস্ত্রহীন; এমনকি কেউ বা দ্বিধাগ্রস্তও –তাদের শক্তিবলে সম্ভব হয়নি সেদিনের বদর প্রান্তরের সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়সালা, বরং তা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহ্র সরাসরি সাহায্যে। বহুপূর্বে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণের জন্য সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল পরাক্রমশালী ঐ খোদায়ী নিদর্শন। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল পরাভূত ও পর্যুদস্ত কেদারের বংশধর কোরেশ বাহিনী। হিজরতের পর এক বৎসর কালের মধ্যে কেদারের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হয়ে গেল– (যিশাইয়–২৩ ঃ ১৬)। প্রমাণিত হলো মুহম্মদের ধর্মই সত্য। মুহম্মদের খোদাই সত্য খোদা। যাঁর মহাশক্তির ঐশী বিকাশ তুফান তুলেছিল মুহম্মদের ধূলি-নিক্ষেপে। (শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, "আল্লাহ কি লৌকিক?" পৃঃ ৬০–৬৫)।

বিদায় হজ্জের দিনে–আরাফাতের প্রান্তরে সমবেত শত-সহস্র আরববাসীদের মাঝে উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে সারা ময়দানে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্র নবী বলেছিলেন–

'হে মনুষ্যসন্তানেরা শোন, আমার উপরে আমার প্রভূর এই হুকুম ছিল যে, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধের কথা জানিয়ে দেই। আমার সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি বলে কি তোমরা আজ সাক্ষ্য দিতে পার?

উত্তরে সমগ্র জনতা সমবেতস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলেছিল,–

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আপনার দায়িত্ব আপনি সম্পূর্ণ পালন করেছেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র সকল হুকুমই আপনি পৌঁছিয়েছেন আমাদের কাছে। আমরাই তার সাক্ষী।'

আল্লাহ্র রাসূল তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেছিলেন–

www.pathagar.com

'হে আমার প্রভূ, তুমি এই সকল কথার সাক্ষী থাকো!

হে আমার প্রভূ তুমি সাক্ষী থেকো এদের সকল কথার। প্রভূ আমার,–এদের সকল কথার তুমিই সাক্ষী।'

অতঃপর সেদিনের আরাফাতের সেই ভক্তিপ্লুত, অনুগত জনতার সমুদ্রকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌র নবী বলেছিলেন,–

'আজ আমি তোমাদের জন্য আমার ধর্মপ্রচারের কাজ সম্পূর্ণ সমাধা করলাম, আগামী বছরে আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে।'

বলা বাহুল্য যে, সাক্ষাৎ আর হয়নি। আপনার পরম প্রিয়ের কাছে তিনি চলে গেছেন সেই বছরই।

একদিন ছিল যেদিন–

বাইবেলে কথিত 'বিতাড়িত সেই নবী' হিজরতের পথে পিছন ফিরে মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

'হে আমার স্বদেশভূমি, জন্মভূমি, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তোমার অন্যসব সন্তানেরা আমাকে তোমার কোলে থাকতে দিল না।' . . .

আর একদিন,– সাত বছর পরে–

আপনার প্রিয় জন্মভূমিতে প্রবেশ করছেন রসূলে খোদা, সেদিনের সেই বিতাড়িত মুহাম্মদ; আজ বিজয়ী তিনি, অপ্রতিরোধ্য প্রবল ও পরাক্রান্ত। সঙ্গে তাঁর বাইবেলে উল্লেখিত দশহাজার–ঠিক 'দশ হাজার' পবিত্র আত্মার সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। নারা-এ-তাকবীরে আলোড়িত *ফারানের* আসমান মুজাহিদ সেনাপদভারে কম্পিত মরু প্রান্তর। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত নিনাদ–'আল্লাহু আহাদ'।

একদিন ছিল, যেদিন–

সারা আরবের সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধভাবে নবীর শহর আক্রমণের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলো; উদ্দেশ্য–নবীন ইসলামের শেষ-চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলা। এই ভীষণ সর্বগ্রাসী সংকট মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো– মদীনার উন্মুক্ত তিনদিক পরিখা খননের। শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে শুরু করলেন খাল খনন। মদীনার চিরমুনাফেক ইহুদীরাও যোগ দিল দুষমনদের সঙ্গে। দারুণ শীত, তদুপরি খাদ্য সঙ্কটও। এই দুর্যোগময় অবস্থায় খাল খুঁড়েছেন সবাই,

www.pathagar.com

স্বয়ং রসূলে খোদাও। ধূলি-ধুসরিত ঘর্মাক্ত কলেবরে তাঁর দু'হাতে কোদাল চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে, কণ্ঠে আল্লাহ্‌র প্রশংসাগীতি। দলে দলে সাহাবীরা কোদাল চালাচ্ছেন অহোরাত্র; নির্বিরাম। মাথায় মাটির ঝুড়ি, হৃদয়ে প্রভূর প্রেম, কণ্ঠে জেহাদের তকবীর, চক্ষে রাসূলের আনুগত্য। কর্মতৎপরতায় উত্তাল মদীনা। তৌহিদী-আনন্দে অবিরাম সংগ্রাম চলছে, ঘোরতর শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার অপরিহার্য সংগ্রাম। চলছে পরিখা খনন। পাথর বেরুলো একটা, প্রকাণ্ড পাথর, কিছুতেই সরানো গেল না। খবর গেল রাসূলে পাকের কাছে। পরিশ্রান্ত তিনি, তবু এলেন। কোদাল ধরলেন কঠিন হাতে। প্রচণ্ড আঘাত হানলেন পাথরে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো চারদিকে; 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনিত উচ্চারিত হলো নবীর বুলন্দকণ্ঠে। পুনঃ আঘাত হানলেন তিনি, পুনঃ আগুনের ফুলকি ঝলসিত হলো। উঠলো নবীকণ্ঠে পুনঃ বজ্র আওয়াজ 'আল্লাহু আকবর'। আবারও প্রচণ্ড আঘাত, আবারও অগ্নিকণা ঝরে পড়লো চতুর্দিকে, আবারও উঠলো নবী কণ্ঠের গগনবিদারী তক্‌বীর ধ্বনি 'আল্লাহু আকবর'। পাথর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। . . .

পরে, সাহাবীরা ঐ তকবীর ধ্বনির তাৎপর্য জানতে চাইলে রসূলে পাক বলেছিলেন–

'প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঝলকে দেখলাম, 'শাম দেশের চাবির গুচ্ছ দেওয়া হলো আমার হাতে এবং আল্লাহর কসম ঐ মুহূর্তে আমার দৃষ্টিতে শাম দেশের লাল মহলগুলি ভাসছিল।'

'দ্বিতীয় ঝলকে, আমার হাতে দেওয়া হলো পারস্যের চাবির গুচ্ছ; এবং আল্লাহর কসম ঐ মুহূর্তে পারস্যের শুভ্রমহলসমূহ তুলে ধরা হলো আমার চোখের সামনে।'

'তৃতীয় ঝলকে, ইয়ামেনের চাবির গুচ্ছ দেওয়া হলো আমার হাতে; এবং আল্লাহ্‌র কসম, তখন আমি দেখলাম, সানার সিংহদুয়ার খুলে দেওয়া ছিল আমার জন্যে।'–

আশ্চর্য! পরাক্রান্ত শত্রুগোষ্ঠীর সমবেত আক্রমণের আশংকায় শংকিত নিরস্ত্র ও নিঃসম্পদ যে মানুষ খাল খুঁড়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছেন, কর্মক্লান্ত, ধূলি মলিন অবস্থায় ক্ষুৎপিপাসায় পেটে পাথর বেঁধে কোদাল চালাচ্ছেন, সেই কিনা বলছে–শাম (সিরিয়া, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, লেবানন), পারস্য ও ইয়েমেনের শক্তিশালী ও সুবিশাল রাষ্ট্রসমূহের শাসনদণ্ড অর্পিত হবে তারই হস্তে।

www.pathagar.com

আরও আশ্চর্য যে, সে সম্মিলিত আরব শক্তি প্রতিহত করার জন্য অনন্যোপায় হয়ে খাল কাটছেন তিনি আত্মরক্ষার তাকিদে, সেই লা-রওয়া বিশাল আরববাহিনীর জয় পরাজয়ের কোনও কথাই বলছেন না তিনি। কিন্তু, ঐ সকল ঘটনা অসম্ভব বিবেচিত হলেও মানুষের ইতিহাস সাক্ষী–

ঐ প্রবল হিংস্র আরব-আক্রমণ পর্যুদস্ত, পরাভূত হয়ে গেছে,

ঐ ইহুদী ষড়যন্ত্রের শয়তানীসমূহ;

ঐ শামের শাসনদণ্ড অর্পিত হয়েছে মুহাম্মদের করতলে;

ঐ বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর পদানত হয়েছে;

ঐ ইয়ামেন, ঐ সানাতে চির উড্ডীবন হয়েছে তাঁর বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য পতাকা। (শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, পৃঃ ৬৬-৬৭, ৭৪-৭৬)

নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং পারস্য ও রোম সাম্রাট

সেকালে রোমের কয়সর এবং পারস্যের কেছরা এই দুইজনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। কেছরার রাজত্ব অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এমন কি আরব দেশেরও অধিকাংশ অঞ্চল কেছরার অধীন ছিল। য়্যামন প্রভৃতি বড় বড় প্রদেশে কেছরার গভর্নর অবস্থান করত।

ইবনে হোযায়ফা রাসূলুল্লাহ্র (দঃ) পত্র নিয়ে কেছরার নিকট গিয়েছিলেন। পত্রের এবারত ও মন্তব্য কয়সরের নামে লিখিত পত্রের অনুরূপই ছিল। আরব দেশের প্রথানুযায়ী প্রেরকের নাম উপরে এবং প্রাপকের নাম নিম্নে লিখিত হয়েছিল। কেছরা পত্রপাঠে অগ্নিশর্মা হয় এবং পত্রটি খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দিল। হযরত রাসূলে মকবুল (দঃ) এই সংবাদ শুনে বললেন, "পত্রের মত কেছরার রাজ্যও খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে।"

এদিকে দুর্দান্ত পরাস্যরাজ য়্যামনের গভর্নর বাজানের নিকট লিখল যে, আরবে যে লোকটি পয়গম্বরী দাবী করছে; তাকে অতিসত্বর আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। আদেশ মতে বাজান দুইজন ভীমকায় ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। তাদের সঙ্গে একটি পত্রও লিখে দিল। পত্র বাহকদ্বয়ের নাম নাবুহ ও খরছরা ছিল। বাজান নাবুহের নিকট বলে দিয়েছিল যে, মদীনায় গিয়া সে যেন পয়গম্বর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে ত্রুটি না করে। মক্কায় ক্বোরাইশগণেরও এই সংবাদে তাদের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকল না।

www.pathagar.com

. কেছরার মত প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট মুসলমানগণকে নিপাত করতে উদ্যত হয়েছে, এখন আর তাদিগকে কে রক্ষা করতে পারে? এবার কোরাইশগণের চির শত্রু সমূলে বিনষ্ট হতে চলেছে; সুতরাং তাদের আনন্দ হবারই কথা।

. বাজানের প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় মদীনায় পৌছে হযরতের (দঃ) নিকট পত্র স্থাপন করত মৌখিকও বলল যে, "মহামান্য সম্রাটের আদেশক্রমে আমরা আপনাকে পারস্যে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে চলুন, তবে আমাদের সুবাদার (বাজান) সম্রাটের নিকট সুপারিশ করত আপনাকে মুক্ত করে দিবেন। আর যদি আপনি স্বেচ্ছায় যেতে সম্মত না হন, তবে আমরা বল প্রয়োগে সম্রাটের আদেশ পালন করতে বাধ্য হব। এরূপাবস্থায় সম্রাট আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ফেলবে। হযরত (দঃ) বললেন, 'তোমরা আজ অপেক্ষা কর, আগামীকল্য একথার উত্তর দিব।' পরদিন তারা উপস্থিত হলে হযরত (দঃ) বললেন যে, "কেছারাকে তার পুত্র শিরোয়য়া অদ্যরাত্রে বধ করত স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেছে। অতি শীঘ্রই আমার ধর্ম ও রাজত্ব "কেছরার রাজধানী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।"

বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়া এই অত্যাশ্চর্য কথার উপর বিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু পবিত্র মুখের বাণীতে এমনই অনির্বচনীয় প্রভাব ছিল যে, শ্রোতৃদ্বয় বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস না করে পারল না। তারা য়্যামনে ফিরে গিয়ে হযরতের বাণী সুবাদার বাজানের নিকট যথাযথ ব্যক্ত করল। বাজান শুনে বললো–

"আল্লাহর শপথ, তাঁর কথাবার্তা রাজা-বাদশাহর কথাবার্তার মত নহে। আমি তাকে পয়গম্বর বলেই মনে করি। (তারিখুল কামেল, ২য় খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা)

বাজান আরও বললেন ঃ "আমি কিছুদিন অপেক্ষা করব। তার কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার ঈমান আনতে আর কোনই আপত্তি থাকবে না।"

কিছুদিন যেতে যেতেই রাজধানী হতে সংবাদ আসল– সত্যসত্যই সে রাত্রে শিরোয়য়াহ তার পিতা কেছরা পারভেজকে নিহত করত স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছে। নতুন সম্রাট বাজানকে স্বপদে বহাল রেখে এক আদেশ পত্র পাঠিয়েছে। পত্রে ইহাও লিখে দিয়েছেন যে, আরবে যে লোকটি নিজেকে নবী বলে প্রকাশ করছে তার প্রতি যেন অত্যাচার করা না হয়। য়্যামনপতি বাজান এই সংবাদ প্রাপ্তে গণ্যমান্য রাজপুরুষগণসহ শুদ্ধ হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনার উপর অধিক টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। শুধী পাঠকগণ সহজেই

www.pathagar.com

বুঝতে পারবেন যে, বাজানের ইসলাম গ্রহণ এই দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি য়্যামনের মত সমৃদ্ধশালী প্রদেশে গভর্নর ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ এক হিসাবে পারস্য সাম্রাজ্যে ইসলামের ভিত্তি স্থাপনরূপে গণ্য করা যেতে পারে। পারস্য সম্রাট হযরতের (দঃ) পত্রে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হলেও বাযান ও তৎসঙ্গে রাজপুরুষদের ইসলাম গ্রহণ করায় হযরতের (দঃ) এই পত্র সাফল্যমণ্ডিত নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে। কিন্তু এ স্থলে একথা প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য নহে। আমরা কেবল একথার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কি রকম সরল পদ্ধতির ভিতর দিয়ে ইসলামের প্রাথমিক প্রচার লাভ হয়েছিল। বাজানের মত প্রতাপশালী গভর্নর মদীনার নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের ভয়ে অথবা কোন প্রকার লালসার বসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা বলতে পারা তো কোন রকমেই শোভনীয় হতে পারে না; অধিকন্তু এরূপ বলা চলে যে, পারস্য রাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা হয়ে তার পক্ষে ইসলামী দীক্ষা লাভ ভয়ানক বিপদসঙ্কুলই ছিল।

ইসলামি প্রচার ব্যাপারে যত প্রকার বাহ্যিক উপলক্ষের প্রতিই আমরা দৃকপাত করি না কেন; তৎসঙ্গে যে অদৃশ্য জগতের এক শক্তিমান হস্ত পদে পদে এ বিষয়ে সহায় ছিল একথায় সন্দেহ মাত্র নাই। ভেবে দেখুন, পারস্যরাজ যখন কুপিত হয়ে হযরতকে (দঃ) গ্রেপ্তার করার আদেশ জারি করেছিল তখন হযরত (দঃ) তথা মুসলমানগণের আত্মরক্ষার কোন বাহ্যিক উপলক্ষ ছিল না। মক্কার লোকেরাও এই সংবাদে মুসলমানদের নিশ্চিত ধ্বংস ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু নূরনবী (দঃ) যেমন অটল ছিলেন এই ভীতি সঙ্কুল সংবাদের পরও তেমনি অচল, অটল ছিলেন আবার এতে ধীর স্থির ও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিতও বলে দিলেন যে, কেছরা নিহত হয়েছে তার রাজত্ব ধ্বংসের মুখে চলেছে।

কেছরা পারভেজ হযরত রাসূলুল্লাহর (দঃ) পত্র তাচ্ছিলের সহিত ছিঁড়ে ফেলেছিল– এই সংবাদ শ্রবণে হযরত (দঃ) এরূপ বদদোয়া করেছিলেন– "আয় আল্লাহ! তাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড কর।"

হযরতের (দঃ) এই দো'আ কবুল হয়েছিলএবং সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহস্র বৎসরের পুরাতন ও শক্তিশালী রাজত্ব দুনিয়ার বুক হতে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রোমের কয়সর ইসলাম গ্রহণ না করলেও হযরতের (দঃ) পত্রের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিল এবং পত্রটি সযত্নে রেখে দিয়েছিল। ফলে অধিকাংশ স্থান তার হস্তচ্যুত হলেও তাঁর বংশধরদের রাজত্ব

www.pathagar.com

ধরাপৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় নাই। (মাওলানা আব্দুল জলিল মাযহেরী, তলোয়ারে নয় উদারতায়, পৃষ্ঠা ১১১-১১৪)।

গাচ্ছান রাজ হারেসের নিকট হযরতের পত্র

শামদেশের (আধুনিক সিরিয়া) সীমান্তে গাচ্ছানীদের রাজত্ব ছিল। এই সময় হারেস ইবনে আবি *শেমর* সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র পাঠে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, "আমি নিজেই গিয়ে মদীনা আক্রমণ করব এবং মুসলমানগণকে ধ্বংস করব।" হযরত (দঃ) এই খবর শুনে বললেন, "তার রাজত্ব বিনষ্ট হল।"

বসরায় নবী (সাঃ)-এর পত্র ও মোতা যুদ্ধ

হারেস ইবনে ওমর (রাঃ) বসরার হারেসের নিকট পত্রসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। পথিমধ্যে মোতা নামক স্থানে তথাকার শাসনকর্তা শরাহ বিল গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ জানতে পেরে হারেসকে দরবারে হাজির করত একই ঘটনা জিজ্ঞাসা করল। হারেসও সত্য কথা বললেন, শরাহ বিল ক্রোধান্ধ ও বিবেক রহিত হয়ে হারেসকে বধ করল। ইতিপূর্বে হযরতের (দঃ) আর কোন কাসেদ (দূত) নিহত হয় নাই। কাসেদ বা পত্রবাহককে বধ করা রাজ-সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত শোকার্ত হলেন। শরাহ বিল ছিল রোম সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তা। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ প্রকারান্তরে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এদিকে নিরপরাধ পত্রবাহক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বিরত থাকাও নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচায়ক। একথা সত্য যে, ইতিপূর্বেও মুসলমানগণ কয়েকবার জেহাদ-সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিলেন, দুই একবার জয়লাভও করেছিলেন, কিন্তু এরকম শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত বাহ্যিক ক্ষমতা তাঁদের মোটেই ছিল না। আমাদের ভুলে গেল চলবে না যে, জগতের সাধারণ ইতিহাস বাহ্যিক উপকরণ ও উপলক্ষের উপর যতখানি ন্যস্ত থাকে, পয়গম্বরের কার্যাবলী ততখানি নয়।

হযরত নবী করীম (দঃ) তিন হাজার সৈন্যের একটি সংক্ষিপ্ত দল গঠন করত প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শরাহ বিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যায়েদ ইবনে হারেসা দলপতি হলেন। গমনকালে হযরত (দঃ) বলে দিলেন, যায়েদ শহীদ হলে জা'ফর ইবনে-আবি তালেব পতাকা ধারণ করবেন। তিনি শহীদ হলে আবদুল্লাহ ইবনে-রাওয়াহা তার স্বলাভিষিক্ত হবেন। তিনিও শহীদ হলে মুসলমানগণ

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে যাকে উপযুক্ত মনে করে, তারই হস্তে পতাকা অর্পণ করবে।'

এই সময় জনৈক ইহুদী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একথা শুনে বলল, 'ইনি যদি সত্য নবী হন, তবে উল্লিখিত তিনজন দলপতিই নিহত হবেন। কারণ, বনী-ইসরাইলীদের কোন পয়গম্বর যখন এভাবে বলতেন, তখন সকলেই যুদ্ধে নিহত হত।' অতঃপর ইহুদী হযরত হারেসকে বলল, 'আপনার কোন অন্তিম কথা থাকলে বলে যেতে পারেন। কারণ 'আপনি আর মদীনায় ফিরে আসবেন না।'

যাত্রাকালে হযরত নবী করীম (দঃ) স্বয়ং কিছুদূর পর্যন্ত সৈন্যদের সহযাত্রী হলেন এবং তাদিগকে কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন। উপদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা ছিল–

'তোমরা খৃষ্টানদের গীর্জার মধ্যে কিছু লোক দেখতে পাবে, তাদিগকে বধ কোরো না। শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও বদ করো না।'

এই সৈন্যদল শামদেশের সীমান্তে পৌছিতেই জানতে পারল যে, রোম সম্রাট কায়সর মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য রাজধানী হতে এক লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত আরও এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। এত বড় সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে, এরকম ধারণা তাদের মোটেই ছিল না। একদিকে তিন হাজার অপর পক্ষে দুই লক্ষ–সংখ্যার এই অভাবনীয় তফাৎ দেখে অনেকের মনে মানবোচিত ভয়-বিহ্বলতার উদ্রেক হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কেহ কেহ মত প্রকাশ করল, সম্প্রতি অগ্রগতি বন্ধ রেখে মদীনায় খবর দেয়া হউক। হযরত রাসূলুল্লাহর (দঃ) দ্বিতীয় আদেশ আসলে পরে বিবেচনা করে যা হয় করা যাবে। বীর শ্রেষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে-রাওয়াহা বললেন, "ভাইগণ! এখনই আমাদের ঈমানের পরীক্ষার সময়, আমরা কখনও সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করে যুদ্ধ করি নাই। আমরা তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছি। জয়লাভ হয়–ভাল, আর যদি মৃত্যু হয় তাও আমাদের পক্ষে মঙ্গল– পরকালের অনন্ত সুখ আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। সুতরাং ভীত ও শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নাই।'

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ করাই সাব্যস্ত হল। পূর্ব বন্দোবস্ত মত যায়েদ ইবনে-হারেসা সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পতাকা উত্তোলন করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে এবং উভয় পক্ষের বীর দাপটে মোতা প্রান্তর কম্পিত হয়ে উঠল।

শত্রুপক্ষের প্রথম লক্ষ্য হল ইসলামী পতাকা। হযরত যায়েদ প্রাণপণে পতাকা রক্ষা করতে লাগলেন; কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গবৎ অগণিত শত্রু সেনার

www.pathagar.com

আক্রমণে তিনি বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না; দেখতে দেখতে তিনি শত্রু হস্তে শাহাদত প্রাপ্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই হযরত জা'ফর পতাকা উত্তোলন করত অগ্রগামী হলেন। অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কিছুক্ষণ পরে তিনিও যায়েদের অনুগমন করলেন। এক্ষণে আব্দুল্লাহ ইবনে-রাওয়াহার সময় আসল; তিনিও অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় পূর্ণভাবে স্বীয় কর্তব্য সমাধা করত ধরাশায়ী হলেন।

এই সময় উভয় দলে ভয়ানক সংঘর্ষ চলতেছিল। মুসলিম বাহিনী দলপতিবিহীন অবস্থায় পতিত হওয়ায় বিপক্ষের সীমাহীন সৈন্যশ্রেণীর ভিতরে নিজদিগকে হারিয়ে ফেলা অথবা ছত্রভঙ্গাবস্থায় পলায়মান হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এরকম সময়েই সত্য ধর্মের প্রতি আল্লাহতায়ালার অপার করুণা প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং অকূল পাথারে নৌকাডুবি হওয়ার আশঙ্কা হলেই ইসলামের কোন নিদ্রিত ব্যাঘ্র জাগ্রত হয়ে থাকেন। এ স্থলেও তাই হল; একটি নিদ্রিত শের গাত্রোত্থান করত স্বীয় অভূতপূর্ব ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব দ্বারা মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনাকে পঙ্গপালসম বিপক্ষ বাহিনীর কবল হতে রক্ষা করলেন।

বীর কূল-তিলক খালেদ ইবনে-ওলীদ এই সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ছিলেন। ইতিপূর্বে আর কখনও তিনি মুসলিম সৈন্যদলে সেনাপতিত্ব করেন নাই। এক্ষণে সকলের দৃষ্টি তারই প্রতি আকৃষ্ট হল; তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সেনানায়ক নিযুক্ত হলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) একথা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন যে, অদ্যকার যুদ্ধের পট পরিবর্তন করা নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল আত্মরক্ষায় চেষ্টিত থাকলেন। মুসলিম সৈন্য যে রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, তদাবস্থায় তাদিগকে ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করাকেও এক হিসাবে জয়লাভ বলে ধরতে হবে। পরদিন সেনাপতি খালেদ নিজের সুক্ষ্মদর্শিতা দ্বারা ব্যূহ পরিবর্তন করত সৈন্যগণকে নতুনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করলেন। রোম সৈন্যগণ দেখে ভাবল রাত্রে মুসলমানদের নিকট নতুন সৈন্য এসে পৌছেছে। পূর্ববর্তী কয়েক দিনের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজয়ের দ্বারদেশে পৌছালেও রোমসৈন্যগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এক্ষণে আবার নতুন সৈন্যের আমদানী ভেবে তারা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সামান্য আক্রমণের পরই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পথ পেল সেদিকে পালিয়ে গেল।

এদিকে মোতার মাঠে যুদ্ধ চলছিল, সেদিকে হযরত নবী করীম (দঃ) মদীনায় থেকে শত শত মাইল দূরের ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করছিলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বলছিলেন। যায়েদ ইবনে-হারেসা শহীদ হল, জা'ফর পতাকা গ্রহণ করল, . . . সেও শত্রু হস্তে শহীদ হল, . . . আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবনে রাওয়াহার হাতে পতাকা উঠল, ... তারও শাহাদত হল। . . . এক্ষণে আল্লাহর অসিসমূহের মধ্যে এক অসি পতাকা গ্রহণ করল, তাঁর হাতেই মুসলমানদের জয়লাভ হল।' আল্লাহর অসি বা 'সাইফুল্লাহ' দ্বারা খালেদ ইবনে ওলীদকে বুঝান হয়েছিল। এই সময় হতেই তাঁর 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ হয়।

আসুন, আর একবার আমরা মোতা প্রান্তরের সমর দৃশ্য অবলোকন করি। ঐ দেখুন, রোম সৈন্য প্রান্তরময় ছেয়ে রয়েছে। তেজিয়ান অশ্বের দাপটে রণোন্মত্ত যোদ্ধাবৃন্দের হুঙ্কারে দামামার গগণভেদী শব্দে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছে। নবীন তপনের নবীন কিরণ সৈন্যদের লৌহবর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণে পতিত হয়ে সারা মাঠে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আর ঐ এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্য, শত শত মাইল দূরের মুসাফির তারা। নিকটে নাই কোন আশ্রয়স্থান, নাই যুদ্ধোপযোগী সাজ-সরঞ্জাম এবং খাদ্য সম্বল। এরূপাবস্থায় তাদের পরামর্শ সভা বসেছে। কেহ কেহ যুদ্ধ স্থগিত রেখে মদীনায় খবর দিতে পরামর্শ দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে-রাওয়াহা গাত্রোত্থান করত বললেন ঃ "ভাইগণ! আমরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করি– দুনিয়ার জন্য নহে। জয় হয় ভাল; আর যদি মৃত্যু হয় তাও পরকালের জন্য মঙ্গলজনক।" একথা শুনে শ্রোতৃবৃন্দের চমক ভাঙ্গল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু বাঁচবার জন্য নহে, মরবার জন্য। পরিণাম যা হল তা দেখতে পেয়েছেন। প্রথমাবস্থায় মুসলমানদের ক্ষতি হলেও পরিণামে তিন হাজার পরকালকামী ফকিরের জয় হল; আর ইহকালাকাঙ্ক্ষী দুই লক্ষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাল।

সৈন্যদল মদীনা হতে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ 'যায়েদ ইবনে-হারেসা সৈন্যাধ্যক্ষ হবে। তার মৃত্যু হলে জা'ফর এবং তৎপরে আবদুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হবে। তারও মৃত্যু হলে মুসলমানগণ অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দলপতি করবে। কার্যতও তাই ঘটেছিল। উল্লেখিত তিনজনই মোতার যুদ্ধে পরপর শহীদ হয়েছিলেন। উপস্থিত ইহুদী সে সময়েই বুঝতে পেরেছিল যে, নবীর মুখে এরকম বাক্য উচ্চারিত হওয়ার ভিতরে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হবে। বলাবাহুল্য, ইহা নূরনবীর (দঃ) মো'জেযার মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত শত শত মাইল দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রের খবর হযরত (দঃ) মদীনায় বসে উপস্থিত সহচরবৃন্দের নিকট বলছিলেন– যেন স্বচক্ষে দর্শন করে বলছেন। অধুনাসুলভ জড়বাদী মানব সমাজ এই মো'জেযার তাৎপর্য বুঝতে না পারে না পারুক, কিন্তু তা ঐতিহাসিক সত্য। শেষোক্ত ঘটনা সহীহ বোখারী শরীফের মত অভ্রান্ত হাদীস গ্রন্থেও স্থান প্রাপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

যায়েদ ইবনে-হারেসাকে লক্ষ্য করে ইহুদী পণ্ডিত বলেছিলেন ঃ 'ইনি (হযরত দঃ) যদি নবী হন, তবে আপনি আর মদীনায় ফিরে আসবেন না।' হযরতের (দঃ) নবুওয়াতে ইহুদীর কোন সন্দেহ থাকলেও যায়েদের এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং এক হিসাবে মৃত্যু অনিবার্য করেই তিনি যুদ্ধে গমন করেছিলেন। কিন্তু এতে সামান্যমাত্র ভীতি বিহ্বলতাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মযুদ্ধে মৃত্যু হওয়াতে পরকালের অফুরন্ত নেয়ামত লাভ হয়। আরও বিশ্বাস ছিল, অদৃষ্টলিপি কিছুতেই খণ্ডন হয় না। কাপুরুষতায়ও আয়ুবৃদ্ধি পায় না; আর বীরত্বেও আয়ু ক্ষয় হয় না। সুতরাং মৃত্যু ভয় তাঁকে কিরূপে পশ্চাদপদ করতে পারে?

সেকালে প্রত্যেক মুসলমানের মনোবলই এরকম অদম্য ছিল। অতএব, তাদের অগ্রগতিতে বাধাদান কিরূপে সম্ভবপর হবে?

অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে বলে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে জেহাদ প্রবর্তিত হয়েছে। ... মোতা যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলী পাঠ করলে সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ কখনও সংঘটিত হয় নাই। হযরত রাসূলুল্লাহর (দঃ) নিরপরাধ দূত মোতায় অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছিল। দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধ যাত্রাকালে নবী করীম (দঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন, "গীর্জার ধর্মযাজকগণকে বদ করো না, শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং রুগ্নকেও হত্যা করো না।" (মাওলানা আব্দুল জলিল মাযহেরী)।

মহাপ্রলয়ের পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

কেয়ামতের পূর্বের যে ঘটনাসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আছে তার ভিতর নিম্নে কতকগুলি বিষয় আলোচিত হল। হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছেন' "শেষ সময়ে আমার নিয়ম (ছুন্নত) ব্যতীত লোকে অন্য নিয়ম প্রবর্তন করবে এবং আমার হেদায়েত ব্যতীত অন্য হেদায়েত গ্রহণ করবে।"

হযরত একদা একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করে বললেন– আমি যা দেখি, তা কি তোমরা দেখ? ছাহাবীগণ উত্তর দিল-না। তিনি বললেন–নিশ্চয় বৃষ্টিপাতের ন্যায় তোমাদের উপর বিপদাপদ নিপতিত হবে।

যার হস্তে আমার জীবন তাঁর শপথ, যে পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন সময় না আসে, যখন হত্যাকারী কি জন্য হত্যা করছে তা জানবে না এবং নিহত ব্যক্তি কিসের জন্য নিহত হয়েছে তা জানবে না, সে পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না।

www.pathagar.com

আমার ওম্মতের ভিতর কতক লোক পৌত্তলিকদের সহিত সংযোগ স্থাপন না করা পর্যন্ত এবং আমার ওম্মতের ভিতর কতক সম্প্রদায় প্রতিমা পূজা না করা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। আমার ওম্মতের ভিতর ৩০ জন মিথ্যাবাদী উত্থিত হবে। তারা প্রত্যেকেই নবী বলে দাবী করবে। আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে অন্য কোনও নবীর আবির্ভাব হবে না।

হযরত বলেছেন যে, যে পর্যন্ত দু'টি বৃহৎ শক্তি একই দাবীদাওয়া নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। তিনি আরও বলেছেন– কোরেশ বংশীয় একদল যুবকের হস্তে আমার কওমের ধ্বংস হবে।

সময় অতি নিকটবর্তী হবে (অর্থাৎ ভ্রমণে অনেক অল্প সময় লাগবে)। ধর্ম বিদ্যার মৃত্যু হবে, কৃপণতা দৃষ্ট হবে এবং 'হারাজ' বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লার রাসূল– হারাজ কি'? তিনি উত্তর দিলেন–হত্যা।

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খেলাফতের শাসন চলবে, তৎপর বংশগত রাজত্ব আরম্ভ হবে।

পৃথিবী লয় হবে না, যে পর্যন্ত লোকের ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হবে এবং লোক যাকাত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করবে, কিন্তু কাকেও উপযুক্ত পাবে না, যে পর্যন্ত লোকে উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ না করবে।

পৃথিবীর ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা (আরবগণ) এমন কওমের সঙ্গে যুদ্ধ না করবে, যাদের পাদুকা হবে পশুলোম নির্মিত, যে পর্যন্ত ক্ষুদ্র চক্ষু, রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, চেপটা নাসিকা বিশিষ্ট তুরস্কবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ না করবে।

কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলমানগণ ইহুদীদিগের সাথে যুদ্ধ না করবে। মুসলমানগণ এই যুদ্ধে ইহুদীগণকে এত হত্যা করতে থাকবে যে, তারা প্রস্তর এবং বৃক্ষের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করবে। প্রস্তর এবং বৃক্ষ ঘোষণা করবে– হে মোছলেম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার অভ্যন্তরে এক ইহুদী আছে, এখানে আস এবং তাকে হত্যা কর।

কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত 'কাহ্তান' নামক দেশ থেকে একজন লোক বহির্গত হয়ে তার শাসনদণ্ড দ্বারা লোকদিগকে তাড়িয়ে না দিবে।

দিন ও রাত্রি লয় হবে না, যে পর্যন্ত জাহ্জাহ্ নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব না করে।

'কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত আরবদের সাথে খৃষ্টানদের চুক্তি ভঙ্গের পর এক ভীষণ যুদ্ধ না হয়। খৃষ্টানগণ ৮০টি পতাকার নিম্নে যুদ্ধ করতে আসবে এবং পত্যেক পতাকায় ১২,০০০ সৈন্য থাকবে।

www.pathagar.com

কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত খৃষ্টানগণ আ'মাক বা দাবেক নামক স্থানে অবতরণ না করে। তখন মদীনার সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত এক সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। তাদের মধ্যে এক ভীষণ ও ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। তাতে তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। তাদের তওবা আল্লাহ্ কখনও কবুল করবেন না। তাদের এক তৃতীয়াংশ শহীদ হবে। আল্লাহর নিকট উহারাই সর্বোত্তম শহীদান। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ জয়লাভ করবে। তারা কনষ্টান্টিনোপোল দখল করবে। যখন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বণ্টনে তারা ব্যস্ত থাকবে, তখন শয়তান ঘোষণা করবে যে, দাজ্জাল অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তারা সিরিয়াতে আগমন করবে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে, তখন হঠাৎ মেরীর পুত্র যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হবেন। যখন আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল তাকে দর্শন করবে, লবণ যেরূপ পানিতে গলে যায়, তদ্রূপ সে গলে যাবে।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধ, কনষ্টান্টিনোপল জয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের ভিতর সংঘটিত হবে।

কেয়ামত হবার পূর্বে এলেমের লোপ পাবে, মূর্খতা প্রবল হবে, ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্যপানের প্রচলন হবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হবে এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তখন ৫০ জন নারীর রক্ষক হবে মাত্র একজন নর।

কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী হতে স্বর্ণের এক পর্বত বহির্গত না হয়। সেই স্বর্ণ হস্তগত করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ হবে। তাতে শতকরা ৯৯ জনই নিহত হবে।

পৃথিবী ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত আমার বংশের কোনও লোক আরবের উপর রাজত্ব না করে। তার নাম হবে 'আমার নাম', তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। তিনি অত্যাচার ও অবিচারের পরিবর্তে দয়া ও ন্যায় বিচার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবেন।

'মেহ্দী ফাতেমার বংশধরগণ হতে আবির্ভূত হবেন এবং তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করবেন।'

খোরাছান হতে কৃষ্ণপতাকাসহ একদল লোক অগ্রবর্তী হচ্ছে যখন দেখতে পাও, তখন তাদের নিকটবর্তী হও, কেননা, আল্লাহর খলিফা মেহ্দী তার ভিতর থাকবেন।

পূর্বদিকের এক স্থান হতে দাজ্জাল বহির্গত হবে, তার নাম খোরাছান। জনসাধারণ তার অনুবর্তী হবে। নূহের পরে এমন কোন নবী নাই, যে দাজ্জাল সম্বন্ধে তার ওম্মতকে সতর্ক করেননি।

www.pathagar.com

যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, মরিয়মের পুত্র সুশাসন এবং সুবিচার নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, বরাহ বধ করবেন, যিজ্ইয়া কর ধার্য করবেন।

কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সূর্য অস্থাচল হতে উদয় হবে।

তারপর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৃষ্ট জীবজন্তু, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

রাসূল (সাঃ)-এর এসব ভবিষ্যদ্বাণী কিছুকিছু সংঘটিত হয়েছে। আর কিছু ভবিষ্যতের জন্য রয়ে গেছে। যা সংঘটিত হয় নাই, তা নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে। কারণ তাঁর কোন ভবিষ্যদ্বাণী এ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। রাসূল (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্র অস্তিত্বের বড় প্রমাণ।

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিক পণ্ডিতবর্গ

স্টিফেন ডব্লিউ হকিংকে নাস্তিকতার জন্য দোষারোপ করেই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নটি শেষ হবে না। হকিং আরো বহু নাস্তিক পণ্ডিতের মতামতের বন্দী। অবৈজ্ঞানিক বর্তমান খ্রীষ্টবাদ যুক্তিসঙ্গতভাবে স্রষ্টাকে প্রমাণিত না করতে পাওয়ায় খৃষ্টান ঘরের পণ্ডিতগণের অনেকে স্রষ্টাকেই -'গড'কেই পরিত্যাগ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আধুনিক বাইবেলে স্রষ্টার নামটি পর্যন্ত নেই। 'গড' তো হলো একটি ইংরেজী শব্দ, যে শব্দের আবার স্ত্রীলিঙ্গ 'গড্ডেস্' (স্রষ্টা-পত্নী) রয়েছে। বর্তমান বাইবেল থেকে খৃষ্টানগণ স্রষ্টার নিজস্ব নাম বের করতে সর্বসম্মভাবে একমত হয় নাই।

যীশু খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই স্রষ্টাকে ইংরেজী ভাষাতে গড বলেন নাই। তিনি স্রষ্টাকে কি নামে ডেকেছিলেন?

ফ্রেডারিক নিট্শে (Friedrich Nietzsche) একজন জার্মান দার্শনিক। তিনি লিখেন "Where is god gone?" he called out. "I mean to tell you! we have *killed- him*-' you and I! we are all his murderers! . . . Do we not hear the noise of the grave-diggers who are burying god? . . . God is dead! God remains dead." (Friedrich Nietzsche, . *Joyful wisdom*, trans. by Thomas common, Newyork. Fredrick Ungar publishing Co., 1960, section 125, PP. 167-168) . [অনুবাদ ঃ 'গড্' কোথায় গেল? সে আওয়াজ দিল। 'আমি তোমাদের বলতে চাই! আমরা তাকে মেরে ফেলেছি- তোমরা ও আমি! আমরা

www.pathagar.com

সবাই তার হত্যাকারী! . . . যারা গড্‌কে কবর দিচ্ছে আমরা কি সেইসব কবর খননকারীদের আওয়াজ শুনি না? . . . গড্ মৃত! গড্ মরে গেছে!"

কম্যুনিজমের একজন বড় তত্ত্ববিদ ইহুদী বংশোদ্ভূত কার্ল মার্কস লেখেন, "Now a days, in our evolutionary conception of the universe, there is absolutely no room for either a creator or a ruler." *(Marx and Engels on Religion*, ed.by Reinhold Niebuhr, Newyork; Schocken, 1964, P. 295) . [অনুবাদ ঃ "আজকাল, বিশ্ব সম্পর্কে বিবর্তনবাদ মতবাদে না কোন স্রষ্টা, না কোন পরিচালকের কোন প্রকারের জায়গা রয়েছে।"

এইসব নাস্তিক পণ্ডিতগণ অনেক সময় নিজেদের সরাসরি নাস্তিক না বলে মানবতাবাদী ("Humanist" হিসাবে জাহির করেন। এ সম্পর্কে Normal L. Geisler এর 'Is Man the measure? An Evolution of Contemporary Humanism". (grand Rapids : Baker Book House, 1983 (দ্রষ্টব্য)। কেউ কেউ আবার নিজেদের বস্তুবাদী (materialist) বলে বেড়ান।

এখানে 'এগনসটিকস (Agnostics) ও 'স্কেপটিকস' (Sceptics) সংশয়বাদী পণ্ডিতগণের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'এগনসটিকস' বলে, "আমি জানি না অথবা আমি জানতে পারি না, স্রষ্টা আছে কি না।' 'স্কেপটিকস' বলে, 'স্রষ্টার অস্তিত্বে আমার সন্দেহ রয়েছে।' এরা কেউ বলে না যে, স্রষ্টা নেই। অন্যদিকে নাস্তিকগণ সরাসরি বলে যে, স্রষ্টা নেই। যাই হোক, তবুও নাস্তিকগণ 'এগনসটিকস' ও 'স্কেপটিকস' দের অনেক যুক্তি ব্যবহার করে থাকে। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন 'এগনসটিকস' এর দলে ও দার্শনিক ডেভিড হিউম "স্কেপটিকস' এর দলে।

'খোদা একটি তত্ত্ব ঃ খোদা একটা অনুমান বা মতবাদ ঃ god is an idea: god is a hypothesis: খোদা একটা ধারণাসৃষ্ট আদর্শ– একটি কল্পিত সত্তা, এই চিন্তাগুলো স্তূপীকৃত হয়ে উঠতে থাকে স্পষ্টতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে প্রধানতঃ পাশ্চাত্যে এবং এ সময়টাতেই শুরু হয়ে যায় পাশ্চাত্যে রেনেসাঁর প্রবল সূচনা। যার দুর্দান্ত প্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে সারা বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদিতার অপ্রতিরোধ্য দাম্ভিকতায়। এই উন্মুক্ত রিপুর শিকড়ের বিশাল জাল প্রথিত ও বিস্তৃত হয়ে আছে যে দর্শনের মৃত্তিকার উত্তপ্ত গহ্বরে, তার নাম বস্তুবাদ। এর উদগম ঘটেছিল যে জীব থেকে তার নাম ত্রিত্ববাদঃ পাশ্চাত্যে নির্মিত প্রচলিত সৃষ্টধর্ম।

www.pathagar.com

'খোদা আছে এবং তার ঔরসজাত এক পুত্র খোদাও আছে'– ইত্যাকারে খোদা নিন্দাকে মানুষের সুস্থ বিবেক বরদাস্ত করতে পারে না এবং পারেনিও। ঐ জাল বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের মানুষের সচেতন বুদ্ধি বিদ্রোহ করেছে এবং ঐ বিদ্রোহটা সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরিতাপ যে, সেটা পরিচালিত হয়েছে ভুল পথে–অজ্ঞতা ও অস্থিরতার কারণে এক অভিশাপ থেকে আর এক অভিশাপের অন্ধকারে। ফলে সত্য খোদার সন্ধানের পরিবর্তে তা সরাসরি খোদাদ্রোহিতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে এবং পরিণামে ঘোষণা করা হয়েছে– 'খোদার দোহাই– খোদা মরে গেছে।' ঘোষণা করা হয়েছে– 'বিশ্বপ্রকৃতির শক্তির সামনে মানুষের দুর্বলতা প্রসূত আজগুবী খেয়ালের নাম খোদা।' 'বস্তুতঃ খোদা নাই, পরকাল নাই, মানুষের অসুস্থ বুদ্ধি ও বিভ্রান্ত মন তখন বলেছে– 'কী! মরার পর আমাকে আবার জীবিত করা হবে, বলেছে, 'আমাদের এই বর্তমান জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। আমরা মরি, আমরা বাঁচি, ব্যস্। আমাদেরকে যা ধ্বংস করে তা হচ্ছে সময়।' অন্যকিছু নয়। 'মৃত্যু একবারই, আর কোন উত্থান নেই।' 'হাড়-গোড় যখন মিশে যাবে তখন কে আবার তা সক্রিয় করবে?'–ইত্যাদি নানা কথা ভেবেছে মানুষ। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, 'পাপ-পুণ্য নাই, পরকাল নাই, খোদা নাই'।

পশ্চিমের মানুষ যেন চূড়ান্ত উপলব্ধি করে বসেছে যে, মানুষের কোনও স্রষ্টা নেই। স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে শুধু মানুষের ধারণায়, অন্য কোথাও নয়। মানুষের অস্তিত্বই আদি; মানুষের রিয়ালিটিই প্রথম। এই রিয়ালিটির রূপ এখনও অচূড়ান্ত, অপরিজ্ঞাত। এই রূপের রূপকারও মানুষ স্বয়ং, মানুষ স্বয়ং তার সত্তার– তার বিবর্তমান স্বসত্তার সুদক্ষ কারিগর। মানুষ ছাড়া মানব সত্তার কোনও নিরূপক নিয়ামক নেই; মানুষ ছাড়া মানব অস্তিত্বের কোনও নির্মাতা নেই। নিজেকে নির্মাণ করার গোটা দায় ও দায়িত্ব মানুষেরই। অতএব, খোদা থাকা না থাকার প্রশ্নটা অবান্তর। খোদার অস্তিত্বের কোনও অকাট্য প্রমাণও যদি থেকে থাকে, তাতেও কিছু যায় আসে না। ফ্রান্সের নাস্তিক দার্শনিক লেখক জাঁ পল সাত্রের কথায়–

" . . . Nothing can save him (man) from himself, not even a valid proof of the existence of god." (Existentialism and Humanism) (অনুবাদঃ কিছুই মানুষকে তার থেকে বাঁচাতে পারে না, এমনকি খোদার অস্তিত্বের সত্য প্রমাণও না।)

(শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, 'আল্লাহ কি লৌকিক', ধ্রুব প্রকাশনী, রংপুর, পৃষ্ঠাঃ ১-২)

www.pathagar.com

"হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহিম, জয়থুস্ত্র, মনু, বেদের আদি ঋষিবৃন্দ, মুসা, কৃষ্ণ, দাউদ, কনফুসিয়াস, রামচন্দ্র, গৌতম, যীশু এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব মহামানবই এই প্রাচ্যের প্রতীকের নন কেউই। কাজেই প্রাচ্য যে শিক্ষা, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদান করেছে, লালন বর্ধন করেছে, পরিণতি দান করেছে, তাকে মানলে তার খোদাকে মানতে হয়। অতএব, খোদা বিশ্বাস ও ধারণাটা যেহেতু প্রাচ্য, সেহেতু ওটা পরিত্যাজ্য–এটাই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার দম্ভ ঃ "The whole conception of god is a conception derived from ancient orientel despotism"- (Russell)। কিংবা খোদার অস্তিত্বের ধারণাটা হচ্ছে– "Copy of single oriental despot" -Engels)

প্রাচ্যের সর্বকর্তৃত্বময় স্বৈরাচারী রাজশক্তির একটা বর্ধিত– বিবর্তিত রূপসত্তাই আখেরে খোদার রূপ পরিগ্রহ করেছে, পাশ্চাত্য ফিলসফির এই জবর অনুমানটাকে আরও কিছুটা নির্দিষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন প্রফেসর ফিলিপ কে, হিট্টি, এই বলে ঃ

Allah was the Personification of state surpremacy" (History of the Arabs, P-120) (শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, পৃঃ ১৩)।

নাস্তিকতার প্রকারভেদ

নাস্তিক পণ্ডিতগণের নাস্তিকতার রয়েছে নানা প্রকার। 'ট্রেডিশনাল' নাস্তিকতায় Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Jeanpaul Sartre এবং Antony Flew ধারণা করেন যে, স্রষ্টা কোন সময় ছিলেন না এবং কোন সময় হবেনও না।

Friedrich Nietesche এর ন্যায় মাইথলজিক্যাল নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, স্রষ্টার সম্পর্কে পৌরানিক উপাখ্যান অতীতের লোকজন বিশ্বাস করত, কিন্তু আধুনিক মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সে বিশ্বাসকে নিঃশেষ করেছে।

'ডায়ালেকটিক্যাল' নাস্তিকতা মতবাদে Thomas Altizer ও অন্যান্যগণ মনে করেন যে, যীশুখৃষ্টের (যিনি তাঁদের মতে স্রষ্টার 'ইনকারনেশন', অর্থাৎ অবতার) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সর্বাতিক্রমী স্রষ্টারও মৃত্যু হয়েছে (দ্রষ্টব্য Thomas Altizer, *The Gospel of Christian Atheism,* Philadelphia: The Westminster Press, 1966)।

'সেমানটিক্যাল' (Semantical) নাস্তিকতাবাদে গড্ প্রসঙ্গ আলোচনা

www.pathagar.com

মৃত। এ দলে রয়েছেন Paul Van Buren (দ্রষ্টব্য তাঁর The Secular Meaning of the gospel, Newyork :Macmillan, 1963) ও অন্যান্যগণ। তাঁরা মনে করেন যে, 'গড' সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ভাষায় কিছু ব্যক্ত করা অসম্ভব, আর যারা এই মনোভাব পোষণ করেন তাদের কাছে ধর্মের কোন গুরুত্ব নেই।

এছাড়া রয়েছে 'এক্সিসটেনশিয়াল' (Existential) নাস্তিকতাবাদ, যার একজন সমর্থক হলেন ফ্রান্সের লেখক Jean paul Sartre, মার্কসিসটিক (Marxistic) নাস্তিকতাবাদ যার একজন সমর্থক কার্ল মার্কস, মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) নাস্তিকতাবাদ যার একজন্য সমর্থক সিগমান্ড ফ্রয়েড। (Sigmund Frued), পুঁজিবাদী (Capitalistic) নাস্তিকতাবাদ যার একজন সমর্থক *Ayn Rand*, 'বিহেভিওরিসটিক' (behavioristic) নাস্তিকতাবাদ যার একজন সমর্থক হলেন B. F. Skinner। এ ছাড়াও রয়েছে নাস্তিকতাবাদের নানারূপ।

কতিপয় পণ্ডিত

ফ্রেডারিক নিৎসে

Friedrich Nietzsche খৃষ্টানদের লুথারিয়ান পাদরির বাড়ীতে লালিত পালিত হন। তিনি খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে প্রবল অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন 'গড' কখনই ছিলেন না। স্বয়ম্ভূ (self-caused) কিছু হতে পারে,তা তিনি মান্‌তে রাজী নন। তিনি মনে করেন যে, পৃথিবীতে অমঙ্গল থাকলে দয়ালু স্রষ্টা থাকতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, গড এর উপর মানুষের বিশ্বাস নিছক মনস্তাত্ত্বিক। তিনি লেখেন, "I beseech you, my brothers, remain faithful to the earth and do not believe those who speak to you of other worldly hopes! . . . Once the sin against god was the greatest sin; but god died and these sinners died with him." (Nietzsche, *Thus spoke Zarathustra,* trans, by walter kaufmann, Newyork: Viking Press, 1966, prologue 3 ; P. 125) . (অনুবাদ ঃ আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আমার ভায়েরা, পৃথিবীর উপর বিশ্বস্ত থাকুন এবং যারা পরজগতের আশা– আকাঙ্ক্ষার কথা বলে তাদের বিশ্বাস করবেন না। . . . এক সময়ে গডের বিরুদ্ধে পাপ কার্য ছিল সর্বনিকৃষ্ট পাপ; কিন্তু গড মারা গেছেন এবং এইসব পাপীও তাঁর সঙ্গে মৃত।

খৃষ্টানগণ যীশুকে তিন খোদার এক খোদা বলে মানে। যীশু নিহত হলে তো খোদাই নিহত হলেন। তাই নিৎসে বলতে বাধ্য হলেন যে, গড্ মৃত।

www.pathagar.com

তাছাড়া তিনি মনে করেন আধুনিকতা 'গডে' বিশ্বাস করতে পারে না। তিনি আওয়াজ দেন 'God is dead!" (অনুবাদ ঃ গড মৃত)। তিনি মনে করেন মধ্যযুগের মানুষের 'গড' উপাখ্যান প্রয়োজন হলেও আধুনিক মানুষের জন্য 'গডে' বিশ্বাস করার 'ক্রাচ' (খঞ্জ-যষ্টি)-এর কোন প্রয়োজন নেই।

নিৎসে ইহুদী– খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলেন। তিনি ভালবাসার খ্রীষ্টীয় রীতিনীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। তিনি লেখেন, "Christianity " is the greatest of all conceivable corruptions . . . I call it the one immoral blemish of mankiud." (Nietzsche, *Anti-Christ,* Newyork : Knopf, P. 230) . (অনুবাদ খৃষ্টবাদ হোল সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুর্নীতি .... আমি একে মানবজাতির একটি অনৈতিক কলঙ্ক চিহ্ন মনে করি)।

নিৎসে মনে করতেন, কোন পরকাল নেই। যেহেতু কোন 'গড' নেই তাই নাই কোন নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ। মানুষই মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। মানুষ মরণশীল; তবে সে কামনা করবে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে বারে বারে ফিরে এসে একইভাবে জীবন যাপন করা। কুরআন মজীদে আছে যে খারাপ মানুষ আবার পৃথিবীতে আসতে চাইবে, তবে সে সুযোগ সে আর পাবে না। পৃথিবীতে বারে বারে আসার ধারণা হিন্দু ও বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদে রয়েছে। তবে তারও একটি পরিণতি রয়েছে মোক্ষ লাভ করে বা নির্বাণ প্রাপ্তিতে। নিৎসে চান অনন্তকাল ধরে জন্মান্তর।

নিৎসে বলেন যে, বিশ্ব এমনি রয়েছে। তিনি বলেন যে, বিশ্ব সত্য, আর গড হলো 'ইলুসন' (ভ্রান্তিময়)।

নিৎসে মনে করেন যে, জীবনচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান। মানুষের ইতিহাস তার ভাগ্যের ন্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। তিনি খ্রীষ্টীয় মতবাদ কেন্দ্রিক পরিণতি প্রত্যাখ্যান করেন। 'সুপারম্যান' (মহামানব) হলো এমন প্রতিভাবান মানব, যে তার ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি করে। সুপারম্যান বলে, "এটা এই হবে।"

সুপারম্যান তত্ত্ব একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়। ইসলামে রয়েছে 'মর্দেমুমিন' (বিশ্বাসী মানব)। মর্দে মুমিন যা কামনা করে তাই পায়, তবে আল্লাহর সাহায্যে। নিৎসের সুপারম্যান আল্লাহ্ নির্ভর নয়। 'মর্দে মুমিন' যদি আল্লাহ নির্ভর না হয়, তাহলে তার সহায়তাকারী হবে তো শয়তান! তার দশা জার্মান কবি গ্যেটের ডঃ ফসটাসের ন্যায় হতে বাধ্য যে তার আত্মা শয়তানের নিকট বিক্রয় করে জাগতিক স্বার্থের জন্য।

www.pathagar.com

লুডউইক ফয়েরবাক (Ludwig Feuerbach)

নিৎসের পূর্বে লুডউইক ফয়েরবাক নাস্তিকতা প্রচার করেন। কার্ল মার্কস তার অর্থনৈতিক কম্যুনিজম তত্ত্বে ludwig -এর নাস্তিকতা মিশান। ludwig বলেন যে, 'গড' হোল মানুষের কল্পনার বহিঃপ্রকাশ। নিজের সম্পর্কে ভাবতে গিয়েই মানুষ তাকে 'গড' বলে। 'গড' হলো আসলে মানুষের মধ্যকার উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠ দিকটা। গডের গুণাবলী আসলে মানুষের ভিতরকার সবচেয়ে ভালো গুণাবলীগুলো। তিনি লেখেন ঃ " . . . The object of any subject is nothing else than the subject's own nature taken objectively. Such as are a man's thaughts and dispositions, such is his God; so much worth as a man has, so much and no more has his God. consciousness of God is self-consciousness, knowledge of God is self-knowldege. By his God than knowest the man and by the man his god; the two are identical" (Ludwig Feuerbach, The Essencc of Christianity, Newyork: Harper Torchbook, 1957, P 12).

(অনুবাদ ঃ কোন ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ হলো সেই ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতিগত স্বভাব যা নৈর্ব্যক্তিকভাবে নেওয়া হয়। মানুষের চিন্তাচেতনা, চালচলন হলো তেমনি; তেমনি হলো তার গড্; মানুষ হিসাবে তার যা মূল্য ও গুরুত্ব, তার গডও ততটুকু, তার বেশী নয়। গড্ সম্পর্কে সচেতনতা হলো খোদ সম্পর্কে সচেতনতা, গড সম্পর্কে জ্ঞান হলো খোদ সম্পর্কে জ্ঞান। কোন মানুষের গড্ সম্পর্কে ধারণায় সেই মানুষকে জানা যায়, আর সেই মানুষকে জানার মধ্যে তার গড্কে জানা যায়; দুটো হলো একই, অভিন্ন)।

লুইজ স্রষ্টা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি অবশ্য মানুষের নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, নিজের (খোদের) ধারণাই হলো গড্। আলাদা কোন গড্ নেই। খুদী বা নিজের আত্মা সম্পর্কে কবি ও দার্শনিক ইকবাল বেশ মূল্যবান কথা বলে গেছেন। হ্যাঁ, খুদীকে জানলে, খুদীকে শক্তিশালী করলে মানুষ অনেক কিছু পেতে পারে, কিন্তু গড্ হতে পারে না, হতে পারে 'গড্লি' অর্থাৎ আল্লাহ-ময়, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত। কুরআন মজিদ বলে,

"(আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহ্র রঙ। রঙে আল্লাহর চেয়ে কে বেশি সুন্দর? আর আমরা তাকেই উপাসনা করি।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৩৮ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ তো মানুষকে তাঁর নিজস্ব গুণাবলীর কিছু কিছু প্রদান করেছেন। তবে চূড়ান্ত গুণাবলী দেন নাই। আল্লাহ জ্ঞানী, মানুষও জ্ঞানী তবু তফাৎ আকাশ-পাতাল।

আর হ্যাঁ, নিজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে আল্লাহকে অনুধাবন করা সহজ হবে। নিজেকে জানলে খোদাকেও জানা যাবে।

লুডউইগের ভিতর একটি সর্বেশ্বরবাদ ভাবনা দেখা যায়। 'মানুষই ভগবান, আর ভগবানই মানুষ' এ ধরনের ভাব। তবে তিনি শুধু মানুষেই গড দেখছেন, অন্য জীবজন্তু, বস্তুতে নয়। হিন্দু সর্বেশ্বরবাদে (Pantheism) ভগবান মানুষ ছাড়াও সর্ব কিছুতে সর্ব কিছুর ভিতর। অর্থাৎ সবই ভগবানের অংশ। লুডউইগ অবশ্য তা বলেন না। তিনি মানুষ ও গড্–এতেই সীমাবদ্ধ। তবে উদ্দেশ্য হলো শেষতক গড্‌কে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে অস্বীকার করা।

লুডউইগ মনে করেন– মানুষ আত্ম-অনুভূতির মাধ্যমে খোদের (নিজের) খোদাত্ম উপলব্ধি করে। অন্য জীবজন্তুর রয়েছে অনুভূতি, কিন্তু নেই আত্ম-উপলব্ধি। লুডউইগ মানুষের এই গুণের জন্য তাকেই খোদায় পরিণত করেছেন। ইসলাম বলে যে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা, তাঁর প্রতিনিধিও আল্লাহ্‌র অনেক গুণের (যেমন জ্ঞান) ক্ষুদ্র পরিসরে গুণান্বিত, কিন্তু মানুষ কোনক্রমেই আল্লাহর সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বি বা অংশীদার নয়। অন্য জীবজন্তুর চেয়ে মানুষ শ্রেয় ঃ বলেই মানুষ কখনও আল্লাহ্ হতে পারে না।

লুডউইগ চান, "The friends of god into friends of man, believers into thinkers worshippers into workers candidates for the other world into students of this world, Christians, who, on their own confession are half-animal and half-angel into men-whole men." (Ludwig Fuerbach, *The Essence of Christianity, P XI),*

[**অনুবাদ ঃ** গডের বন্ধুরা যেন মানষের বন্ধু হয়, বিশ্বাসীরা, চিন্তাবিদ, এবাদতকারীগণ কর্মী, পরকালের প্রার্থীগণ এ জগতের ছাত্র; খৃষ্টানগণ যারা 'কনফেসন' অর্থাৎ পাদরির নিকট পাপ স্বীকার করে এবং ফলে আধা-পশু ও আধা ফেরেশতাতে পরিণত হয়, তারা যেন মানুষ–পূর্ণ মানুষ–হয়।]

লুডউইগ এখানে ভুল করেছেন এই ভেবে যে, স্রষ্টার বন্ধুরা বুঝি মানুষের বন্ধু হতে পারে না। এছাড়া বিশ্বাসীরা তো চিন্তাবিদ হতে সক্ষম। আল্লাহ

www.pathagar.com

কোরআনে বিশ্বাসীদের জগৎ-জীবন সম্পর্কে বেশ চিন্তা করতে, গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। পরজগতের প্রার্থীগণের এ জগতের ছাত্র হতে বাঁধা কোথায়? হ্যাঁ, সত্যিকারের ভালো মানুষ আধা পশু ও আধা ফেরেশ্‌তা, শুধু অপূর্ণ মানুষই পূর্ণ পশু; আর পূর্ণ ফেরেশ্‌তা কখনই মানুষ হতে সক্ষম নয়। ভাল-মন্দের মিশ্রণেই মানুষ– একজন পূর্ণ মানুষ– পশু ও ফেরেশ্‌তার মাঝামাঝি! হযরত আদম (আঃ) তারই প্রমাণ দিয়েছিলেন তাঁর ও তার পত্নী হযরত হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির পরে। তাদের পদস্খলন হয়েছিল, আবার সংশোধনও হয়েছিল ভুল স্বীকারের মাধ্যমে। লুডউইগ খ্রীষ্টীয় 'কনফেসনে' ভুল পেতে পারেন, তবে ইসলামের 'তওবা' (ভুল স্বীকার করে পাপ থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি) 'কনফেসনের' চাইতে বেশী স্পষ্ট ও একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

জাঁপল সার্ত্রে

বিংশ শতাব্দীতে 'এক্সিসটেনসিয়াল' নাস্তিকতা নামে পরিচিত মতবাদের ধারক-বাহক হলেন জাঁপল সার্ত্রে ও আলবার্ট ক্যামু (Albert Camu)। সার্ত্রে মনে করতেন গডের থাকাটা অসম্ভবপর ব্যাপার, কারণ গড্ যদি স্বয়ম্ভু হন তাহলে সমস্যা হলো তাঁর 'সৃষ্টি'র পূর্বে তাঁকে থাকতে হবে, না হলে তাঁর সৃষ্টি কিভাবে হবে? তিনি বলেন যে, নির্ভরশীল সত্তা স্বাধীন সত্তায় পরিণত হতে পারে না। তিনি বলেন, শূন্য হতে পারে না কিছু। সার্ত্রের সোজা কথা স্বয়ম্ভু কিছু হতে পারে না, তাই গড্‌ও থাকতে পারে না।

সার্ত্রে স্রষ্টাকে তাঁর জ্ঞানে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বয়ম্ভু অবস্থানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি স্রষ্টাকেই অস্বীকার করেছেন, 'স্বয়ম্ভু' শব্দ দিয়ে আল্লাহকে ব্যাখ্যা করা যাবে কি না– এটি বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ্‌র আবির্ভাব এমন নয় যে, একসময় তিনি ছিলেন না। তারপরে এক বিশেষ সময়ে তিনি এলেন। সোজা কথায় 'তিনি আছেন,'। হকিং ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ মহাবিশ্বের অবস্থান ও স্থিতি নিয়ে যা বলেন– যেমন মহাবিশ্ব আছে (It is just Be)– আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে তা খাটে না। এটি আসলে আল্লাহরই গুণ। আল্লাহ আছেন– শুধু আছেন – It is just Be; তিনি একটি বিশেষ সময়ে সৃষ্টি হয়ে আছেন, তেমন নয়। আসলে নাস্তিক পণ্ডিতগণ কখনও আল্লাহর গুণকে মানুষ, কখনও মহাবিশ্বকে দিয়ে শুধু বিভ্রান্তিই বাড়িয়েছেন। 'It is just Be' বলে যদি কোন কিছু থাকে তা হলো আল্লাহর সত্তা। আর সবই আল্লাহর ইচ্ছায় বিশেষ সময়ে সৃষ্ট। এইজন্য তো মহাপ্রলয়ে সবই ধ্বংস হবে, শুধু আল্লাহর সত্তা ছাড়া। ধ্বংসই যদি এসব

www.pathagar.com

হয় তাহলে তাদের কিভাবে 'It is just Be' বলা যাবে? আল্লাহ্ কোরআন মজীদে স্পষ্ট বলেছেন, "তাঁকে (আল্লাহ্কে) জন্ম দেওয়া হয় নাই" (১১২ সূরা ইখলাস ঃ ৩ আয়াত)। "জন্ম" বলে কোন শব্দ আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

সার্ত্রে বলেন যে, মানুষের লক্ষ্য হলো 'গড্' হওয়া। আর মানুষের রয়েছে 'এবসুলুট ফ্রিডম' (চূড়ান্ত স্বাধীনতা)। সার্ত্রের কথার জবাবে বলতে হয়, আসলে মানুষ নানা শিকলে বাঁধা; রোগ, ব্যাধি, মৃত্যু, বার্ধক্য, দারিদ্র্য, হতাশা ইত্যাদি মানুষকে বেঁধে রেখেছে। মানুষের কোথায় পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে? হ্যাঁ, তবে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সবেচেয়ে বেশী স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে সে স্বাধীনতা দিয়ে 'গড্' হওয়া যায় না। বেবিলনের নমরুদ ও মিসরের কোন কোন ফেরাউন বাদশা স্রষ্টা হওয়ার দাবী করে শেষতক্ উচিত শিক্ষা পায়।

সার্ত্রের নাস্তিকতায় কোন পূর্ণ (absolute) বা নৈর্ব্যক্তিক (objective) নৈতিক *নোস্‌খা* নেই। তিনি লেখেন, "no sooner had you (zeus) created me than I ceased to be yours"' (Sartre, *the Flies in no Exit and Three Order Plays,* Newyork : Vintage Books, 1947, P 121). (অনুবাদ ঃ যে মাত্র তুমি (জিউস) আমাকে সৃষ্টি করলে সেই মাত্র আমি তোমা থেকে পৃথক হয়ে গেলাম)। জিউস হলো পুরাতন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী সত্তা–অনেকটা গডের মত।

যে সব মিথ্যা দেব-দেবী পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে প্রকৃত স্রষ্টাকে তুলনা করা সার্ত্রের মত একজন শিক্ষিত ব্যক্তির ঠিক হয়েছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। প্রকৃত স্রষ্টা অনন্তকাল ধরেই আছেন; আর জিউস দেবতা বেঁচেছিল (?) যতদিন গ্রীক মূর্তিপূজকেরা ছিল। হ্যাঁ, জিউসই হলো ভ্রান্ত মানুষের ভ্রান্ত প্রভূ। জিউস পুরাতন গ্রীকদের মনের কাল্পনিক ছবি– মনের একটি অনুমান মাত্র। কোরআন বলে, "তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে (প্রাচীন আরবের মূর্তিপূজকদের তিনটি দেবীর নাম)? . . . এগুলি কতক নামমাত্র যা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই। তারা তো অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ এসেছে (হযরত মুহাম্মদ সাঃ-এর মাধ্যমে প্রচারিত কোরআন মজিদের দ্বারা)। (৫৩ সূরা নজ্‌ম ঃ ১৯–২০, ২৩ আয়াত)।

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা (অবিশ্বাসীরা) দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।" (৪ সূরা নিসা ঃ ১১৭ আয়াত)।

www.pathagar.com

সার্ত্রে যেহেতু স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন নাই, তাই তিনি নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধেও (objective values) বিশ্বাস করেন নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি তাঁর তথাকথিত বিখ্যাত (কুখ্যাত?) পুস্তক Being and Nothingness এর শেষ লাইনগুলিতে লেখেন, "It amounts to the samething whether one gets drunk alone or is a leader of nations (পৃষ্ঠা ৭৬৭)। (অনুবাদ ঃ এটা একই ব্যাপার, এক ব্যক্তি একাকী মদ পান করে মাতাল হলো বলেই কি সে জাতিসমূহের নেতা হলো)। সার্ত্রের নিকট মানুষের সব কাজই একই; কোন চূড়ান্ত ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ নেই; মানুষ তার মূল্যবোধ নিজেই তৈরী করবে; সে তার নিজের জন্যই কাজ করবে এবং চাইলে মানবতার জন্যও কাজ করবে, তবে মানবতার জন্য কাজ করার তার কোন, নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি বলেন যে, মানুষ যাই করে না কেন, তাই ভাল (good)।

সার্ত্রের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে এ ধরনের ধারণার কি পরিণতি হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি? মাতাল হওয়া আর নেতাগিরি একই কর্ম আর সবই সুকর্ম! তাঁর নীতিবোধ মানুষকে সম্পূর্ণ স্বার্থপর ও বেপরোয়া করে তুলবে। উল্লেখ্য যে, সার্ত্রে বিবাহে বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি ফরাসী একজন প্রখ্যাত মহিলা সার্হমন দ্য বিভুর সঙ্গে বিনা বিবাহে বসবাস করতেন।

হকিং-এর ন্যায় সার্ত্রের বিশ্বও 'It is simply there' (অনুবাদ ঃ এটি সেখানে রয়েছে)। এ বিশ্ব 'It is uncaused' (এটি কারণ ব্যতীত অর্থাৎ অসৃষ্ট)। সার্ত্রে ও অন্যান্য নাস্তিক পণ্ডিতদের ছিলছিলায়– পরম্পরায় হকিং এর আবির্ভাব। উল্লেখ্য সার্ত্রের ভিতর ছিল কিছুটা কম্যুনিজমের প্রভাব। তবে ফ্রান্সে কম্যুনিজম তেমন সুবিধা করতে পারে নাই বলে তিনি কম্যুনিষ্ট হিসাবে জোড় প্রচারণা করেন নাই।

স্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি যুক্তি ও সেগুলোর খণ্ডন

ডেভিড হিউম (১৭১১–১৭৭৬) যিনি 'স্কেপটিসিজমের' তাত্ত্বিক ও ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪–১৮০৪) যিনি 'এগনসটিসিজমের' ধারক ও বাহক, এই দুই ইউরোপীয় দার্শনিক স্রষ্টার অনস্তিত্বের পক্ষে নানা যুক্তি-অযুক্তি পেশ করেন। নাস্তিক ও সংশয়বাদীগণের নানা যুক্তিতর্ক নিম্নে বিধৃত হলো। সেই সঙ্গে আমাদের জবাব–

(১) নাস্তিকেরা বলে বিশ্বের সৃষ্টিতে একটি কার্যকারণ থাকলেও, তা অসীম (infinite) নাও হতে পারে। একটি সসীম (finite) কার্যকারণ একটি সসীম ফলাফল অর্থাৎ বিশ্বকে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

উপরের যুক্তির উত্তরে বলা যেতে পারে যে, একটি সসীম ক্ষমতা একটি সসীম বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়ত পারে; তবে তা যে সুনিয়ন্ত্রিত হবে, তার কি গ্যারান্টি রয়েছে? মহাবিশ্বে কোন বিশৃঙ্খলা নেই; এতেই প্রমাণিত হয় যে, কার্যকারণটি অসীম, সমস্ত ভুলত্রুটিমুক্ত। এক অন্ধ কি আর এক অন্ধকে পথ দেখাতে সক্ষম? অন্ধ একজন চক্ষুষ্মানের সাহায্যেই পথ পেতে পারে।

বিশ্বের সৃষ্টিতে কার্যকারণ না থাকার প্রশ্নই উঠে না। কার্যকারণ না থাকলে তো মহাবিশ্বই অসীম হয়ে যাচ্ছে। যেখানে অসীম স্রষ্টার ধারণাতে নাস্তিকদের এত আপত্তি, কিভাবে অসীম মহাবিশ্ব মেনে নেওয়া যায়?

মহাবিশ্বের সব কিছুই ফলাফল (effects) হতে পারে না; অন্ততঃ একটি কার্যকারণ (cause) থাকবে। একটিমাত্র কার্যকারণ বা হেতুর উপর সব ফলাফল নির্ভরশীল হতে পারে। সমস্ত সসীম সত্তার কারণ একটি অসীম সত্তাই হতে পারে।

(২) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, যদি মহাবিশ্বের একটি কার্যকারণ থাকেও তা পূর্ণ নয়- অর্থাৎ অপূর্ণ (imperfect), কারণ মহাবিশ্ব হলো অপূর্ণ। কার্যকারণ (cause) যদি ফলাফল (effect) এর ন্যায় হয়, তাহলে মহাবিশ্ব একটি অপূর্ণ, সসীম, পুরুষ ও নারীজাতীয় দেব-দেবীদের দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

উপরের মন্তব্যের জবাবে বলা যেতে পারে যে, মহাবিশ্বকে যেভাবে অপূর্ণ (imperfect) বলা হচ্ছে তা একটি 'রিলেটিভ' (আপেক্ষিক) মন্তব্য। মহাবিশ্বে বেহেশ্‌তের মত পরিবেশ নেই, হয়ত অনেক কিছুর অভাব রয়েছে বেহেশ্‌তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে। তবু অন্য অর্থে মহাবিশ্ব অপূর্ণ (imperfect) নয়। সুশৃঙ্খলভাবে এটি চলছে বহুকাল ধরে। কুরআন মজিদ বলে, "তিনি (আল্লাহ্) স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাজিয়ে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না? তারপর তুমি বারবার তাকাও, -তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।" (৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৩-৪)।

"আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৪৪)।

"তিনিই (আল্লাহ্ই) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্বাস করে ও কেউ কেউ বিশ্বাস করে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে ও তোমাদের

www.pathagar.com

আকৃতি দিয়েছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই কাছে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তিনি জানেন– তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর; আর তিনি তো অন্তর্যামী।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ২–৪)।

ইসলামের আল্লাহ্ সংশয়বাদীদের অনুমানের স্রষ্টার মত নন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন খুঁত নেই; আল্লাহ্ "যথাযথ" ভাবে সৃষ্টি করেছেন সংশয়বাদীদের ধারণা যে, মহাবিশ্ব নর-নারী জাতীয় অপূর্ণ, সসীম দেব-দেবীরা সৃষ্টি করেছে– এমন ধরনের দেব-দেবীকে ইসলাম একেবারেই মানে না। তবে দেব-দেবীকে যদি ফেরেশ্তা (angel) বলা হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে তারা নরও না, নারীও না। আর তারা সসীমই। তবে তাদের প্রভূ আল্লাহ অসীম ও পূর্ণ। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর কর্মচারীর ন্যায়–তারা আসল প্রভূ নয়।

মহাবিশ্বকে যদি আপেক্ষিক দিক দিয়ে বেহেশ্তের তুলনায় অপূর্ণও ধরা হয়, তবু এটি বলা ঠিক হবে না সংশয়বাদীদের মত যে, অপূর্ণ মহাবিশ্বের স্রষ্টাও অপূর্ণ। মহাবিশ্বের ভিতর যদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমরা বেহেশ্ত-দোযখ ও আল্লাহর আরশ (সিংহাসন বা পরিচালনা কেন্দ্র) অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে মহাবিশ্ব কোনক্রমেই অপূর্ণ নয়, তবে সসীম। মহাবিশ্ব অসীম হলে তো স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা একটি আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত যেতে পারি নাই। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন যে, সাতটি আকাশ রয়েছে, আর নীচের আকাশটি তারকাশোভিত। সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব না দেখে তাকে অপূর্ণ বলা সংশয়বাদীদের ঠিক হবে না। অনুমান সত্য হতে পারে না।

মহাবিশ্বের মূল কার্যকারণ একটি পূর্ণ, নির্ভুল সত্তা। পূর্ণ সত্তার যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে জগতের অপূর্ণতা, ত্রুটিকে কিভাবে মাপা যাবে? কোন কিছু অপূর্ণ এর অর্থই হলো যে, পূর্ণতা ও নির্ভুলতাও তাহলে রয়েছে। মানুষ ক্রমে ক্রমে পূর্ণসত্তার দিকেই এগুচ্ছে। মৃত্যুর মাধ্যমেই জান্নাতে পৌছার পর মর্দে মুমিন, ইনসানে কামিল (সুপারম্যান), আশরাফুল মাখলুকাত সেই পূর্ণ সত্তার সান্নিধানে গিয়ে সেই সত্তার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে যদিও পৃথিবীর অনেক মানুষ স্রষ্টা সম্পর্কীয় জ্ঞানে বিভ্রান্ত। কুরআন বলে, "তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামতের (বিচারের) দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।" (২২ সূরা হজ্জ ঃ ৬৯ আয়াত)।

www.pathagar.com

(৩) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, মহাবিশ্বের পরিকল্পনাকারী (designer) হিসাবে বুদ্ধিমান কার্যকারক (cause) এর কোন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ করে, দৈবাৎ, ভাগ্যক্রমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্ব একটি "সুখময় দুর্ঘটনা।"

এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, হঠাৎ করে এমনি একটি সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব হয়ে গেল, এ যুক্তি কি সঠিক? পৃথিবীতে কিন্তু হঠাৎ করে আর নতুন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না। সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল কেন? পৃথিবীতে নতুন নতুন জীবজন্তু গাছপালা তবে আর হচ্ছে না কেন? কে এসব বন্ধ করে দিল? হয়ত বলা হবে– প্রাথমিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তাই নতুন কিছু হচ্ছে না। আমরা বলব, বর্তমান পরিবেশ উপযোগীই নতুন কিছু তো সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কেউ বলবে, কেন খচ্চর, ক্লোন ভেড়া, টেস্টটিউব শিশু, মাল্টা জাতীয় কমলালেবু ইত্যাদি তো নতুন সৃষ্টি। আমরা এসবকে নতুন প্রজাতি কিভাবে বলতে পারি? আল্লাহ্‌র মূল পদার্থগুলোকেই, বীজগুলোকেই বিভিন্ন 'কম্বিনেশন' করে এ সবের জন্ম হয়েছে। মানুষ তো গাছের একটি পাতা পর্যন্ত সৃষ্টি কতে সক্ষম নয় বলে আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন।

অভাবিত বা আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা (chance, accident) সব সৃষ্টির জন্ম ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটি বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকারণ অবশ্যই প্রয়োজন হয়। মানুষের প্রয়োজন অক্সিজেন, পানি, গম, চাউল, আলু, সোনা, রূপা, লোহা, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি। এসব বস্তু ও জন্তু আকস্মিক পথিবীতে উদয় হয়েছে কি? না একটি পরিকল্পনার অধীন? একটি 'ডিএনএ' (জীবের ক্ষুদ্রতম কোষ) ও একটি বীজে যে সম্ভাবনা ও তথ্য আছে তা বহুখণ্ডের গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবে না। মানুষের একটি মগজে যে পরিমাণ জন্ম বা উৎপত্তি ঘটিত (genetic) তথ্য রয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করতে বড় বড় লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু একজন বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টাই এই জটিল ব্যবস্থার জন্য মূল কারণ বা হেতু।

স্রষ্টার গুণাবলী, প্রশংসাবাণী, তথ্য শেষ হবার নয়। তাই কুরআন বলে, "বল, আমার প্রতিপালকের কথা (বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।" (১৮ সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৯ আয়াত)।

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সহিত যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবু আল্লাহর বাণী (গুণাবলী লেখা)

www.pathagar.com

নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৩১ সূরা লোকমান ঃ ২৭ আয়াত)।

"দুর্ঘটনা" তত্ত্বে মহাবিশ্ব সৃষ্টি একটি সম্ভাবনা মাত্র, এটি অপরিহার্য নয় সৃষ্টির জন্য। বলা হয়ে থাকে যে, প্রেসে বিস্ফোরণের ফলে একটি অভিধান বেরিয়ে আসতে পরে অঙ্কের সূত্র বা সম্ভাবনার কারণে। বর্তমান মহাবিশ্বের সবকিছু ভালভাবে নিরীক্ষা করে কি আমরা বলব যে, অভিধানের মত মহাবিশ্ব ও তার অভ্যন্তরের সবকিছু এইভাবে অর্থাৎ দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট?

আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মগজ সম্পর্কে তথ্য প্রেরণে বুদ্ধি প্রয়োজন। Herbert Yockey ("Self Organzation, Origion of life scenarios and Information Theory" in The *Journal of Theoreical Biology* 91, 1981, Pages 13-31) বলেন যে, লিখিত ভাষার তথ্যে এবং জীবন্ত ডিএনএ সেলের তথ্যে অঙ্ক জাতীয় সাদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি লিখিত ভাষা হলো বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা থেকে উদ্ভূত। আমরা যদি দেখি যে, একটি সুমধুর সঙ্গীত বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে তাহলে সেই গায়ককে দেখানো না গেলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, কেউ রয়েছেন এই সংগীতের পিছনে। ডিএনএ'র ভিতর অসংখ্য তথ্যের সন্নিবেশ প্রমাণ করে যে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা থেকে এটি এসেছে।

এ দুনিয়ার কোন কিছুই খোদা বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। যে প্রাণীগুলো বোঝা বহন করে তাকে সেই প্রকৃতিই দান করেছেন। লাঙ্গল টানার পশুগুলোর আকার ও প্রকৃতি সেই কাজের উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার মহৎ চিন্তা যে কাজ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণীর আকার ও গঠন যদি নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে গঠিত হতো তাহলে ঘোড়া নিজের ইচ্ছেতে বোঝা বহন করার মতো কাজ নিতে যেতো না। তাই সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়– কোন সৃষ্টিই একজন মহাপরিকল্পকের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি। সে সত্যের সাক্ষী হিসেবে আল কোরআনে এ মর্মে ঘোষণাও দেয়া হয়েছে (মোঃ আক্কাস উদ্দিন, সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৭)।

"আমি (আল্লাহ্) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।" (৪৪ সূরা আদ দোখান ঃ আয়াত ৩৮–৩৯)।

www.pathagar.com

(৪) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, হেতুবাদ অর্থাৎ কারণ তত্ত্ব (Principle of causlity) প্রমাণ করা যায় না। একটি ঘটনার পরে আর একট ঘটনা ঘটে,তাই বলে পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার কারণের ফলাফল নয়। মোরগ ডাকার পরে সূর্য উঠার অর্থ এই নয় যে, সূর্য ওঠা মোরগ ডাকা কার্যকারণের ফলাফল।

সংশয়বাদীগণ উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হেতুবাদের ভুল ব্যাখ্যা। সূর্য ওঠার পূর্বে তাঁরা শুধু মোরগ ডাকাই লক্ষ্য করেছেন। তারা কি পৃথিবীর আহ্নিকগতিকে লক্ষ্য করতে চান না? যেদিন মোরগ ডাকে না, যে এলাকায় মোরগ নেই, সেখানে কি সূর্য উঠে না? একটি ঘটনার পর আরও একটি বা বহু ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন– সূর্য ওঠার পরে চারিদিক আলোকিত হতে পারে, আবার কেউ কেউ মাঠের দিকে যেতে পারে প্রাতঃভ্রমণে, সে সময়ে একটি উড়োজাহাজ আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পারে ইত্যাদি। এখন কি বলতে হবে যে, উড়োজাহাজটি উড়ে যাওয়া সূর্য উঠার কার্যকারণের ফল? হ্যাঁ, তবে চারদিকে আলোকিত হওয়া সুনিশ্চিতভাবে সূর্য ওঠার কার্যকারণের ফল। কার্যকারণ তত্ত্ব বা হেতুবাদ একেবারেই অপ্রমাণিত তা বলা ঠিক নয়। হেতুবাদ না থাকলে ধরতে হবে যে, অনস্তিত্ব বা শূন্য প্রস্তুত করে বস্তু, কিন্তু শূন্য কিভাবে কিছু সৃষ্টি করবে? শূন্য শুধু শূন্যই সৃষ্টি করতে পারে। হ্যাঁ, তবে সার্বভৌম কোন সত্তা থাকলে তা শূন্য থেকে অন্যকিছু অস্তিত্বে আনতে সক্ষম।

(৫) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, বহু হেতু বা কারণের পরপর হিড়িক (infinite series of causes) থাকতে পারে। পিছনের দিকে যেতে যেতে আমরা বলতে পারি, 'সেটি কিভাবে হলো?' কাজেই প্রাচীনতম, প্রথম জন্মহীন কারণ বা হেতু (uncaused cause) থেমে যাওয়া ঠিক হবে না।

সংশয়বাদীগণ আসলে "জন্মহীন হেতু" বলতে স্রষ্টাকে বুঝাতে চান। আর বলতে চান, Who created god? (কে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করেছে?) এই ধরনের যুক্তি উত্থাপনকারীগণ তবে কিভাবে মহাবিশ্ব সম্পর্কে বলতে পারেন "It would just Be" (মহাবিশ্ব শুধু আছে)। সৃষ্টি একটি বিষয়কে যদি "এটি শুধু আছে" বলা যায়, তাহলে এই সৃষ্টির প্রকৃত সার্বভৌম প্রভূকে "He would just Be" (তিনি শুধু আছেন) কেন বলা যাবে না?

হেতুর হিড়িক তত্ত্বের ব্যাপারে বলা যায় যে সব ছোট ছোট হেতু বা কারণ সার্বভৌম শক্তি নয়। একই সঙ্গে বহু সার্বভৌম শক্তির চিন্তার ধারণা অবাস্তব। সার্বভৌম হেতু একটিই হবে। তাই তো আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, "আল্লাহ্ কোন

www.pathagar.com

সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁর সহিত অপর কোন ইলাহ্ (সার্বভৌম প্রভূ) নাই; যদি থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র!" (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ ৯১ আয়াত)।

অঙ্কের ক্ষেত্রে অসীমতা থাকতে পারে, তবে বস্তুগত অসীমতা বা অসীমতার হিড়িক নেই। বহু অসীমতার ধারণাও অযৌক্তিক।

(৬) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, 'গড্' সহ কোন কিছু বা সত্তা নেই, তা ধারণা বা অনুমান করা যায়। তাই কিছুই অবস্থান করে না অবশ্যম্ভাবীরূপে বা অপরিহার্যরূপে (necessarily)। 'গড'ও অবশ্যম্ভাবীরূপে অবস্থান করে না। তাই 'গড'ও একটি প্রয়োজনীয় সত্তা নয়। আর তাই 'গড'ও অবশ্যই অবস্থান করে না।

সংশয়বাদীগণের উপরোক্ত যুক্তি একটি গোলকধাঁধা অথবা সোনার পাথরবাটি আর কি। এক ব্যক্তি যা অনুভব করবে, তাই শুধু রয়েছে, আর যা অনুভব করে না, তা নেই– এটি কোন যুক্তি হলো? একটি শিশু কি অনুভব করে যে গ্রহ রয়েছে, অক্সিজেন রয়েছে, লণ্ডন শহর রয়েছে? যদি সে তা অনুভব না করে, যদি না ধারণা করে, তাহলে এ সবই নেই। এ কতকটা সেই উটপাখীর মত, যে শত্রু দেখলে নাকি মাথা ঝোপের আড়ালে বা বালুতে লুকায় আর তাতে মনে করে যে, শত্রু নেই। গড্ নেই ধারণা করলেই কি গড 'নাই' হয়ে যাবে? অন্যদিকে বলা যায়– কেউ যদি অনুভব করে, ধারণা করে জিউস (গ্রীক) দেবতা আছে, লাত-মানাত-উজ্জাহ্ (প্রাচীন আরব দেবতাসমূহ) আছে, এফ্রোদিতি (গ্রীক প্রেম দেবী) আছে, তাহলে কি তারা আছে? এ অনুমানই কি সত্য হবে? মানুষের অনুমান নির্ভর সত্য ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হতে পারে বেশীরভাগ সময়ে। যুক্তিনির্ভর অপরিহার্য বস্তু বা সত্তার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অপরিহার্য বস্তু বা সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তা বলা যাবে না। প্রকৃত অপরিহার্য সত্তা তাই অস্তিত্বশীল।

(৭) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, জন্মবিহীন স্বয়ম্ভু (uncaused) হেতু বা কারণ বা অপরিহার্য সত্তার ধারণার কোন অর্থ নেই। এটা স্ব-ব্যাখ্যাতও নয়, আর অন্য কিছু শর্ত দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই শর্তহীন ধারণা (unconditioned concept) হিসাবে এর কোন শর্ত নেই– একে অনুধাবনের জন্য।

www.pathagar.com

উপরের যুক্তিটিও একটি সোনার পাথরবাটি। কিভাবে জন্মবিহীন স্বয়ম্ভু হেতু বা কারণ বা অপরিহার্য সত্তার ধারণার কোন অর্থ নেই? তাহলে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) কি? আমরা পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলি ভুল করে। এরা কিছুদিন পরেই পটল তোলে। সার্বভৌম সত্তার পটল তোলা নেই। সেই সত্তাই অন্যসবের পটল তোলে। সার্বভৌম সত্তা একমাত্র সেই জন্মবিহীন হেতু বা কারণ বা অপরিহার্য সত্তা– আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট সত্তা বা কারণ বা হেতু শুধু ধার করা আলোর অধিকারী। সার্বভৌম হেতু একটিই।

কুরআন বলে, "তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১০৭ আয়াত)।

"বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।' (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬–২৭ আয়াত)।

"আকাশ ও জমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৯ আয়াত)।

"আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (৪ সূরা নিসা ঃ ১৩২ আয়াত)।

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান?" (৫ সূরা মায়িদা ঃ ৪০ আয়াত)।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" (৯ সূরা তওবা ঃ ১১৬ আয়াত)।

www.pathagar.com

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে?" (১৬ সূরা নাহ্ল ঃ ৫২ আয়াত)।

"নিশ্চয়ই পৃথিবীর ও এর উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই (আল্লাহ্রই) রবে এবং ওরা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।" (১৯ সূরা মার্য়াম ঃ ৪০ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) কর এবং তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান?" (১৯ সূরা মারয়াম ঃ ৬৫ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় সার্বভৌমত্ব ও মহাবিশ্বের চূড়ান্ত মালিকানা শুধু একজনেরই। আর "সমগুণসম্পন্ন" জন্মবিহীন হেতু বা কারণ বা সত্তার (uncaused being) কোন প্রমাণ মানুষ কি পেয়েছে? সার্বভৌমত্ব খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না। "সমগুণসম্পন্ন" দ্বিতীয় বা বহু সত্তা থাকলে "সার্বভৌমত্ব" খণ্ডিত হয়ে যেত। তার পরিণাম হত মহাবিশ্বে ঘন ঘন বিপর্যয়।

কুরআন আরো বলে, "যিনি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" (২৫ সূরা ফুরকানঃ ২ আয়াত)।

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ৪৯ আয়াত)।

আকাশমণ্ডলী ও পথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যেদিন কিয়ামত (মহাপ্রলয়) সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ ২৭ আয়াত)।

"আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪৮ সূরা ফাত্হ ঃ ১৪ আয়াত)।

সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব (Sovereignty theory) দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, যেহেতু প্রকৃত সার্বভৌমত্ব একটি অখণ্ডিত, অবিভাজ্য শক্তি এবং যার অবস্থানই

www.pathagar.com

সত্যিকারভাবে "It would just be (এটি শুধু আছে) আর এটিই হলো একমাত্র জন্মহীন হেতু বা কারণ বা সত্তা, তাই সার্বভৌম আল্লাহ্ অবশ্যই রয়েছেন। সার্বভৌমত্ববিহীন ছোট ছোট হেতু, কারণ, সত্তা কোনক্রমেই সার্বভৌম আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel and F. C. Copleston in Jon Hick, ed., *The existence of god,* Newyork: the Macmillan Co, 1964, P. 175) বলেন যে, *মহাবিশ্বের কোন কারণ* নেই, এটি শুধু আছে। আমরা বলব ,মহাবিশ্ব যদি জন্মবিহীন হতে পারে, স্রষ্টা কেন নয়? স্রষ্টা স্বয়ম্ভু নয়, স্রষ্টা জন্মবিহীন। তাই কুরআনে আছে আল্লাহ্ সম্পর্কে "ওয়ালাম ইউলাদ" (না তিনি জাতক) (১১২ সূরা ইখলাস্ ঃ ৩ আয়াত)।

স্রষ্টা আসলে self-caused (স্বয়ম্ভু) নন স্রষ্টা Uncaused হেতুবিহীন, জন্মবিহীন' সত্তা। মহাবিশ্ব হেতুবিহীন হলে, স্রষ্টা কেন হেতুবিহীন হতে পারবে না? স্রষ্টা সার্বভৌম হিসাবে হেতুবিহীন। আর সার্বভৌম বহু হয় না।

(৮) 'সংশয়দীগণ বলেন যে, অপরিহার্য অবস্থিতি অস্তিত্ব (existence) সত্তা বলে কিছু নেই। যে কোন পরিস্থিতি বা অবস্থানের বিপরীত' যুক্তিগত দিক দিয়ে সম্ভবপর । সুতরাং কোন পরস্থিতি বা অবস্থান যুক্তিগতভাবে অপরিহার্য নয়।

উপরোক্ত যুক্তির মাধ্যমে সংশয়বাদীগণ আল্লাহকে অপরিহার্য নয় বলে ধারণা করেন। সংশয়বাদীগণ প্রথমেই একটি তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ বা সর্বসম্মত মত বা সত্য উপস্থাপন করেছেন যা হলো– অপরিহার্য সত্তা বলে কিছু নেই। যদি সংশয়বাদীগণ এমনি তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ মত উত্থাপন করতে পারেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীগণ কেন একটি স্বতঃসিদ্ধ মত উত্থাপন করতে পারবেন না? আর সে মতটি হলো একটি অপরিহার্য সত্তা রয়েছেন।

সংশয়বাদীগণ বলেন যে, বিপরীত অবস্থান যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা বলব, তাই যদি হয়, তাদের অবস্থান অপরিহার্য সত্তাহীনতার পক্ষে, আর তার বৈপরীত্য হলো অপরিহার্য সত্তার পাকাপোক্ত অবস্থান। যে সব যুক্তি সংশয়বাদীগণ স্রষ্টার অনস্তিত্বের পক্ষে লাগাচ্ছেন, তাই শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে চলে যাচ্ছে। সংশয়বাদীগণ বলেন যে, অপরিহার্য অবস্থিতি বলে কিছু নেই। আমরা বলব যে, এই যুক্তি নাস্তিকদের অবস্থিতি সম্পর্কেও তো প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়া "অপরিহার্য অবস্থিতি নাই" বললে তাও তো অবস্থিতি, অস্তিত্ব, সত্তা সম্পর্কেই একটি বক্তব্য। তাহলে অন্তত একটি বক্তব্য সত্য। যদি তাই হয়– নাস্তিক, সংশয়বাদীদের যুক্তিই খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে। তাই বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিই বাতিল হচ্ছে।

www.pathagar.com

আস্তিকদের যুক্তি খণ্ডন করলে নাস্তিকদের যুক্তি অপরিহার্যভাবে সত্য হতে হবে। নাস্তিকদের যুক্তি যদি অপরিহার্যভাবে সত্য হয়, তাহলে তাদের পূর্ব যুক্তি যে 'কোন সত্তাই অপরিহার্যভাবে নেই', খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে।

(৯) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, বিশ্বের সামগ্রিকভাবে কোন হেতু বা কারণের (cause) প্রয়োজন নেই; শুধু বিশ্বের অংশসমূহের হেতু বা কারণের প্রয়োজন। অংশসমূহ সামগ্রিক বিশ্বের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব কারো উপর নির্ভরশীল নয়।

হ্যাঁ, এটি ঠিক কথা– অংশ সমগ্রের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রও অংশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কিভাবে বলা যায় যে, মহাবিশ্বের সামগ্রিকভাবে কোন কারণের (cause) প্রয়োজন নেই? কুরআন বলে, "অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা কর– ওদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না আমি বাকি যা সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি বেশী কঠিন।" (৩৭ সূরা সাফ্ফাত ঃ ১১ আয়াত)।

"মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো আরও কঠিন, অবশ্য বেশীরভাগ মানুষ এটা জানে না।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ৫৭ আয়াত)।

"তোমাদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আকাশের? তিনি এ নির্মাণ করেছেন; একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনিই রাত্রিকে অন্ধকারে ছেয়ে রেখেছেন ও দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যের আলো। তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তার থেকে ঝরনা ও চারণভূমি বের করেছেন ও পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (এ সমস্ত) তোমাদের জন্য ও তোমাদের আনআমের (গৃহপালিত জন্তুসমূহের) ভোগের জন্য।" (৭৯ সূরা নাযিয়াত্ ঃ ২৭–৩৩ আয়াত)।

স্রষ্টাই প্রাথমিক সৃষ্টির উপরোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাথমিক সৃষ্টি বেশী কঠিন ছিল পরবর্তী সৃষ্টি অপেক্ষা, পরবর্তী সৃষ্টির জন্য কার্যকারণ সত্তার প্রয়োজন, কিন্তু প্রাথমিক সৃষ্টি, যখন কিছুই ছিল না মহাবিশ্বে, তার জন্য কোন কার্যকারণ সত্তা, কোন হেতু প্রয়োজন নেই, এ ধারণা অযৌক্তিক।

আর একটি কথা– অংশ নিয়েই তো সমগ্র। অংশ ও সমগ্র আলাদা নয়। বিভিন্ন অংশ জুড়েই সমগ্র। অংশ সৃষ্টিতে হেতু বা কারণের প্রয়োজন হলে, সমগ্রের জন্যও তাই প্রয়োজন হবে, কারণ মহাবিশ্বের সমগ্র ও অংশকে আলাদা করা যাবে না। তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। আর কিছু তথ্য এ সম্পর্কে স্রষ্টা নিজেই কুরআন মজীদে ফাস করেছেন।

www.pathagar.com

যাই হোক, মহাবিশ্ব সামগ্রিকভাবে কোন সার্বভৌম সত্তা নয়, তাই এটি কোন সার্বভৌম কার্যকারণ সত্তার উপর নির্ভরশীল।

আর একটি যুক্তি হলো– যদি মহাবিশ্বের সবকিছু এক সময় অনস্তিত্বে পরিণত হয়, তখন কি কিছু থেকে যাবে অস্তিত্বে? যদি না থেকে যায়, তাহলে মহাবিশ্ব একটি নির্ভরশীল সত্তা– এটি শুধু আছে বলা সঠিক হবে না। যদি মহাবিশ্ব অনস্তিত্বে চলে যাবার পর কোন সত্তা বিরাজ করে, তাহলে তাই হবে অপরিহার্য, জন্মবিহীন, মানবজ্ঞানাতীত সর্বাতিক্রমী (transcendent) সত্তা, যা মহাবিশ্বের উপর নির্ভর করে না তার অস্তিত্বের জন্য। কুরআন বলে, "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (সূরা ৫৫ আররহমান ঃ ২৬–২৭ আয়াত)। অন্যত্র আছে, "তিনিই (আল্লাহ্ই) আদি, তিনিই অন্ত।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ ৩ আয়াত)

(১০) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, আস্তিকরা মনে করেন যে, existance (সত্তা, অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, জীবন, অবস্থিতি, সত্তাবান পদার্থ, জীব) হলো একটি predicate (গুণ, অবস্থা, বিধেয়) অথবা perfection (পূর্ণতা, ত্রুটিহীনতা, পূর্ণাঙ্গতা, চরম নৈপুণ্য বা উৎকর্ষতা, পরিপক্বতা, আদর্শ নির্দোষতা) যা subject (আলোচ্য বিষয়, প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য বা কর্তৃপদ)– এর concept (ভাব, ধারণা)কে শক্তিশালী করে। সংশয়বাদীগণ এ প্রক্রিয়াকে ভুল মনে করেন।

আমদের জবাব হলো, সত্তাবান সৃষ্ট পদার্থ বা জীবের পূর্ণতা একটি আপেক্ষিক অবস্থা, কারণ এরা কেউ সার্বভৌম নয়। তবে মহাবিশ্বকে সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ্ ত্রুটিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই এতে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা, আর তা সম্পূর্ণ সেই সার্বভৌম সত্তার অধীন।

যদি সার্বভৌম স্রষ্টা অবস্থান করেন, তাহলে তিনি অপরিহার্যরূপে সার্বভৌম, স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিরাজমান হবেন। মহাবিশ্বে অসার্বভৌম, নির্ভরশীল বস্তু বা সত্তা অবস্থান করছে, আর এটাই প্রমাণ করে অপরিহার্য, সার্বভৌম সত্তার অবস্থানও রয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, একটি অপরিহার্য সত্তার অবস্থিতি অপরিহার্যভাবে রয়েছে।

(১১) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, যা যৌক্তিকভাবে অপরিহার্য তা অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান পাওয়া যায় না। যৌক্তিকভাবে একটি ত্রিভুজের তিনটি

www.pathagar.com

ভুজ বা বাহু থাকার কথা, কিন্তু কোন তিন বাহুবিশিষ্ট বস্তু বিদ্যমান থাকাটা অপরিহার্য নয়।

এর জবাবে বলা যায় যে, যৌক্তিকভাবে যা অপরিহার্য তা অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান পাওয়া নাও যেতে পারে, আবার পাওয়াও যেতে পারে। অনেক জানোয়ারের ঘাস খাওয়া অপরিহার্য, তাই ঘাস পৃথিবীতে রয়েছে। আবার কোন কোন এলাকায় এর স্বল্পতা রয়েছে। যেমন– মরুভূমিতে। মরুভূমিতে পানির কষ্ট বলে উটকে এমনভাবে সার্বভৌম সত্তা সৃষ্টি করেছেন যে, উট বেশ কয়দিন পানি না পান করে থাকতে পারে। কুরআন বলে, "তবে কি ওরা লক্ষ্য করে না– উট কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?" (৮৮ সূরা গাশিয়া ঃ ১৭ আয়াত)।

আর একটি কথা হলো– যা কিছু অপরিহার্য, যা কিছু প্রয়োজন, তার চূড়ান্ত রূপ পৃথিবীতে নয়, বেহেশতে রয়েছে বলে স্রষ্টা আস্তিকদের তথ্য দিয়েছেন। কাজেই পূর্ণ আদর্শ অবস্থা আদর্শ স্থানেই সম্ভবপর।

সংশয়বাদীগণ কি মনে করেন যে, পৃথিবীতে শুধু তিন বাহুবিশিষ্ট বস্তু, দ্রব্য, জীবের ছড়াছড়ি থাকবে? ত্রিভুজ হতে হলে তিন ভুজ বা বাহু প্রয়োজন। সংশয়বাদীগণ কি তিন বাহুবিশিষ্ট কোন বস্তুরই সাক্ষাৎ পান নাই? আর এ ধরনের যুক্তি দিয়ে কিভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়? তিন বাহু বিশিষ্ট কোন কিছু থাকার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

যদি একটি সত্তা যুক্তিযুক্তভাবে অপরিহার্য হয়, তাহলে তার অবস্থিতি নিশ্চিতভাবে থাকবে। যদি কোন ত্রিভুজ থাকে, তাহলে তার অবশ্যই তিনটি বাহু থাকবে। তিন-বাহু দ্বারা ঘেরাওকৃত পাথর টুকরা প্রমাণ করে যে, ত্রিভুজাকার দ্রব্য রয়েছে। তাই বলতে হবে যে, ত্রিভুজাকার বস্তু রয়েছে।

(১২) সংশয়বাদীগণ বলেন, আমরা সত্যিকারের cause (হেতু, কারণ) effects (ফলাফল, পরিণতি) থেকে অনুমান বা স্থির করতে পারি না। একটি অনতিক্রম্য ফাঁক রয়েছে appearances (প্রতীতি, অপচ্ছায়া, বাহ্যভাব) ও reality (বাস্তবত্ব, প্রকৃত সত্তা বা বিদ্যমানতা, প্রকৃত বিষয় বা বস্তু) এই দু'টিতে। আর আমরা প্রকৃত সত্তা ঠিক জানতে পারি না; আমাদের কাছে যা প্রতিভাত হয় তাই আমরা দেখি, যা সত্যিকারের বাস্তবত্ব তা জানি না।

আমাদের এর জবাব হলো কিভাবে উপরের যুক্তিটি আল্লাহ্‌র অনস্তিত্বের জন্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে? আমরা যদি সত্যিকারের হেতু, প্রকৃত হেতু বের না

www.pathagar.com

করতে পারি, তাহলে কি প্রকৃত হেতু নেই বলা ঠিক হবে? শিশু তো অনেক কিছুই অনুধাবন করে না, তাই সে সবকিছু নেই বলা যাবে না। হ্যাঁ, দৃষ্টবস্তু ও প্রকৃত বস্তুতে পার্থক্য হতে পারে। তবে তাতে প্রকৃত বস্তু নেই বলা যাবে না। কারো কারো কাছে সেই প্রকৃত বস্তু ধরা পড়তে পারে। কাজেই ঢালাও বলা যাবে না– কেউ প্রকৃত বস্তু দর্শন করে না। হ্যাঁ, ভ্রান্ত দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই হতে পারে। তবে সঠিক দৃষ্টি ও ধারণাও কারও কারও রয়েছে। আর তারাই ইসলামী পরিভাষায় নবী, রাসূল, পয়গাম্বর অর্থাৎ ইংরেজীতে যাদের বলা হয় 'প্রফেট'। কোরআন ও বাইবেলে এদের অনেকেরই নাম ও কর্মকাণ্ড বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা ভুল দেখেন নাই।

নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে কুরআন বলে, "অদৃশ্য তিনিই (আল্লাহ্ই) জানেন; আর তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া; আর তখন তাদের সামনে ও পিছনে (খোদায়ী) পাহারাদার থাকে এই জানার জন্যে যে, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছে কি না; তাদের সব কিছুকে তিনি ঘিরে রাখেন এবং প্রত্যেক জিনিসের তিনি হিসাব রাখেন।" (৭২ সূরা জীন ঃ ২৬–২৮ আয়াত)।

"এ কিতাবে (কুরআনে) উল্লিখিত মূসা (নবীর) কথা স্মরণ কর। সে ছিল শুদ্ধচিত্ত, আর সে ছিল রাসূল–নবী। তাকে আমি (আল্লাহ্) তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম আর গূঢ়তত্ত্ব জানাবার জন্য তাকে আমি কাছে এনেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।" (১৯ সূরা মারয়াম ঃ ৫১–৫৩ আয়াত)।

"প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল আর ওরা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিতর্কে মত্ত ছিল। তাই আমি (আল্লাহ্) ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ৫ আয়াত)।

"ওদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ওদের রাসূল আসত, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দেমাক করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদের ঘিরে ফেলল। তারপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বললো, 'আমরা এক আল্লাহ্তেই বিশ্বাস করলাম, আর আমরা তার সঙ্গে যাদের অংশী করতাম, তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।"

www.pathagar.com

"ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোনো উপকারে এল না। আল্লাহ্‌রই এ বিধান তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে আর এমনিভাবেই অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ৮৩–৮৫ আয়াত)।

"মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ্ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতভেদ করত। তারপর তারা যে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস করে, তাদের পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" (২ সূরা বাকারা ঃ ২১৩ আয়াত)।

"তোমার (মুহাম্মদের) কাছে আমি ওহী (রিভিলেশন) পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সোলায়মানের কাছে। আর আমি দাউদকে যাবুর (কিতাব) দিয়েছিলাম। আমি অনেক রাসূল (পাঠিয়েছি) যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি ও অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত কথা বলেছিলেন। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রাসূল পাঠিয়েছি যাতে রাসূল (আসার পর) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।" (৪ সূরা নিসা ঃ ১৬৩–১৬৫ আয়াত)।

"তুমি (মুহাম্মদ) তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি (আল্লাহ্) তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি। এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে এদের পূর্বে যে সব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, যাবুর (অবতীর্ণ কিতাব) ও দীপ্তিময় কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের প্রতিও তো তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ ২৩-২৫ আয়াত)।

"রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা। আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও মন্দকে পরিহার করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রসূল পাঠিয়েছি। তারপর ওদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন ও ওদের কতকের জন্য পথভ্রষ্টতাই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে সফর

www.pathagar.com

কর ও দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?" (১৬ সূরা নাহল ঃ ৩৫–৩৬ আয়াত)।

নবী-রাসূলদের সম্পর্কে উপরে কুরআন থেকে সামান্য কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। নবী–রাসূলগণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রকৃত বাস্তবতারই সাক্ষী দিয়ে গেছেন। তাঁদের কোন দৃষ্টিভ্রম হয় নাই; তাঁরা অপচ্ছায়া বর্ণনা করেন নাই। এই নবী-রাসূলগণ পাশ্চাত্যে সুপরিচিত। হকিং ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ যদি আরো কিছু গবেষণা করতেন, তাহলে তাঁরাও হয়ত সত্যের দর্শন পেতেন।

মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মহাবিশ্বের রহস্য দর্শন করিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 'আল-আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' পদবী পেয়েছিলেন। তাঁকে কেউ মিথ্যাবাদী পায় নাই। তিনি মহাবিশ্ব সফর করে বর্ণনা দিয়ে গেছেন যা অনেক নাস্তিক পণ্ডিতকে হতচকিত করতে পারে। অনেক মানুষের মহাবিশ্ব সফরের শক্তি বা সুযোগ না থাকলেও কারোই যে তা হবে না বা থাকবে না, এমন কথা নেই। সার্বভৌম সত্তা সে ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

কুরআন বলে, "পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি, (আল্লাহ্) তাঁর দাসকে (হযরত মুহাম্মদকে অলৌকিকভাবে) তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (জেরুযালেমের) মসজিদুল আকসায়, যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আশীর্বাদপুষ্ট। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।" (১৭ সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১ আয়াত)।

"স্মরণ কর, আমি (আল্লাহ্) তোমাকে (হযরত মুহাম্মদকে) বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। আমি যে, (অলৌকিক) দৃশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি, তা এবং কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে।" (১৭ সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৬০ আয়াত)।

"শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত, তোমাদের সংগী (হযরত মুহাম্মদ) বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না; এটি (কুরআন) তো ওহী (ডিভাইনি রিভিলেশন)– যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী (ফেরেশ্তা জিবরাঈল), প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে (হযরত মুহাম্মদ ফেরেশ্তা জিবরাঈলকে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছিলেন), অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো,অতি

www.pathagar.com

নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ও ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল একে অন্যের সন্নিকট হয়েছিলেন) অথবা ওরও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার (হযরত মুহাম্মদ) প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন। যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করে নাই; সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (ফেরেশতা জিবরাঈলকে) আরেকবার দেখেছিল (জিবরাঈলের পূর্ণ অবয়বে ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে) প্রান্তবর্তী (সীমান্তের) কুল বৃক্ষের নিকটে, যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া (বাসোদ্যান বা বাগান বাড়ী)। যখন বৃক্ষটি, যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা (আল্লাহর নূর দ্বারা) ছিল আচ্ছাদিত, তার (হযরত মুহাম্মদের) দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" (৫৩ সূরা নাজম ঃ ১–১৮ আয়াত)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সার্বভৌম আল্লাহ্ মহাবিশ্বের অলৌকিক নিদর্শন ও দৃশ্যাবলী দেখান– মি'রাজের রাত্রে এক অলৌকিক সফরে। এ ধরনের রাজকীয় সফর শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্যই নির্দিষ্ট। আমরা সাধারণ মানুষ দেখি নাই বলে একে অস্বীকার করা অযৌক্তিক হবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা দেখেছিলেন, তা ছিল বাস্তবতা (reality) যদিও তা অনেকের নিকট বোধগম্য নয়। একটি জিনিস সত্য হওয়ার জন্য তাকে প্রতিটি মানুষের দেখার প্রয়োজন পড়ে না। সাক্ষীর বিশ্বস্ততার উপর সাক্ষ্যের নির্ভরতা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ জীবনী নিরীক্ষায় অনুধাবন করতে পারা যায় যে, তিনি সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছেন। যার চোখে দূরবীক্ষণ তিনিই শুধু দূরবর্তী নক্ষত্র, নীহারিকা দেখতে সক্ষম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চক্ষে ছিল এমনই একটি সক্ষমতা যা সাধারণ মানুষের নেই।

হযরত ইবরাহীম, (আঃ) মহাবিশ্বের অলৌকিক দৃশ্যাবলী অবলোকন করেন। কুরআন বলে, "এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা (স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন ব্যবস্থা) দেখাই; আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" (৬ সূরা আন্'আম ঃ ৭৫ আয়াত)।

যোগ্যতা অনুসারে দর্শনশক্তি, দর্শন ইন্দ্রিয় শক্তির পার্থক্য সম্ভবপর। শিশুর দর্শন ও জ্ঞানীর দর্শন এক নয়। সাধারণ মানুষের দর্শন, রেডিওলজিস্টের (র নরশ্মি-বিশারদের) দর্শন এক নয়। অন্ধের দর্শন ও চক্ষুষ্মানের দর্শন এক নয়। অন্ধের হস্তি দর্শন একটি বহুল প্রচারিত অভিজ্ঞতার কাহিনী। আল্লাহ অন্ধ, বধির

www.pathagar.com

ও বোবা– অর্থাৎ জ্ঞানে যারা অন্ধ, বধির ও বোবা– তাদের কথা বলেছেন কুরআনে। তারা চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির এবং জিহ্বা থাকতেও সত্য স্বীকারে বোবা।

কুরআন বলে, "আমি(আল্লাহ্) তো বহু জীন ও মানুষকে জাহান্নামের ('হেল'-এর) জন্য সৃষ্টি করেছি (তাদের কুকর্মের ফল হিসাবে)। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, কান আছে তা দিয়ে তারা শোনে না– এরা পশুর মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। এরাই উদাসীন।" (৭ সূরা আরাফঃ ১৭৯ আয়াত)।

"তুমি (হযরত মুহাম্মদ) কি মনে কর যে, ওদের বেশীরভাগই শোনে বা বুঝে? ওরা তো পশুরই মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ ৪৪ আয়াত)।

"যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী কে? ওদের প্রতিপালকের সামনে ওদের হাজির করা হবে আর সাক্ষীরা বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল।' সাবধান! সীমালংঘনকারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও তার মধ্যে দোষত্রুটি খোঁজে, তারাই পরলোককে অস্বীকার করে। ওরা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না আর আল্লাহ ছাড়া ওদের অপর কোনো অভিভাবক নাই। ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে চাইতো না ও ওরা দেখতোও না। ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করে। আর ওরা যে অলীক কল্পনা করত, তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যায়। নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করেও তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। দুটো দলের উপমা অন্ধ ও বধিরের, আর যারা দেখতেও পায় ও শুনতেও পায়, তুলনায় দুটো কি সমান? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (১১ সূরা হূদ ঃ ১৮–২৪ আয়াত)।

"আর তাদের মধ্যেও কিছু লোক তোমার (হযরত মুহাম্মদ) দিকে কান পেতে থাকে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি (তাদের কর্মফলের জন্য) যেন তারা তা বুঝতে না পারে। তাদের বধির করেছি (অবাধ্যতার কারণে)। আর তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তর্ক শুরু করে তখন অবিশ্বাসীরা বলে, 'এতো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর

www.pathagar.com

তারা অন্যকে শুনতে বাধা দেয় ও নিজেরাও তার থেকে দূরে থাকে। আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদের ক্ষতি করে, তারা তো তা বুঝে না।" (৬ সূরা আন্‌আম ঃ ২৫–২৬ আয়াত)।

"যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন (সিলবদ্ধ করেছেন তাদেরকে কর্মফলের পরিণতিতে), তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (২ সূরা বাকারা ঃ ৬–৭ আয়াত)।

"তারা বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৮ আয়াত)।

"আর যারা অবিশ্বাস করে, তাদের উপমা ঃ কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না– তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৭১ আয়াত)।

কুরআনের এসব যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভ্রান্ত মানুষের নিকট সত্য, সত্য হিসাবে দেখা দেয় না। তারা ভুয়োদর্শনকেই সত্য বলতে চান। আর যারা সত্য দর্শনের সাক্ষী, তারা তাদের বিদ্রূপ করে।

সংশয়বাদী ও নাস্তিকেরা যাই বলুক ফলাফল (effects) থেকে কারণাবলী (causes) বের করা সম্ভবপর। যদি তা না করা যায়, তাহলে বলতে হবে নাস্তিকেরা যা চিন্তা করে, তার পিছনে তাদের মন ও মগজের কার্যকারণ নেই। নাস্তিকের চিন্তাধারা, লেখার পিছনে তার মনরূপী হেতু রয়েছে। নাস্তিক কিভাবে এখানে বলতে পারে, এই কারণ শুধু প্রতীয়মান (apparent), এটা মেকি বস্তু এবং সত্য নয়। এখানে একটি সত্যিকারের মনই প্রয়োজন, সত্যিকারের ফলাফল, যেমন– লেখা, বক্তৃতা পেতে। আর প্রতীয়মান বস্তু ও বাস্তবের পার্থক্য করলেও বাস্তবতা কোন না কোনভাবে এসেই যাচ্ছে। প্রতীয়মান বস্তুর কথা ভাবলে বাস্তব বস্তুরও প্রসঙ্গ এসে যায়। তা না হলে কিভাবে এ দুইয়ের ভিতর পার্থক্য, বিসাদৃশ্য নির্ণয় করা যাবে?

(১৩) সংশয়বাদীগণ বলেন যে, principle of causality (কার্যকারণের নীতি) যখন reality (বাস্তবতা) তে প্রয়োগ করা হয়, তখন দেখা যায় স্ব-বিরোধিতা; যেমন– পরবর্তী কার্যকারণের হিড়িক শুরু করতে একটি প্রাথমিক

www.pathagar.com

কার্যকারণ বা হেতু থাকতে হবে, কিন্তু প্রাথমিক কার্যকারণও হতে পারে না। কারণ সেও অন্য একটি পূর্ববর্তী কার্যকারণের মুখাপেক্ষী এবং এইভাবে অসীমভাবে পূর্ববর্তী কার্যকারণ প্রয়োজন হবে।

এ ধরনের যুক্তি উপরেও এসেছে। প্রাথমিক কার্যকারণ সম্ভবপর নয় বলা হচ্ছে। প্রাথমিক কার্যকারণ যদি না থাকে, তাহলে সার্বভৌমত্ব কার উপর আরোপিত হবে? সঠিক সার্বভৌমত্ব (রাজা-বাদশাহ্‌র মেকি সার্বভৌমত্ব নয়) খণ্ডিত হতে পারে না। আর হাজারটি প্রাথমিক কার্যকারণ তথা হাজারটি সার্বভৌম শক্তি হতে পারে না।

আসলে আল্লাহ এমনি একটি সত্তা যে, মানুষের যতটুকু জ্ঞান রয়েছে তা দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি কষ্টকরই বটে। আর সব মানুষের জ্ঞান ও যোগ্যতা এক নয়। কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখে না, শুনে না। হ্যাঁ, তবে কয়েকলক্ষ নবী পয়গম্বর (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার) আল্লাহ্ সম্পর্কে পৃথিবীতে নানা সাক্ষী প্রদান করেছেন। তাদের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই, যেমনি যুক্তি নেই হিউম, কাণ্ট, হকিং-এর সাক্ষ্য গ্রহণের। নবীদের সাক্ষীকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে হিউম, কাণ্ট ও হকিং-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে? নবীগণ অতীতে যা বলেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত একই বক্তব্য প্রদান করেছেন। অন্যদিকে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতের ও তত্ত্বের করেছেন বহু পরিবর্তন। পরিবর্তনশীল মত ও তত্ত্ব কি পরিবর্তনহীন মত ও তত্ত্বের সমকক্ষ হতে পারে? সত্য সত্যই, আর তা একটিই; মিথ্যা বহু।

হেতুবাদের কোন স্ব-বিরোধিতা নেই। হেতুবাদ তো বলে না, সবকিছুর কারণ আছে। সবকিছুর কারণ আছে বললে তো আল্লাহর অস্তিত্বেরও কারণ বা হেতু আবিষ্কার করতে হবে। 'সবেরই হেতু আছে' না বলে বলতে হবে, সব সসীম, অপূর্ণ বস্তুর কারণ রয়েছে। প্রাথমিক কারণ হলো অসীম, পূর্ণ ও সার্বভৌম। প্রাথমিক কারণের কোন কারণ নেই; সসীম বস্তু বা সত্তার কারণ প্রয়োজন। সার্বভৌম, প্রয়োজনীয় সত্তা শুধু আছে, অবস্থান করছে। এটি নেই, অবস্থান করছে না, অস্তিত্বে নেই– বলা যাবে না। নির্ভরশীল, অসার্বভৌম, সসীম, অপূর্ণ বস্তু বা সত্তার অস্তিত্বের হেতু আবশ্যক। কাজেই সার্বভৌম সত্তা কেন রয়েছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। একটি সরল রেখা সোজা কেন? এটি কোন প্রশ্ন হয় না। এটি সোজা, সোজা হওয়াই এর ধর্ম। সেইরূপ সার্বভৌম, পূর্ণ, অসীম সত্তা

www.pathagar.com

শুধু রয়েছে– "It would just BE"। এই গুণটি কোন সসীম, অপূর্ণ, নির্ভরশীল, অসার্বভৌম বস্তু বা সত্তাকে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

যা সৃষ্ট তা খোদা হতে পারে না– এটাই মানব স্বভাবজ্ঞান ও বিবেকের দাবী। এই দাবীটাকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই মনে হয় ফ্রান্সের নাস্তিক লেখক ও দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে তাঁর 'অস্তি নাস্তি' (being and Nothingness) গ্রন্থে বলেছেন যে, 'ঈশ্বর যদি তাঁর স্বসত্তার কারণ হন তাহলে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকে তাঁর স্বসত্তা থেকে একটা দূরত্বে অবস্থান করতে হবে এবং এর ফলে ঈশ্বরের সত্তা সাপেক্ষ হয়ে পড়বে। কিন্তু যা সাপেক্ষ তা ঈশ্বর হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নাই। অথবা অপরদিক থেকে যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ নন, তাহলে বলতে হবে যে, তাঁর অস্তিত্ব নেই; কেননা অস্তিত্ব অর্থই সাপেক্ষতা (Contingency)। কিন্তু যে অস্তিত্বের বিতর্ক এখানে উপস্থাপন করেছেন সার্ত্রে, তা সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব, যা সাপেক্ষ ও নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে খোদার ধারণাই ব্যক্ত করে যে, খোদা থাকলে তাঁর অস্তিত্ব হবে নিরপেক্ষ, অনির্ভরশীল ও অনিবার্য। সার্ত্রে অন্ততঃ একটা সত্য প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, সাপেক্ষতা বা নির্ভরশীলতা খোদার অস্তিত্বের বিরোধী। কারণ, এটাই যে মানবের স্বভাবের কথা।

হিউমের সংশয়বাদের পক্ষের যুক্তি তাঁর *'Dailogues Concerning Natural Religion',* Indianapolis: Bobbs- Merrill, 1962, এবং তাঁর *'Enquiry Concerning Human Understanding,'* Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1955, গ্রন্থদ্বয়ে এবং কান্টের যুক্তিসমূহ তাঁর *"Critique of Pure Reason,'* অনুবাদ L. W. Beck, Newyork: Bobbs-Merrill, 1950.তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংশয়বাদীগণের যুক্তিসমূহ নাস্তিকগণ গ্রহণ করেছেন স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণে। এদিকে নাস্তিক পণ্ডিতগণও নানা যুক্তি-অযুক্তির ধূম্রজাল বিস্তার করেছেন। সে সব বিতর্ক আমরা এ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যাব।

(১৪) এক নাস্তিক পণ্ডিত যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বলা হয়, গড্ হলেন necessary (uncaused) being অপরিহার্য, জন্মবিহীন জৈবিক সত্তা, কিন্তু অপরিহার্যতা জৈবিক সত্তার জন্য প্রযোজ্য নয়, তাই গডের কোন অস্তিত্ব নেই। (সূত্র: J. N. Findlay, "Can God's Existence Be Disproved" in the *Ontological Argument*, Alvin Plantingua, ed. garden city, N. Y : Doubleday, 1965, P. 111f.)। তার্কিক আরো বলতে চান যে, necessity (অপরিহার্যতা) প্রয়োগ হয় Propositions এ (প্রস্তাব, বর্ণনা, প্রতিজ্ঞায়), being

www.pathagar.com

(জৈবিক সত্তা) অথবা reality তে (বাস্তব সত্তায়) নয়।

নাস্তিক পণ্ডিত যা বোঝাতে চান তা স্পষ্ট নয়। তিনি শুধু গোলকধাঁধাই সৃষ্টি করেছেন, সোজা কথা না বলে। Necessity (অপরিহার্যতা) being -এ (জৈবিক সত্তায়) প্রয়োগ হতে পারে না বলে তিনি কি বুঝাতে চান? সন্তান উৎপাদনের জন্য মাতৃগর্ভ অপরিহার্য তা কি তিনি অস্বীকার করেন? মাতা কি being (জৈবিক সত্তা), না proposition (প্রস্তাব, বর্ণনা, প্রতিজ্ঞা)? অস্পষ্টতার ধাঁধায় তার্কিক অপরিহার্য স্রষ্টাকেই বেমালুম গায়েব করে দিতে সচেষ্ট।

(১৫) ফরাসী নাস্তিক লেখক Jean Paul Sarrtre তাঁর *Being and Nothingness* (Newyork: Washington Square Press, 1966,PP 758, 762) পুস্তকে লেখেন, যেহেতু গড্ একজন self-caused (স্বয়মুৎপন্ন বা স্বয়ম্ভু) সত্তা, কিন্তু নিজের সত্তা নিজেই সৃষ্টি অসম্ভবপর এবং কেউ তার অস্তিত্ব আনয়নের পূর্বে অবস্থান করতে পারে না, তাই গড-এর অস্তিত্ব নেই।

জাঁ পল সার্ত্রে বলেছেন যে, স্রষ্টা তাঁর নিজের সৃষ্টি নিজেই করেছেন। ঘটনা কি সত্যি তাই? স্রষ্টা কি তবে এক সময় ছিলেন না, হঠাৎ এ সময়ে জন্ম নিলেন? ব্যাপারটা তা নয়। মানুষের সৃষ্টি, জীব-জন্তুর সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষ, জীবজন্তু সার্বভৌম নয়; কিন্তু স্রষ্টা সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম। কোন বিশেষ মুহূর্তে জন্ম হলে তাঁকে কিভাবে সার্বভৌম বলা যাবে? এখানে "It would just be" (উনি শুধু আছেন) এই যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। মানুষ স্রষ্টাকে বুঝতে দুনিয়ার উপমা টান্‌তে পারে, তবে কি না দুনিয়ার উপমাসমূহ স্রষ্টার সত্তা অনুধাবনে যথেষ্ট নয়।

(১৬) ডেভিড হিউম তাঁর "Dialogues, Part VIII এক লেখেন যে, মহাবিশ্বকে design (পরিকল্পনা) করে সৃষ্টি করা হয় নাই অর্থাৎ কিনা কোন ডিজাইনার অর্থাৎ নকশাকারক, উদ্ভাবক নেই। তাঁর যুক্তি হলো– মহাবিশ্ব হয় পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা ঘটনাচক্রে হঠাৎ করে সৃষ্ট; আর chance (ঘটনাচক্র, দৈবাৎ বা আকস্মিকতা) মহাবিশ্ব সৃষ্টির adequate cause (পর্যাপ্ত কার্যকারণ)।

এর জবাবে বলা যায় যে, মহাবিশ্ব আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হলেও, এ আকস্মিকতা সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন। "বিগ ব্যাংগ" (মহাবিস্ফোরণ) থেকেও যদি দৈবাৎ মহাবিশ্ব হয়ে থাকে, এই দৈবাৎ মহাবিস্ফোরণের একজন

www.pathagar.com

কার্যকারক রয়েছেন। কুরআন বলে, "তিনি (আল্লাহ) জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'হও' তখন তা হয়ে যায়।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ৬৮ আয়াত)।

"আমি (আল্লাহ্) কোন কিছু চাইলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' তখন তা হয়ে যায়।" (১৬ সূরা নাহল ঃ ৪০ আয়াত)

"আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা; আর যখন তিনি কিছু করতে ঠিক করেন শুধু বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১১৭ আয়াত)।

ডেভিড হিউম শুধু আকস্মিকতাকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি design (পরিকল্পনা)কে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু একটি বাদ দিয়ে শুধু অন্যটিকে গ্রহণের জ্ঞান বা ক্ষমতা তাঁকে কে দিয়েছেন? মহাবিশ্ব যে পরিকল্পনায় সৃষ্ট তার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। কুরআন বলে,

"আমি (আল্লাহ্) আকাশ ও পৃথিবীর আর ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে (যা আল্লাহর বিশেষ দিন হতে পারে, পৃথিবীর নয়, কারণ দিন একটি আপেক্ষিক শব্দ)। আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (৫০ সূরা ক্বাফ ঃ ৩৮ আয়াত)।

"যিনি (আল্লাহ) নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের মত (মানুষ) সৃষ্টি করতে পারেন না। হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন 'হও', তখন তা হয়ে যায়। তাই পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১-৮৩ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ) যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কবেছেন, যখন তিনি বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য।" (৬ সূরা আনআম ঃ ৭৩ আয়াত)।

তিনি (আল্লাহ) সুপরিকল্পিতভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে ও দিনকে দিয়ে রাত্রিকে ঢেকে রাখেন। চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মের করেছেন অধীন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৫ আয়াত)।

"আল্লাহ্ই সপ্তাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এইভাবে আকাশ ও

www.pathagar.com

পৃথিবীর সকল স্তরে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে। তাই তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, আর সমস্ত কিছুই তাঁর জানা।" (৬৫ সূরা তালাক ঃ ১২ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ্) ঊষার উন্মেষ ঘটান। আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।" (৬ সূরা আনআম ঃ ৯৬ আয়াত)।

"তিনিই (আল্লাহ্ই) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্বাস করে ও কেউ কেউ বিশ্বাস করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই দেখেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে ও তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর, আর প্রত্যাবর্তন তো তারই কাছে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর; আর তিনি তো অন্তর্যামী।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ ২-৪ আয়াত)।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ "সুপরিকল্পিতভাবে" "যথাযথ" ভাবে মহাবিশ্বকে করেছেন "সুবিন্যস্ত"। আল্লাহ খেলার ছলে দৈবাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই। কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ) আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই। তাই অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের (দোযখের) শাস্তি।" (৩৮ সূরা সোয়াদ ঃ ২৭ আয়াত)।

"আমি (আল্লাহ্) আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের মাঝে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এ দুটোকে অযথা সৃষ্টি করিনি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই এটা জানে না।" (৪৪ সূরা দুখান ঃ ৩৮-৩৯ আয়াত)।

"আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের মাঝে কোনো কিছুই আমি (আল্লাহ্) ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি চিত্তবিনোদনের (ক্রীড়ার) উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি। বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি; মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই আর তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য! আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা তাঁরই। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না ও ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিন-রাত্র তাঁর পবিত্র মহিমা

www.pathagar.com

কীর্তন করে; তারা শৈথিল্য করে না।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ ১৬-২০ আয়াত)।

দৈবাৎ তত্ত্ব বা পরিকল্পনাহীনতা তত্ত্ব যে বাস্তব নয়, তা উপরোক্ত ব্যাখ্যাতে আরো সুস্পষ্ট।

(১৭) গড্-এর অনস্তিত্বের একটি নৈতিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন নাস্তিকগণ (সূত্র ঃ Pierre Bayle, *Selections from Bayle's dictionary,* trans. by R. H. Popkin, Indianapolis: Bobbs— Merrill, 1965, P. 1571)। বলা হচ্ছে ঃ যদি স্রষ্টা all-good (সর্ব মঙ্গলকামী), তাহলে তিনি অমঙ্গলকে ধ্বংস করবেন; তিনি যদি all-powerful (সর্বশক্তিমান) হন, তাহলে তিনি অমঙ্গলকে ধ্বংস করবেন। কিন্তু অমঙ্গল ধ্বংস হয় নাই, কাজেই স্রষ্টা নেই।

যুক্তিটি আপাততঃ মধুর। এই নাস্তিক পণ্ডিতগণ পৃথিবী ও বেহেশ্‌তের তফাতটা লোপাট করে ফেলেছেন। তাঁরা দোযখের প্রয়োজনীয়তাও বেমালুম ভুলে গেছেন। স্রষ্টা তো নিমিষে অমঙ্গল নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, তবে তিনি তা করেন না কতগুলি কারণের জন্য। এসব কারণ কুরআনে স্রষ্টা স্পষ্ট করেছেন।

আল্লাহ্ শুধু সর্বমঙ্গলকামী ও সর্বশক্তিমানই নন। তার আরো গুণ রয়েছে। ইসলামে আল্লাহর বহু নাম রয়েছে, যার সবই গুণবাচক। আল্লাহর্ শুধু সর্বমঙ্গলকামী ও সর্বশক্তিমান গুণাবলীতে থামা যায় না। বাকীগুণগুলোর কি হবে? অমুসলিম পাঠকদের ঔৎসুক্যের জন্য আমরা সেই গুণবাচক নামগুলি হাজির করছি ঃ

১। আল্লাহ (একমাত্র উপাস্য)। এই নামটি আল্লাহর বিশেষ নাম। সকল নামের মধ্যে এই নাম সর্বশ্রেষ্ঠ। 'আল্লাহ্' শব্দে দুনিয়ার অপর কাউকেও বুঝায় না, অন্য কোন শব্দে এর যথাযথ অনুবাদ হতে পারে না। এটি লিঙ্গ ও বচন হতেও সম্পূর্ণ মুক্ত। এই নামে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকর্তা একমাত্র উপাস্যকেই বুঝায়।

২। আর্-রাহমানু (অতি অনুগ্রহকারী)।

৩। আর্-রাহীমু (পরম দয়ালু)।

৪। আল-মালিকু (সর্বময় কর্তা বা প্রভূ)।

৫। আল-কুদ্দুসু (অতি পবিত্র)।

৬। আস্-সালামু (শান্তিময়, শান্তিদাতা)।

www.pathagar.com

৭। আল্-মু'মিনু (বিশ্বাসী)।

৮। আল্ মুহাইমেনু (পরম সাহসী, সত্য সাক্ষী)।

৯। আল্-আযীযু (পরাক্রমশালী)।

১০। আল্-জাব্বারু (ক্ষমতাশালী)।

১১। আল্-মুতাকাব্বেরু (গৌরবান্বিত)।

১২। আল্-খালেকু (সৃষ্টিকর্তা)।

১৩। আল্-বারিউ (ত্রাণকর্তা)।

১৪। আল্-মুসাওভিরু (আকৃতি গঠনকর্তা)।

১৫। আল্-গাফফারু (মার্জনাকারী)।

১৬। আল্-কাহহারু (প্রবল পরাক্রান্ত বা মহাশক্তিদাতা)।

১৭। আল্ ওয়াহ্হাবু (অতিবড় দাতা বা সৎকার্যে পুরস্কারদাতা)।

১৮। আর-রায্যাকু (রিযিকদাতা বা অন্নদাতা)।

১৯। আল-ফাত্তাহু (মহাবিজয়ী বা প্রশস্তকারী)।

২০। আল-আ'লীমু (মহাজ্ঞানী)।

২১। আল-ক্বাবেযু (ধারণশীল বা আয়ত্তকারী)।

২২। আল-বাসেতু (প্রসারকারী)।

২৩। আল-খাফিযু (অপদস্থকারী বা রোধকারী)।

২৪। আর্-রাফিউ (উন্নতিদাতা)।

২৫। আল্-মুই'যযু (সম্মানদাতা)

২৬। আল্-মুযিল্লু (হীনকারী)।

২৭। আস্-সামীউ (অতি শ্রবণকারী)

২৮। আল-বাসীরু (সর্বদ্রষ্টা)।

২৯। আল-হাকামু (সুবিচারক বা আদেশ প্রদানকারী)।

৩০। আল-আদ্লু (ন্যায় বিচারক)।

৩১। আল্-লাতীফু (অতি সূক্ষ্মতম বা কোমলান্তঃকরণময়)

৩২। আল-খাবীরু (সর্বজ্ঞ বা সর্বজ্ঞানময়)।

৩৩। আল-হালীমু (অধিক ধৈর্যশীল বা স্থিতিশীল অচঞ্চল)।

www.pathagar.com

৩৪। আল-আযীমু (অতি মহান উন্নত)।

৩৫। আল-গাফুরু (অতি ক্ষমাশীল)।

৩৬। আশ-শাকূরু (অতি কৃতজ্ঞ বা কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী)।

৩৭। আল-আলিয়্যু (সর্বোচ্চ বা উন্নত)।

৩৮। আল-কাবীরু (বৃহত্তম বা গৌরবান্বিত)।

৩৯। আল-হাফীযু (রক্ষাকারী)।

৪০। আল-মুকীতু (শক্তিদাতা)।

৪১। আল-হাসীবু (হিসাব গ্রহণকারী)

৪২। আল-জালীলু (মহা প্রতিপত্তিশালী বা মহিমান্বিত)।

৪৩। আল কারীমু (সম্মানী বা অনুগ্রহকারী)।

৪৪। আর্ রাকীবু (শ্রেষ্ঠ প্রহরী)।

৪৫। আল-মুজীবু (কবুলকারী বা প্রার্থনা গ্রহণকারী)।

৪৬। আল-ওয়াসেউ (বিস্তারকারী)।

৪৭। আল-হাকীমু (মহাবিজ্ঞ বা মহাজ্ঞানী)।

৪৮। আল-ওয়াদুদু (শ্রেষ্ঠ বন্ধু)।

৪৯। আল-মাজীদু (সম্মানিত, পবিত্র, মহিমান্বিত)।

৫০। আল-বায়েসু (পুনরুত্থানকারী)।

৫১। আশ্-শাহীদু (সাক্ষ্য দানকারী)।

৫২। আল-হাক্কু (একান্ত সত্য)।

৫৩। আল-ওকীলু (যিম্মাদার বা কার্যকারক)।

৫৪। আল-কা'বিইয়্যু(অতি শক্তিশালী)।

৫৫। আল-মুবীনু (প্রকাশকারী)।

৫৬। আল-ওলিইয়্যু (বন্ধু, সাহায্যকারী)।

৫৭। আল-হামীদু (প্রশংসিত)।

৫৮। আল-মুহসিয়্যু (সর্বব্যাপৃত বা সর্বজ্ঞানী)।

৫৯। আল-মুব্দিউ (প্রথম সৃজনকারী)।

৬০। আল-মুঈ'দু (প্রত্যর্পণকারী বা প্রত্যাবর্তনকারী)।

www.pathagar.com

৬১। আল-মুহইয়্যু (হায়াতদাতা অর্থাৎ জীবনদাতা)।

৬২। আল-মুমীতু (মৃত্যুদাতা)।

৬৩। আল-হাইয়্যু (অমর)।

৬৪। আল-কাইয়ুমু (চিরস্থায়ী)

৬৫। আল্-ওয়াহেদু (অদ্বিতীয়)।

৬৬। আল-মাজেদু (মর্যাদাশীল)।

৬৭। আল-আহাদু (একক)।

৬৮। আস-সামাদু (একাধিপতি বা অপ্রত্যাশী ও অভাবহীন)

৬৯। আল-কা'দেরু (সর্বশক্তিমান)।

৭০। আল-মুক'তাদেরু (শক্তির আধার)।

৭১। আল-মুকা'দ্দিমু (অগ্রণী, অগ্রসরকারী)।

৭২। আল-মুওয়াখ্খেরু (পশ্চাদ্‌বর্তীকারী)।

৭৩। আল-আওয়ালু (সবার প্রথম অর্থাৎ আদি)।

৭৪। আল-আখেরু (অনন্ত, সবার পরে যিনি থাকবেন)।

৭৫। আয্-যাহেরু (প্রকাশ্য–কুদরতের ভিতর দিয়া)।

৭৬। আল-বাতেনু (অপ্রকাশ্য– চর্মচক্ষুর অন্তরালে)।

৭৭। আল-ওয়ালীউ (অধিপতি বা বন্ধু)।

৭৮। আল-মুতাআ'লী (সর্বপ্রধান, মহাউন্নত)।

৭৯। আল-বাররু (ন্যায়পরায়ণ, মঙ্গলময়,শান্তি ও মঙ্গলদাতা)।

৮০। আত-তাওয়াবু (ক্ষমা মঞ্জুরকারী)।

৮১। আল-মুন্‌তাকিমু (প্রতিফলদাতা)।

৮২। আল-আফু'উভু (মার্জনাকারী)।

৮৩। আর-রাউফু (অত্যন্ত কৃপাশীল, অন্তরঙ্গ বন্ধু)।

৮৪। মালিকুল মুল্‌কে (জগতপতি)।

৮৫। যাল জালালে ওয়াল ইকরাম (শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময়)।

৮৬। আল-মুক্‌সিতু (সুষ্ঠু নিয়ন্তা, ন্যায়পরায়ণ)।

৮৭। আল-জামে'উ (একত্রিতকারী)।

৮৮। আল-গানিইয়্যু (সম্পদশালী, ভ্রূক্ষেপহীন)।

www.pathagar.com

৮৯। আল-মুগ্‌নিয়্যু (সম্পদদাতা, অভাব মোচনকারী)।

৯০। আল-মুতিইয়্যু (দানশীল, দাতা)।

৯১। আল-মানেউ (নিষেধকারী, নিবারক)।

৯২। আয-যার্‌রু (বিপদগ্রস্তকারী, লোকসানদাতা, বিপদদাতা)।

৯৩। আন্‌-নাফেউ (উপকারী, সুফলদাতা)।

৯৪। আন্‌-নূর (জ্যোতির্ময়)।

৯৫। আল-হাদিউ (সৎপথ-প্রদর্শক)।

৯৬। আল-বাদীউ (বিনা অনুকরণে সর্বপ্রথম স্রষ্টা)।

৯৭। আল-বাকি'উ (চিরস্থায়ী, অনন্ত ও সর্বদা বিরাজমান)।

৯৮। আল-ওয়ারেসু (সবকিছুর স্বত্বাধিকারী)।

৯৯। আর-রাশীদু (সত্যের দিশারী, সৎপথ প্রদর্শক)।

১০০। আল-মাতীনু (দৃঢ়, অটল)।

১০১। আল-মোন্‌ইমু (নেয়ামতদাতা, সম্পদদাতা)।

১০২। আর-রাব্বু (প্রতিপালক)।

১০৩। আস-সাবুরু (ধৈর্যশীল)।

১০৪। আস-সাদিকু (সত্যবাদী)।

১০৫। আস্‌-সাত্তারু (দোষ গোপনকারী)।

১০৬। আলওয়াজিদু (ক্ষমতাবান)।

১০৭। আল-হান্নানু ওয়াল মান্নানু (স্নেহশীল দাতা)।

মৌলভী মোহাম্মদ শামসুল হুদা তাঁর "নেয়ামুল কোরআন" গ্রন্থে (মোহাম্মদী বুক হাউস, পাটুয়াটুলী, ঢাকা) প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "পাক কোরআন মজীদে আল্লাহতায়ালার অনেকগুলি পবিত্রতম গৌরবান্বিত নামের উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে আল্লাহতায়ালার ৯৯টি অতি উত্তম নাম বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সমস্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন– তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ (اللہ) তাহার খাস্‌ নাম। আল্লাহ্‌তায়ালার ৪ হাজার সিফতি (গুণবাচক) নাম আছে, তন্মধ্যে তিনশত নাম (হযরত মূসার) তৌরাতে, তিনশত নাম (হযরত দাউদের) যাবুরে, তিনশত নাম ইঞ্জিলে (বাইবেলে) ও একশত অতি উত্তম নাম পাক 'কোরআন মজীদে' বিদ্যমান আছে।"

www.pathagar.com

কথা হলো স্রষ্টা হলেন মঙ্গলদাতা, শান্তিদাতা ও সর্বশক্তিমান, শক্তির আধার, পরাক্রমশালী বা ক্ষমতাশীল, অতিশক্তিশালী, সেই সঙ্গে তিনি মহা শাস্তিদাতা, অপদস্থকারী, হীনকারী, সুবিচারক, ন্যায়-বিচারক, অধিক ধৈর্যশীল, অতি ক্ষমাশীল, হিসাব গ্রহণকারী, ন্যায়পরায়ণ, ফলদাতা ইত্যাদি। জগতে অমঙ্গল রয়েছে তা স্রষ্টা অবগত। কখন সে অমঙ্গলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে হবে তাও তিনি জানেন। নাস্তিকের কথা অনুযায়ী এক্ষনি অমঙ্গল নিশ্চিহ্ন না হলে, স্রষ্টা নেই– কিভাবে বলা যাবে? যে আদর্শ অবস্থার কল্পনা করেন নাস্তিক পণ্ডিতগণ তা বেহেশ্‌তে (স্বর্গ বা প্যারাডাইসে) কল্পনা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে স্রষ্টা ভাল-মন্দের, মঙ্গল-অমঙ্গলের, পাপ-পুণ্যের, দোষ-গুণের, সৎ-অসতের, সত্য-মিথ্যার অবস্থা রেখেছেন। আর স্রষ্টা ধৈর্যশীল বলে তৎক্ষণাৎ ফলাফল দিচ্ছেন না। তবে এটি ভাবার কোন যুক্তি নেই যে, অসতের ফলাফল সে পাবে না। শুধু সময়ের ব্যাপার আর কি। বেহেশ্‌তের অবস্থাই যদি পৃথিবীতে থাকে, তাহলে স্রষ্টার পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্য ব্যর্থ হবে–একটি ডুপ্লিকেট 'বেহেশ্‌ত' পৃথিবী নাম দিয়ে সৃষ্টির কি কোন প্রয়োজন রয়েছে? আদম-হাওয়াকে বেহেশ্‌তে রাখলেই পারতেন স্রষ্টা। স্রষ্টাকে শুধু মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান গুণের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা হলে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হয়ে যাবে, আর অসার্বভৌম শক্তি স্রষ্টা নয়।

এখন আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা না থাকলে অমঙ্গলকারীগণ তাৎক্ষণিক ফলাফল পেত। কুরআন বলে, "তিনি (আল্লাহ্) তাঁর দাসদের (মানুষের) অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন, আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ২৫ আয়াত)।

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমা করে দেন।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ৩০ আয়াত)।

"যারা অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজ করে, তার পরে অনুশোচনা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তো তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (১৬ সূরা নাহল ঃ ১১৯ আয়াত)।

"আর আল্লাহ্ তো এমন নন যে, তুমি (হযরত মুহাম্মদ) তাদের মধ্যে থাকবে তবু তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, আর তিনি এমন নন যে, তারা ক্ষমা

www.pathagar.com

চাইবে তবু তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।" (৮ সূরা আনফাল ঃ ৩৩ আয়াত)।

"তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ছোটখাটো পাপগুলো আমি (আল্লাহ্) মোচন করব ও তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেব।" (৪ সূরা নিসা ঃ ৩১ আয়াত)।

"আর মানুষের সীমা লঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানেও কঠোর।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ ৬ আয়াত)।

"তোমাদের জন্য আল্লাহর কৃপা ও দয়া না থাক্‌লে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না (তোমাদের অন্যায় কর্মের জন্য) এবং আল্লাহ তাওবা (অনুশোচনা) গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।" (২৪ সূরা নূর ঃ ১০ আয়াত)।

"তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা না থাকলে ও আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও দয়াময় না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সব দেখেন, সব জানেন।" (২৪ সূরা নূর ঃ ২০-২১ আয়াত)।

"দুনিয়া ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।" (২৪ সূরা নূর ঃ ১৪ আয়াত)।

কষ্ট, অমঙ্গলের পরে মঙ্গল রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধানে। তাই কুরআন বলে,

"কষ্টের সাথেই তো আসান (স্বস্তি) আছে, অবশ্য কষ্টের সাথেই আসান আছে। অতএব, যখনই অবসর পাও সাধনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।" (৯৪ সূরা ইনশিরাহ ঃ ৫-৮ আয়াত)।

"আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেন।" (৬৫ সূরা তালাক ঃ ৭ আয়াত)।

নির্দিষ্টকাল না থাকলে আল্লাহ তাৎক্ষণিক অমঙ্গলকে, অন্যায়কে, পাপকে বিনাশ করতেন। তাই তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তার মানুষকে তাদের কৃতকর্মের

www.pathagar.com

জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর লক্ষ্য রাখেন।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ ৪৫ আয়াত)।

"তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে (তাৎক্ষণিক শাস্তি না দেওয়ার) ও নির্ধারিত কাল না থাকলে শাস্তি তো এসেই যেতো।" (২০ সূরা তা'হা ঃ ১২৯ আয়াত)।

"এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ১৪ আয়াত)।

"আল্লাহ্ যদি মানুষকে তার সীমা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরী বা তাড়াহুড়ো করতে পারে না।" (১৬ সূরা নাহল ঃ ৬১ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও তিনি তোমাদের অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আল্লাহ্র নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তার দেরী হয় না, যদি তোমরা এ জানতে।" (৭১ সূরা নূহ ঃ ৪ আয়াত)।

যেহেতু আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলকামী, তাই তিনি ধৈর্যহীনদের ন্যায় তাৎক্ষণিক পৃথিবীতে ফলাফল দেন না। এতে মানুষ রক্ষাই পেয়েছে, নইলে কম মানুষই ভুলত্রুটির জন্য অব্যাহতি পেত। আল্লাহ্ ধৈর্যশীল ও তত্ত্বজ্ঞানীও বটে।

বিপদ-আপদ যা আসে, তার কিছু কারণ মানুষের কৃতকর্ম, আর কিছু আল্লাহ্র পরীক্ষা। কুরআন বলে,

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।" (৪২ সূরা শূরা ঃ ৩০ আয়াত)।

"(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই আর নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব।' এই সব লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই

www.pathagar.com

সৎপথ পাবে।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৫৬-১৫৭ আয়াত)।

"তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে (সংঘর্ষের মাধ্যমে)। আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না। (৩ সূরা 'আলে ইমরান' ঃ ১৪০ আয়াত)।

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই তা লেখা হয়। আল্লাহ্র পক্ষে এ খুবই সহজ। এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও আর যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য খুশীতে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ ভালবাসেন না, উদ্ধত অহঙ্কারীদের।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ ২২-২৩ আয়াত)।

আল্লাহ্ মঙ্গলের উৎস হলেও পৃথিবীতে অমঙ্গল নানা কারণে রয়েছে। আর তাও আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতারই অংশবিশেষ। ভালো-মন্দ নিয়ে স্রষ্টার বক্তব্য রয়েছে। স্রষ্টা ভালোই চান, তবু মন্দ হয়। কখনও মন্দের জন্য দায়ী মানুষই, আর কখনও তা মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। স্রষ্টা ভালো দিয়ে মন্দকে অপসারণ করতে নির্দেশ দেন। ভালো-মন্দের কর্মফল স্রষ্টার নিকট রয়েছে মানুষের জন্য।

কুরআন বলে, "পৃথিবীতে আমি (আল্লাহ্) তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তাদের কেউ কেউ সৎকর্ম করে ও কেউ কেউ অন্যরূপ। ভালো-মন্দ দিয়ে আমি (আল্লাহ্) তাদের পরীক্ষা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।" (৭ সূরা আরাফ ঃ ১৬৮ আয়াত)

"মানুষ যেভাবে ভালো চায় সেইভাবেই মন্দ চায়; মানুষের বড় তাড়াহুড়ো।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১ আয়াত)।

"আল্লাহ্ যদি মানুষের মন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতেন যেভাবে তারা তাদের ভালো তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চায়,তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ ১১ আয়াত)।

"আল্লাহ্ যদি তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের ভালো করেন, তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান। আর তিনি পরাক্রমশালী নিজের দাসদের (মানুষের) ওপর। আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও ওয়াকিফহাল।" (৬ সূরা আনআম ঃ ১৭-১৮ আয়াত)।

www.pathagar.com

"কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাতে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে; আর তাদের ওপর যুলুম করা হবে না।" (৬ সূরা আনআম ঃ ১৬০ আয়াত)।

"ভালো-মন্দ সমান হতে পারে না। ভালো দিয়ে মন্দকে বাধা দাও।" (৪১ সূরা হামীম সিজ্‌দা ঃ ৩৪ আয়াত)।

" যে সৎকাজ করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে।" (৪১ সূরা হামীম সিজ্‌দা ঃ ৪৬ আয়াত)।

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদের-মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষ করে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই (আল্লাহ্‌র) কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। যা ভালো তা দিয়ে তুমি মন্দ কথার জবাব দাও। ওরা যা বলে, আমি তা ভালো করেই জানি।" (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ ৯৬ আয়াত)।

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪ আয়াত)।

". . . আর যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ ২২ আয়াত)।

"বলো, "ভালো ও মন্দ এক নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই, হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (৫ সূরা মায়িদা ঃ ১০০ আয়াত)।

"আর তাদের ভালো হলে তারা বলে, 'এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' আর তাদের কোনো মন্দ হলে তারা বলে, এ তোমার জন্য।' বলো, সবই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না। তোমার যা ভালো হয় তা আল্লাহর কাছ থেকে আর যা মন্দ হয় তা তোমার নিজের কারণে।" (৪ সূরা নিসা ঃ ২ আয়াত)।

বিপদাপদ যদিও আল্লাহতাআলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের (শাস্তির) নমুনা

www.pathagar.com

হয়ে থাকে– যা পরকালে তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বস্তুতঃ পরকালের শাস্তি এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত– যা পরকালে তার মুক্তির কারণ। এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "কোনো বিপদ এমন নেই– যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তা-ও।"

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার (মানুষের) উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়। (তাফসীর মা আরেফুল কোরআন সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৭)।

মন্দের দৌড় সীমিত। আল্লাহ মন্দকে শেষতক পাকড়াও করবেনই।

কোরআন বলে, "যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের ধারণা খারাপ। যে আল্লাহর সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্র নির্ধারিত কাল আস্‌বেই। তিনি (আল্লাহ্) সব শোনেন, সব জানেন।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ ৪-৫ আয়াত)।

কর্মফল অনুযায়ী মানুষকে তার পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে। দু'ধরনের ফলাফল হয়েছে বলে আল্লাহ্ নেই বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। মানুষরূপী বোধসম্পন্ন জীবের জন্য স্রষ্টার এই নির্ধারিত ব্যবস্থা।

কুরআন বলে, "আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে আল্লাহ্রই। যারা মন্দ কাজ করে তাদের দেন তিনি মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তাদের দেন উত্তম পুরস্কার।" (৫৩ সূরা নাজম ঃ ৩১ আয়াত)।

"কেউ কারোর বোঝা বইবে না। তার কাজের পরীক্ষা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে।" (৫৩ সূরা নাজম ঃ ৩৮–৪১ আয়াত)।

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে ভালো ও আরও কিছু। কালিমা ও হীনতা ওদের মুখকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ আর তাদের হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ ওদের

www.pathagar.com

রক্ষা করার থাক্‌বে না। ওদের মুখ যেন অন্ধকার রাত্রের আস্তরণে ঢাকা। ওরা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ ২৬-২৭ আয়াত)।

"ওদের কৃতকর্মের মন্দফল ওদের কাছে (পরকালে) প্রকাশ হয়ে পড়বে; আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা ওদের ঘিরে রাখবে।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৪৮ আয়াত)।

"ওরা ওদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তারাও তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে, আর এরা আল্লাহ্‌র শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৫১ আয়াত)।

"যে সৎকাজ করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে আর কেউ মন্দকাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তো তাঁর দাসদের ওপর যুলুম করেন না।" (৪১ হামিম সিজদা ঃ ৪৬ আয়াত)।

"প্রত্যেক কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ভালো করেই জানেন।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৭০ আয়াত)।

"আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, কারও ওপর অত্যাচার করা হবে না।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ ২২ আয়াত)।

"প্রত্যেকের স্থান তার কর্ম অনুযায়ী, এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন আর তাদের কারও প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।" (৪৬ সূরা আহকাফ ঃ ১৯ আয়াত)।

"মানুষের কাজকর্মের জন্য জলে– স্থলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তিও ওদের আস্বাদন করানো হয়, যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।" (৩০ সূরা রূম ঃ ৪১ আয়াত)।

"তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবীদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না, যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্‌ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না।" (৪ সূরা নিসা ঃ ১২৩ আয়াত)।

"সেদিন (মহাবিচারের দিনে) মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বের হবে যাতে ওদের কৃতকর্ম ওদের দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে

www.pathagar.com

তা দেখবে ও কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখ্‌বে।" (৯৯ সূরা জিলজাল ঃ ৬-৮ আয়াত)।

উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা গেল মানুষ 'ইভিল' (অন্যায় বা মন্দ) কিছু করলেও তার পরিণতি সে এড়াতে পারবে না। আর মানুষকে পরীক্ষার জন্য কিছু অকল্যাণ বা বিপদাপদ আসে। আর কিছু কিছু অকল্যাণের জন্য মানুষই দায়ী। মানুষ মানুষ বলেই এটা হয়, মানুষ ফেরেশ্‌তা হলে এমনটা হতো না। ফেরেস্তা ও মানুষে বিরাট তফাৎ রয়েছে। ফেরেশ্‌তার পাপ করার ক্ষমতা নেই; আর মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য দুই-ই করতে সক্ষম।

সত্য ও মিথ্যা এক হতে পারে না। তাই কিভাবে মন্দ ও অমন্দ, পাপ ও পুণ্য এক হতে পারে?

কোরআন বলে, "বলো, পৃথিবীতে সফর কর, তারপর দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।" (৬ সূরা আনআম ঃ ১১ আয়াত)।

"বলো, আমার প্রতিপালক সত্য দিয়ে মিথ্যাকে চূর্ণ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।" (৩৪ সূরা সাবা ঃ ৪৮ আয়াত)।

"প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূল (স্রষ্টার দূত)কে নিরস্ত করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল আর ওরা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে মত্ত ছিল। তাই আমি ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কতো কঠোর ছিল আমার শাস্তি।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ ৫ আয়াত)।

"আল্লাহ্‌ মিথ্যাকে মুছে ফেলেন ও তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।" (৪০ সূরা শূরা ঃ ২৪ আয়াত)।

"সুতরাং পৃথিবীতে সফর করে দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।" (১৬ সূরা নাহল ঃ ৩৬ আয়াত)।

". . . সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে সফর কর ও দেখ, যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কি পরিণাম।" (৩ সূরা আলে ইমরান ১৩৭ আয়াত)।

মিথ্যা ও সীমালঙ্ঘনকে স্রষ্টা পছন্দ করেন নাই। মিথ্যা ও সীমালঙ্ঘন কার্য পৃথিবীতে থাকবে তবে তার পরিণাম ফলও স্রষ্টার নিকট রয়েছে। পৃথিবীতে ভাল-মন্দ আছে, মানুষের ভালো-মন্দ দুই-ই করার ইচ্ছা ও শক্তি স্রষ্টা দিয়েছেন বলেই মিথ্যা ও সীমালঙ্ঘন রয়েছে। এটিও স্রষ্টার একটি পরীক্ষা।

www.pathagar.com

কুরআন বলে, "আর যারা আমার (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে?" (৭ সূরা আরাফ ঃ ৩৬-৩৭ আয়াত)।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বানায় বা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘণকারী আর কে? অপরাধীরা তো সফল হয় না।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ ১৭ আয়াত)।

"যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? ওদের প্রতিপালকের সামনে ওদের উপস্থিত করা হবে ও সাক্ষীরা বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।" (১১ সূরা হুদ ঃ ১৮ আয়াত)।

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে আর বড় সীমালঙ্ঘনকারী কে? সীমালঙ্ঘনকারীরা তো সফলকাম হয় না।" (৬ সূরা আনআম ঃ ২১ আয়াত)।

" . . . সূতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে?" (৬ সূরা আনআম ঃ ১৪৪ আয়াত)।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান তো জাহান্নামই।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৩২ আয়াত)।

"যারা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের বাসস্থান জাহান্নাম (একটি দোজখ) নয়?" (৩৯ সূরা 'যুমার' ঃ ৬০ আয়াত)।

"আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ ৩ আয়াত)।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা তাঁর কাছ থেকে আগত সত্যকে

www.pathagar.com

অস্বীকার করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নাম।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ ৬৮ আয়াত)।

"সেদিন (পরকালে) মিথ্যাচারীদের হবে মন্দ পরিণাম, যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী এ অস্বীকার করে; তার কাছে আমার (আল্লাহ্‌র) আয়াত (কোরআন) আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ সেকালের উপকথা।" না এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্মই ওদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে।" (৮৩ সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১০–১৪ আয়াত)।

"দেখ! তারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এ-ই যথেষ্ট।" (৪ সূরা নিসা ঃ ৫০ আয়াত)।

"মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমশীল, আর তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ ৬ আয়াত)।

"সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করবে না।" (৫ সূরা মায়িদা ঃ ২ আয়াত)।

স্রষ্টা যদি "ইভিল" (অমঙ্গল, পাপ, অসৎকর্ম) তাঁর শক্তিবলে নিশ্চিহ্ন করতেন, তাহলে নৈতিকতার ভিত্তিই থাকত না। পাপ নেই, এমন অবস্থায় মানুষের নৈতিকতা অনৈতিকতার প্রভেদই থাক্‌ত না। আর সে সমাজটা তো পাপবিহীন, অনৈতিকতাবিহীন ফেরেশ্‌তা (এনজেল)দের সমাজ। এতে তো মানুষের প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। ফেরেশ্‌তা ও মানুষ এক নয়। দুইয়ের নৈতিকতায় প্রভেদ রয়েছে। ফেরেশ্‌তা অনৈতিক কর্ম করার ক্ষমতাই রাখে না– মানুষ রাখে নৈতিক-অনৈতিক দুই প্রকারের কর্মসম্পাদনে। মানুষ ফেরেশ্‌তার মত "রবট" (যন্ত্রসদৃশ্য সৃষ্টি) নয়। ফেরেশ্‌তার অনেক ক্ষমতা থাকলেও তারা যন্ত্র সদৃশ্য জীব।

আরএকটি প্রসঙ্গ হলো– স্রষ্টা অমঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করেন নাই। তবে ভবিষ্যতেও যে তিনি করবেন না, তা কিভাবে বলা যাবে। যখন পরিস্থিতি আসবে, স্রষ্টা অমঙ্গলকে সম্পূর্ণ বিনাশ করে সম্পূর্ণ নৈতিকতা আনয়নে পূর্ণ সক্ষম। নইলে স্রষ্টা কিভাবে সার্বভৌম সত্তা? অমঙ্গল বর্তমানে রয়েছে বলে– স্রষ্টাই নেই– এমন যুক্তি সঠিক নয়।

www.pathagar.com

নাস্তিক বলে যে, স্রষ্টা কোন সময়েই অঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। নাস্তিক এ কথা কিভাবে বলতে পারে? নাস্তিক কি সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা? নাস্তিকের চোখে এমন কোন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা মহাশক্তি নেই অথচ সে নিজেকে সেই পর্যায়ে নিয়ে কিভাবে বলতে পারে যে, স্রষ্টা কোন সময়ই অমঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করবেন না? পৃথিবী এখনও ধ্বংস হয় নাই বলে কি বলা যাবে যে, এটি কখনই ধ্বংস হবে না?

নাস্তিকেরা বলে যে, মঙ্গলময় স্রষ্টা থাকলে তাহলে সর্বত্র মঙ্গল দৃষ্ট হতো। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে নানা অমঙ্গলই রয়েছে (যেমন হত্যা, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা ইত্যাদি) তাই কোন মঙ্গলময় স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। এ যুক্তিও পূর্বের যুক্তির ন্যায়। অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা নাস্তিকের চোখে প্রতিভাত না হতে পারে। নাস্তিক সর্বদ্রষ্টা নয়। সাময়িক অমঙ্গল অবস্থা স্রষ্টার অনস্তিত্বের যুক্তি হতে পারে না।

অনেক অমঙ্গলও ভালো পরিণতি প্রদান করতে পারে। দুঃখকষ্ট মানুষকে ধৈর্যশীল করে। বদহজম কোন ব্যক্তির লাগামহীন খাদ্যাভ্যাসের লাগাম হতে পারে। এ সমস্ত অমঙ্গল মানুষকে সাবধানী করতে পারে। আগুন হাত পোড়াতে পারে, তাই সাবধানী মানুষ এতে হাত দেবে না। তা আগুন হাত পোড়ায় বলে আগুনকে বিলুপ্ত করা কি সঠিক হবে?

নাস্তিক হয়ত যুক্তি ঘুরিয়ে বলবে, সর্ব অমঙ্গলই শেষতক্ মঙ্গল বয়ে আনে। এটিই যদি নাস্তিকের যুক্তি হয়, তাহলে অমঙ্গলের অবস্থানের কারণে স্রষ্টার অনস্তিত্বের যুক্তি দাঁড় করানো অযৌক্তিক হবে। স্রষ্টার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মঙ্গল-অমঙ্গল থাকা-না থাকার উপর নির্ভরশীল নহে। মানুষের প্রয়োজনেই মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বে শুধু ফেরেশতা থাকলে আর মানুষ না থাকলে মঙ্গল-অমঙ্গলের কোন প্রভেদই হয়ত থাকত না। মানুষ আছে বলেই শয়তান আছে। শয়তান মানুষের মনুষ্যত্ব প্রমাণে প্রয়োজনীয়।

সেই পরম সত্তার অস্থিত্বের ধারণাকে অপসারণ করা যায় না শুভ-অশুভের প্রশ্ন তুলে। তাছাড়া কি শুভ, আর কি অশুভ তার সঠিক বিচার মানবীয় যুক্তিতে প্রায়ই সম্ভব নয়। আজ যা নির্ভল বলে কবুল করা হচ্ছে, আগামীতে তাকেই বাতিল গণ্য করা হচ্ছে। তবু যুক্তি বিবেচনার দীনতাকে সামনে রেখেই বলা যায় যে, কোন কিছুর ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার সময় ও উপযোগিতার উপরে, তার ব্যবহার ও উপযোগিতার উপরে। মুসলমানদের যে নামাজ এত বড় সৎকাজ, সূর্যাস্তের বা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সম্পাদিত হলে তাই অসৎ কাজ। উপকারী আগুন

www.pathagar.com

অন্যের ঘর পোড়াতে গেলে অপকারী। রাহাজানির উদ্দেশ্যে পেট কাটা অসৎকাজ, কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনে পেট না কাটাই অসৎকাজ। এখানে উদ্দেশ্যই কাজের ভাল-মন্দের মাপকাঠি। জীবহত্যা মহাপাপ, *অতএব- গুটিপোকা হত্যা করতে হবে- কাজেই রেশম উৎপাদন* বন্ধ করো, এর নাম সৎকাজও নয়, নৈতিকতাও নয়। প্রজনন ক্ষমতার অবৈধ ব্যবহার, অব্যবহার বা ধ্বংস সাধন সৎকাজও নয় ধার্মিকতাও নয়। অথর্ব বৃদ্ধ বা নপুংসক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ-সুযোগে বিরত থাকলে তার নাম নৈতিকতা নয়। পোষ্য প্রাণীর নিরীহতত্ব সুশীলতা নয়। দস্যুর সাহসিকতা গুণ নয়। জানী-দুশমনকে হত্যা করা পাপ নয়। চোরের বুদ্ধি সুবুদ্ধি নয়। মিথ্যবাদীর নম্রতা শিষ্টাচার নয়। কাজেই কি শুভ আর কি অশুভ তা নির্ভর করে নিয়তের উপরে- স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োগের উপরে। জ্বরা, ব্যাধি ক্ষয় জীবনের অন্য পিঠ। আলোকের প্রকাশ আঁধারেই। সুখের জন্ম দুঃখেই। সিদ্ধির উৎস সাধনায়। অতএব, ভাল-মন্দ, শুভা-শুভের প্রশ্ন তুলে মনকে ক্ষুব্ধ করা যায় বটে, খোদার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না। দার্শনিক ডঃ জি, সি দেব বলেন ঃ

ÍAtheistic writers down to Hume and Russell have found it difficult to reconcile the Idea of an Omnipotent and a marally perfect God with a universe. But they forget that the world we live in is more our responsibility than God's (G.C.Dev. Idealism) (শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, আল্লাহ কি লৌকিক, পৃঃ ৩৫-৩৬)

পৃথিবীতে কেন 'ইভিল'-অকল্যাণ, বিপদাপদ, মিথ্যা, সীমালঙ্ঘন, পাপ, মন্দ, অন্যায় ইত্যাদি রয়েছে- তার প্রচুর ব্যাখ্যা স্রষ্টা কুরআনের বাক্যসমূহে প্রদান করেছেন। 'ইভিল' আছে বলে, স্রষ্টা নেই- এমন যুক্তি অযৌক্তিক। 'ইভিল'ও স্রষ্টার মহাবিশ্ব পরিকল্পনারই অংশ। তবে 'ইভিল' এর কি পরিণতি তাও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদান করেছেন। 'ইভিল' বিহীন সমাজ ও পরিবেশ স্বাভাবিকভাবে কাম্য। আর তাই স্রষ্টার পরিকল্পনায় বেহেশ্‌ত-প্যারাডাইজ বা স্বর্গ, যদিও প্যারাডাইজ ও স্বর্গের বর্ণনায় অন্যদের তুলনায় ইসলামের বেহেশ্‌তে কিছু কিছু পরিবর্তন রয়েছে। সত্যানুরাগীদের লক্ষ্য হলো বেহেশ্‌তের আদর্শ পরিবেশ।

(১৮) নাস্তিকগণ মনে করে স্রষ্টা তো নেই, তবে শুধু বিশ্ব আছে। আর স্রষ্টা হলো মানুষের তৈরী। স্রষ্টা মানুষকে তৈরী করে নাই, মানুষই স্রষ্টাকে তৈরী করেছে।

www.pathagar.com

জবাবে আমরা বলব যে, বিশ্ব দেখা যাচ্ছে বলে বিশ্ব আছে, আর স্রষ্টাকে নাস্তিকগণ দেখে নাই বলে স্রষ্টা নেই– এ তো যুক্তি হতে পারে না। নাস্তিকগণের 'এন্টেনা'তে স্রষ্টা ধরা না দিলেও, এমন বহু আস্তিক মহামানব রয়েছেন যাদের 'এন্টেনা'তে স্রষ্টাকে ঠিক পাওয়া যায়। এ অনেকটা এমনি একটা ব্যাপার– যার চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে সেই শুধু এক ফোঁটা পানিতে ক্ষুদ্র কীট প্রত্যক্ষ করছে, খালি চোখের সাধারণ মানুষের চোখে সেই এক ফোঁটা পানি শুধু স্বচ্ছরূপে প্রতিভাত হবে।

হ্যাঁ, অতীতের গ্রীক, রোমান, মিসরীয়, ও আরবগণ অথবা আরো আরো জাতি নানা মিথ্যা 'স্রষ্টা' সৃষ্টি করেছিল বটে এবং এখনও বহু মানুষ মিথ্যা বিভিন্ন স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে। এসব মিথা স্রষ্টা মানুষেরই সৃষ্টি। তাইতো 'জিউস', 'ভেনাস', 'থরস', 'লাত্', 'মানাত', 'উজ্জা' ইত্যাদি মিথ্যা স্রষ্টা– মিথ্যা খোদা। এসবের সঙ্গে সত্যিকারের একমাত্র সার্বভৌম স্রষ্টার কোন সম্পর্ক নেই। সার্বভৌম স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টি নয়। মিথ্যা, অনুমাননির্ভর কিছু কিছু 'স্রষ্টা'কে চালানোর চেষ্টা একটি অপচেষ্টা মাত্র।

(১৯) নাস্তিকগণ বলতে চান যে, বিশ্বই চিরস্থায়ী, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, অক্ষয়, অমর, সনাতন। যদি বিশ্ব অনন্ত না হয়, তাহলে এটি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্ট ও কেউ এটি সৃষ্টি করে নাই। মোট কথা বিশ্ব সৃষ্ট নয়। এটি স্বনির্ভর ও নিজ ক্ষমতাবলে চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলও বলেছেন, বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয় নাই, এটা শুধু সেখানে অবস্থানরত অর্থাৎ রয়েছে। নাস্তিকেরা আবার বলে যে, শুধু বিশ্বের টুকরো সমূহের সৃষ্টির জন্য কার্যকারণ বা হেতুর প্রয়োজন ছিল, আর সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিতে কারণের প্রয়োজন নেই। বিশ্বের সৃষ্টিতে কারণের প্রয়োজনীয়তা দাবী করলে গড্ সৃষ্টির কারণ চাওয়া হতে পারে। গড্– এর সৃষ্টির জন্য যদি কারণ প্রয়োজন না হয়, বিশ্ব সৃষ্টিতেও প্রয়োজন নেই কারণের। নাস্তিকেরা বলে যে, কারণের কারণ, তার কারণ, তার কারণ এভাবে পিছন দিকে এগুতে থাক্লে কোন সময়ই প্রাথমিক কারণকে অর্থাৎ গড্কে পাওয়া যায় না। কারণ, সব কিছুরই যদি কারণ থাকে, তাহলে প্রাথমিক কারণেরও একটি কারণ, থাকবে। তাই প্রাথমিক কারণ, প্রাথমিক নয় অথবা অন্য কিছুও প্রাথমিক নয়।

উপরের নাস্তিকগণ যে যুক্তির অবতারণা করেছে, তার বেশীরভাগ কথাই পূর্বের যুক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ও আমাদের জবাবও সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তবু কিছু জবাবী উক্তি আমরা করব। নাস্তিকেরা বলে থাকে যে, অবিনশ্বর স্রষ্টা হতে পারে না। যেখানে স্রষ্টাকেই নাস্তিকেরা অবিনশ্বর বলতে নারাজ, সেখানে তারা কিভাবে মহাবিশ্বকে অবিনশ্বর বলতে চায়? মহাবিশ্ব অবিনশ্বর হলে 'বিগ ব্যাংগ' (মহা বিস্ফোরণ) তত্ত্বকে বাতিল করতে হবে। বেশকিছু বৈজ্ঞানিক বলে আস্‌ছেন যে, মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মহাবিশ্বকে যদি অবিনশ্বর বলতে হয় তাহলে তার তো মহাবিস্ফোরণের পূর্ব থেকেই অবস্থান করার কথা। মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বই প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব অবিনশ্বর নয়।

নাস্তিকেরা বলে যে, মহাবিশ্ব যদি অবিনশ্বর না হয়, তাহলে তাকে আসতে হবে অনস্তিত্ব থেকে এবং কারো সাহায্য দ্বারা নয়। আমরা বলব যে, অনস্তিত্ব থেকে আসা অসম্ভবপর কিছু নয়। কোরআন বলে,

"তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল। প্রেমময়, সম্মানিত আরশের (মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের) অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।" (৮৫ সূরা বুরূজ ঃ ১৩–১৬ আয়াত)।

"জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেওয়া তাঁরই (আল্লাহ্‌রই) কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্বপ্রতিপালক।" (৭ সূরা আরাফ ঃ ৫৪ আয়াত)।

"তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টিকে (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার (মহাপ্রলয়ের পর); ইহা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৩০ সূরা রূম ঃ ২৭ আয়াত)।

"তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল সুন্দর নাম তাঁরই।" (৫৯ সূরা হাশর ঃ ২৪ আয়াত)।

"মানুষের কি মনে নাই যে, আমি (আল্লাহ্) তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না (অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছি)?" (১৯ সূরা মারয়াম ঃ ৬৭ আয়াত)।

"আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ্ (প্রভূ) আছে কি? ওরা যাকে (আল্লাহর) অংশীদার করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে। বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন।" (২৭ সূরা নাম্‌ল ঃ ৬৩–৬৪ আয়াত)।

www.pathagar.com

মহাবিশ্ব কারো দ্বারাই সৃষ্ট হয় নাই– এ তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মহাবিশ্ব সার্বভৌম সত্তা নয়। মহাবিশ্ব 'মহাবিস্ফোরণের' পরে সৃষ্ট।

মহাবিশ্ব স্ব-নির্ভর ও নিজ ক্ষমতাবলে অক্ষয়– বলেছে নাস্তিকগণ। এই উক্তিকে একটি 'এবসলুট'– অসীম, অবাধ, শর্তহীন, চরম যুক্তি হিসাবে অগ্রহণযোগ্য। তবে সাধারণভাবে– 'অর্ডিনারী সেন্সে'– গ্রহণ করা যেতে পারে। স্রষ্টা মহাবিশ্ব এমনইভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, মহাবিশ্বকে করেছেন স্ব-নির্ভর– সবকিছু তিনি এতে দিয়েছেন, আর স্রষ্টার অন্য নির্দেশ ব্যতীত মহাবিশ্ব নিজস্ব ব্যবস্থায় চলতে থাকবে। তবে যখন স্রষ্টার অন্য নির্দেশ আসবে তখন মহাবিশ্ব আল্লাহ্ প্রদত্ত তার স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। কোরআন বলে,

"আর আমি (আল্লাহ্) ওর মধ্যে (পৃথিবীতে) তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণ ব্যবস্থা করেছি আর তাদের জন্যও, যাদের তোমরা জীবনের উপকরণ দাও না। প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার আমার কাছে আছে আর আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহ করে থাকি। (১৫ সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত ২০–২১)।

" . . . এসব (বিশ্বের ব্যবস্থাসমূহ) পরাক্রমশালী (আল্লাহ্) কর্তৃক সুবিন্যস্ত।" (৬ সূরা 'আনআম' ঃ আয়াত ৯৬)।

"তিনি (আল্লাহ্) সুপরিকল্পিতভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (৩৯ সূরা 'যুমার' ঃ আয়াত ৫)।

"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। আকাশ, পৃথিবীর চাবি তাঁরই আছে। (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬২–৬৩)।

"এইতো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অস্বীকার করে তারা এইভাবে ফিরে যায়। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবী বাসের উপযোগী করেছেন ও আকাশকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট ও তোমাদের দান করেছেন উত্তম জীবনের উপকরণ। এ-ই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্"। (৪০ সূরা মুমিন ঃ আয়াত ৬২–৬৪)।

"তিনি (আল্লাহ্) স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন, করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে

www.pathagar.com

দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না? তারপর তুমি বারবার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।" (৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৩-৪)।

"আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (২৯ সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৪)।

মহান স্রষ্টার জন্য স্বয়ংক্রিয় বিশ্বজগত সৃষ্টি তার সার্বভৌম ক্ষমতারই অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশ্বজগত স্বয়ংক্রিয় অবস্থা পেয়েছে বলেই যে তা 'নট ক্রিয়েটেড' (অসৃষ্ট) এটা বলা সমীচীন হবে না।

বার্ট্রান্ড রাসেল যে বলেন, বিশ্বজগত সৃষ্ট নয়, এটা শুধু সেখানে রয়েছে- এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যে গুণটি তিনি বিশ্বজগতকে দিচ্ছেন তা একমাত্র স্রষ্টার গুণ। তাহলে ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, তিনি এমন একটি সত্তা আছে বলে স্বীকার করছেন যিনি অসৃষ্ট এবং যিনি শুধু রয়েছেন। আমরাও তো তাই বলি, একটি শক্তি বা সত্তা আছেন- যিনি অসৃষ্ট এবং তিনি শুধু আছেন। তবে কিনা রাসেল সেই সত্তার লেবেলটি ভুল জায়গায় লাগিয়েছেন। একেই বলা হয় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। ইংরেজিতে একে বলা হয়- 'The boot is on the wrong leg'। সোজা বাংলায় এর অর্থ হলো- ভুল পায়ে জুতো।

নাস্তিকেরা বলে যে, বিশ্বজগতের খণ্ডগুলো কার্যকারণ বা হেতুর উপর নির্ভরশীল সৃষ্টির জন্য। আমরাও তাই বলব। তবে নাস্তিকগণ বলে যে 'সমগ্র' (whole) এর সৃষ্টিতে অন্য কোন কার্যকারণের প্রয়োজন নেই। এ যুক্তির খণ্ডন আমরা পূর্বে করেছি। খণ্ড খণ্ড যোগ করলেই তো সমগ্র হয়। সব খণ্ডকে আলাদা করলে 'সমগ্র' তো উধাও হয়ে যাবে। আবার খণ্ড খণ্ড সমষ্টির 'সমগ্র' কোন সার্বভৌম সত্তা নয়।

নাস্তিকরা বলে যে, বিশ্বজগতের জন্য কার্যকারণ খুঁজলে, স্রষ্টার জন্যও খুঁজতে হবে। তারা আরো বলে যে, যদি স্রষ্টার জন্য কার্যকারণ প্রয়োজনীয় মনে না করি, বিশ্বজগতের জন্যও তাই হবে। আমরা বলব, তা কেন? বিশ্বজগত ও স্রষ্টা কেউ কারো তো প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান্তরাল (Parallel) শক্তি নয়। তাদের অবস্থান চক্রবালীয় (horizontal) কিন্তু উপর- নীচ। স্রষ্টার অবস্থান উপরে, আর সৃষ্টি নীচে। সৃষ্টি স্রষ্টার অধীনস্থ।

নাস্তিকগণ জেদ করে বলে, কার্যকারণ খুঁজতে গেলে এভাবে এত বেশী পিছনের কার্যকারণের হিড়িক লেগে যাবে যে, প্রথম কারণ অর্থাৎ স্রষ্টাকে কখনও পাওয়া যাবে না, কারণ প্রাথমিক কার্যকারণেরও একটি কার্যকারণ থাকতে পারে।

www.pathagar.com

কাজেই তারা বলে যে, প্রাথমিক কার্যকারণ বলে কিছু নেই। আমরা বলব, এ যুক্তি নাস্তিকদের শুধু অনুমান। তারা কি সমস্ত কার্যকারণের হিসাব কষতে পেরেছে? বস্তুজগতের সীমারেখাই তারা এ পর্যন্ত টানতে পারে নাই। সবকিছু দেখা তো শেষ করে নাই তারা। নাস্তিকগণ বিশ্বজগতকে কার্যকারণহীন বলতে চায় আবার অন্যদিকে স্রষ্টাকে কার্যকারণের অধীন করতে চায়। নাস্তিকদের বহু যুক্তি স্ব-বিরোধীতায় পূর্ণ।

(২০) স্রষ্টা নেই, তবে 'ইভিল' (মন্দ) রয়েছে– বলছে নাস্তিকগণ। সর্বেশ্বরবাদীগণ (Pantheists) বলে যে মন্দ নেই, মহাবিশ্বের সবই ভালো, যেহেতু এ সবই ঈশ্বরের অংশ। একেশ্বরবাদী আস্তিকগণ বলে যে, স্রষ্টা ও মন্দ দুই-ই আছে। নাস্তিকগণ মনে করে যে, স্রষ্টা ও মন্দ একসঙ্গে থাকতে পারে না।

উপরের যুক্তির জবাব আমরা আগেই প্রদান করেছি। আমরা সর্বেশ্বরবাদীগণের পক্ষে নেই। তারাও স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে ভুল করেছেন। মহাবিশ্বের সবকিছুই স্রষ্টার অংশ, আর সবই স্রষ্টা, 'ইভিল' (মন্দ) বলে কিছু নেই, এটি হলো স্রষ্টা সম্পর্কে একটি ভুল ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা দিলে বিষ্টা, মূত্র, গলিতপদার্থ, আবর্জনা, পাপ, হত্যা, নরবলি, ব্যভিচার ইত্যাদিও হয় স্রষ্টা বা স্রষ্টার দায়দায়িত্বে।

নাস্তিকগণ মন্দের অস্তিত্বকে স্বীকার করে, তবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে নয়। আমরা মন্দ ও স্রষ্টার দুইয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করি। তবে নাস্তিকগণ ভালোর অস্তিত্বকে বেমালুম এড়িয়ে গেছে। স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তবে মন্দের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নাস্তিক। আমরা বলব– স্রষ্টা তো আছেনই, ভালো-মন্দ দুইই আছে। তবে ভালো-মন্দ স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী বা অংশীদার নয়। মানুষ নামক জীবের স্বাভাবিক অবস্থান ভাল বা মন্দে। ফেরেশ্‌তা বা শয়তানের অন্যরূপ– ফেরেশতা ভালোর প্রতীক, শয়তান মন্দের। আর মানুষে এসে ভালো-মন্দ পাশাপাশি দৃষ্ট। স্রষ্টা মানুষকে ভালো-মন্দ দুটোর জ্ঞান দিয়ে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আর এর ফলাফলও দিচ্ছেন বা দিবেন। সফল যারা তারা হবে বেহেশ্‌তবাসী, অসফলকারীগণ দোযখবাসী। মানুষের এ তো স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষ যদি সব ফেরেশ্‌তা হতো বা শয়তান হতো তাহলে অবস্থা হতো অন্যরূপ। ভালো ও মন্দ দুই-ই রয়েছে। ভালো থাকলে স্রষ্টা রয়েছেন, মন্দ থাকলে স্রষ্টা নেই– এটি সঠিক যুক্তি হতে পারে না। মন্দ আছে বলেই স্রষ্টা নাই বললে, ভাল আছে বললে তাহলে কি হবে? তা কি এমনি– স্রষ্টা নেই, স্রষ্টা আছে! ভালোমন্দ

www.pathagar.com

থাকা না থাকার উপর স্রষ্টার থাকা না থাকা নির্ভরশীল নয়। স্রষ্টা ভালো-মন্দ সৃষ্টি না করলেও তিনি থাকতেন।

ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি স্রষ্টা কেন দিয়েছেন– এ সম্পর্কে স্রষ্টার নিজস্ব বক্তব্য আমরা আগেই বিস্তারিত তুলে ধরেছি।

সর্বেশ্বরবাদীগণ (যারা সবকিছুকে স্রষ্টা মনে করেন) কোথায়ও মন্দ (ইভিল) দেখে না। নাস্তিকগণ মন্দের উপস্থিতি স্বীকার করে। তারা পৃথিবীর অপূর্ণতা অনুভব করে। আমরা বলব যে, পৃথিবী ও বেহেশ্‌তের পার্থক্যের জন্য পৃথিবীর অপূর্ণতা। অবিচারের সুবিচার পরকালেই সম্ভব চূড়ান্তভাবে।

'ইভিল' বা মন্দের একটি প্রকাশ হলো ইবলীস শয়তান। মানুষকে যখন ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, দোযখ-বেহেশত প্রদান করা হয়েছে, তখন এর স্বাভাবিক একটি উপসর্গ হোল 'মন্দের হোতা শয়তান।' একে যে অনুসরণ করবে সেই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। মানুষ আল্লাহ্‌কেও দেখতে পায় না, শয়তানকেও না। তাই নাস্তিকগণ স্বভাবত দু'জনকেই করে অস্বীকার। তবু দুই-ই রয়েছে।

কুরআন বলে, "হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রলুব্ধ না করে যেমন করে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত (প্যারাডাইস) হতে বের করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখাবার জন্য তাদের উলঙ্গ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না। শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি, যারা বিশ্বাস করে না।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ২৭)।

"নিশ্চয়ই যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন যারা সাবধান তারা সচেতন হয় ও তাদের চোখ খুলে যায়, আর তাদের ভাই-বেরাদররা (অবিশ্বাসীরা) তাদের বিভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট করে ও তাদের এ বিষয়ে তারা কোনো কসুর করে না।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ২০০–২০২)।

"সীমালঙ্ঘনকারী যেদিন নিজের হাত দুটো কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায়! দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুক–অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) পৌঁছানোর পর আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল।' শয়তান তো মানুষকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে যায়।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ২৭–২৯)।

www.pathagar.com

"হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই না ঠকায়, আর ধোঁকাবাজ যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের ধোঁকা না দিতে পারে। শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এজন্য ডাকে যেন ওরা জাহান্নামী (দোযখের অধিবাসী) হয়।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৫-৬)।

"তারপর ওদের (অংশীবাদীদের) ও পথভ্রষ্টদের মুখ নিচু করে জাহান্নামে (দোযখে) উল্টানো হবে আর ইবলীস (শয়তান) বাহিনীর সবাইকে।" (২৬ সূরা শোআরা ঃ আয়াত ২১০-২১২)।

"তুমি আমার (আল্লাহর) দাসদের যা ভালো তা বলতে বলো। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (১৭ সূরা বনি-ইসরাঈল ঃ আয়াত ৫৩)।

"ওদের সম্বন্ধে ইবলীসের অনুমান সত্য হল শুধু একটি বিশ্বাসীদের দল ছাড়া, যাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য ছিল না। ওরা তাকে (ইবলীসকে) অনুসরণ করল। কারা পরকালে বিশ্বাসী ও কারা তা সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।" (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ২০-২১)।

"যে করুণাময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, তারপর সে তার সঙ্গী হয়। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে। তবু মানুষ মনে করে- তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। যখন সে আমার (আল্লাহ্‌র) কাছে আসবে, তখন সে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। সে কি খারাপ সঙ্গী! আর (তাদের বলা হবে) যখন তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে, তখন আজ একত্রে শাস্তি ভাগ করে তোমাদের কোনো লাভ নেই।" (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৩৬-৩৯)।

"শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই এ (সরল পথ) থেকে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৬২)।

"শপথ আল্লাহ্‌র, আমি (আল্লাহ্) তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান এসব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, তাই শয়তান আজ ওদের অভিভাবক। আর ওদের জন্য আছে নিদারুণ শাস্তি।" (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৬৩)।

www.pathagar.com

"যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই। ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই ওপর, যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে ও যারা (আল্লাহ্‌র) শরীক করে।" (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯৯-১০০)।

"আর আমি (আল্লাহ্ প্রাচীন আরবের) আদ ও সামুদ (সম্প্রদায়)কে ধ্বংস করেছিলাম। ওদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক) বাঁড়িঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদের সৎপথে চলতে বাধা দিয়েছিল। যদিও ওরা বিচক্ষণ লোক ছিল।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৩৮)।

"আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সেতো কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর যে চায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না, তা বলো।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৬৮-১৬৯ আয়াত)।

"আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে কি খারাপ সঙ্গী।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৩৮)।

"তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৮৩)।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন। আর আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।" (২৪ সূরা নূর ঃ আয়াত ২১)।

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে ও তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।" (২২ সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩-৪)।

(২১) নাস্তিকগণ বলে যে, মানুষ শুধু একটি বস্তু, এর কোন অমর আত্মা নেই, মন বলে কোন কিছু নেই, মস্তিষ্ক (ব্রেইন) ছাড়া। মানুষের শরীর থেকে

www.pathagar.com

পৃথক স্বাধীন কোন আত্মা নেই। অবশ্য কোন কোনো নাস্তিক আত্মা ও মনকে স্বীকার করেছে। মনের উপর গবেষণা করে তারা কেউ কেউ চমৎকার সব তথ্য উদঘাটন করেছে। কেউ কেউ আত্মাকে স্বীকার করে; অবশ্য বলে যে, তা শুধু দেহের সঙ্গে জড়িত। আর দেহ মৃত হলে, আত্মাও মৃত হয়। তারা বলতে চায়, গাছের ছায়া থাকতে পারে, তবে গাছ না থাকলে ছায়াও চলে যায়, আত্মার অবস্থাও তাই।

যাই হোক, নাস্তিকগণ নিজেরাই মন ও আত্মা নিয়ে উভয় সংকটে। কেউ বলে এসব আছে, কেউ বলে নাই। কেউ বলে আপেক্ষিকভাবে রয়েছে। আমাদের কথা, যদি মানুষের মন বা আত্মা নাও থেকে থাকে, তবুও স্রষ্টা রয়েছে। মানুষের মন বা আত্মা থাকা না থাকার উপব স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ নানা ধরনের সৃষ্টি আনতে পূর্ণভাবে সার্বভৌম। তিনি বর্তমান মানুষ জাতিকে সরিয়ে নতুন এক সৃষ্টি আনয়নেও সক্ষম। কুরআন বলে,

"আমি (আল্লাহ্) কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে ওরা সন্দেহ করবে।" (৫০ সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ১৫)।

"তিনি (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। এ আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়।" (৩৫ সূরা 'ফাতির' ঃ আয়াত ১৬-১৭ এবং ১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ১৯–২০)।

"আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ১১)।

"ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দেন, তারপর তা আবার সৃষ্টি করেন? এতো আল্লাহ্র জন্য সহজ। বলো, 'পৃথিবীতে সফর করে দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর আল্লাহ্ আবার সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১৯-২০)।

মানুষ না থাকা, আত্মা বা মন না থাকা, আল্লাহ্র অস্তিত্বে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না। তবু কথা হলো, তাহলে আত্মা ও মন কি? কুরআন এ সম্পর্কে বলে, "তোমাকে (হযরত মুহাম্মদ) তারা রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত' এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৫)।

কুরআনে 'রূহ' চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হলো ঃ জৈব বা মানবীয় আত্মা, ওহী (ডিভাইনি রিভিলেশন), কুরআন ও ওহীবাহক ফেরেশতা

www.pathagar.com

জিবরাঈল। কুরআন বলছে যে, "রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৫)। যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল রূহ (আত্মা) সম্পর্কে এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই এ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে। তবে রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়নি এতে। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন'ঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্তাআলার আদেশ 'কুন' (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব এ কথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাটিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যে সব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। মানুষের জ্ঞান যত বেশী হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, ৭৯১ পৃষ্ঠা)।

আসলে 'আত্মা' জীবের হোক বা মানুষের– এ একটি জটিল বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের শরীর কেটেকুটে বা ল্যাবরেটরিতে আত্মাকে ধরতে পারেন নাই। তবে এটি যে রয়েছে তা বোধগম্য। কুরআন বলে যে, "এটি একটি 'আদেশ' –একটি হুকুম, একটি 'অর্ডার' সৃষ্টিকর্তার। এই 'আদেশ' ছাড়া জীব বা মানুষ একটি জড় পদার্থ বিশেষ। আর আত্মাকে নিরেট, খাঁটি 'অমর' কিছু বলা যাবে না। এর তো শুরু হচ্ছে। শেষ আছে কিনা কেউ জানে না। সৃষ্টির পরে আত্মা যদি অনন্তকাল বেঁচে থাকে, তা হবে সার্বভৌম স্রষ্টার ইচ্ছার ফল।"

কুরআন শরীফে আত্মা সম্পর্কে কোথাও কোথাও 'নফস' শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। 'নফস' এর অর্থ অবশ্য নিঃশ্বাস, ঢোক, প্রাণশক্তি, মূলবস্তু বা বিষয়, বাসনা, ইচ্ছা, আত্ম, আত্মা, ব্যক্তিসত্তা, ভোগ,পল, মুহূর্ত ইত্যাদি। কুরআনের এক স্থানে আছে, "আল্লাহ মানুষের নফস (প্রাণ বা আত্মা) হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৪২)।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্ তাআলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগত থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তখন দেহে জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন '*আলমে মিছালের*' দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।" তিনি আরও বলেন, "নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমিষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।" (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১৮০)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবী (সহচর) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "মানুষের রূহ ও নফ্স রয়েছে, একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ও নড়াচড়ার কাজ সাধিত হয়। আর নফ্স অনুভূতি ও বোধশক্তির উৎস। নিদ্রাকালে শুধু নফ্স হরণ করা হয়। ("আল-কুরআনুল কারীম,' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৭৫৭)

www.pathagar.com

কুরআনের আরেকটি জায়গায় 'নফস'-এর উল্লেখ এভাবে আছে, "হে নাফসুল মুত্বমায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা বা চিত্ত বা মন)! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (৮৯ সূরা ফাজ্‌র ঃ আয়াত ২৭–৩০)।

এখানে বিশ্বাসীদের রূহকে 'নাফসুল মুত্বমায়িন্না' (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসয়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। (তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৪৫৬)।

নাস্তিকগণ শরীর ও আত্মার সম্পর্ক গাছ ও ছায়ার সাথে তুলনা করেছে। আসলে এটা একটা 'ব্যাড এনালজি' (মন্দ তুলনা)। গাছ থাকলেই ছায়া হবে, এমন কথা নেই। রাত্রের অন্ধকারে ছায়া থাকে না কেন? বাতাসের কি ছায়া আছে? বিজলির ছায়া?

'রূহ' (আত্মা) সম্পর্কে একটি সুন্দর উক্তি রয়েছে কুরআনের সূরা 'নিসা'য় এমনিভাবে, "মারিয়াম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী (কালেমাতুহু বা কালেমাতুল্লাহ্‌) যা তিনি মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাঁর আদেশ (রূহ)।" (১৭১ আয়াত)।

'মসীহ'-এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায়, রোগীর উপর হাত বুলিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) রোগীকে রোগমুক্ত করতেন এই অর্থে তাঁকে মসীহ্‌ বলা হোত। পর্যটক অর্থেও শব্দটি ব্যবহার হয়। (আল-কুরআনুল কারীম, পৃষ্ঠা-৮৩)।

একই 'আল্‌-কুরআনুল কারীম' বলে "'রূহ' অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আদেশ, যথা রূহুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ।" (পৃষ্ঠা ১৫৪)।

সূরা 'নিসা'র ১৭১ নম্বর আয়াতে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে– (এক) কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত

www.pathagar.com

রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এবং 'কুন' (হয়ে যাও) নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন– মসজিদের সম্মানার্থে সেটিকে 'আল্লাহ্র ঘর' বলা হয়, মক্কার কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। অথবা কোন একান্ত অনুগত বিশ্বাসীকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে 'আব্দুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্র দাস' বলা হয়। যেমন– সূরা 'বনী ইসরাঈলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে 'আল্লাহ্র দাস' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন– রূহ বা প্রাণ, তদরূপ হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন– কোন আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 'রূহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, কোরআন পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন– 'রূহ' শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে (সূরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে) এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নজীরহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

(চার) আরেকটি অভিমত এই যে, 'রূহ' শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মারিয়াম (আঃ)-এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রূহুল্লাহ্ খেতাব দেয়া হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহ্ই ঈসা (আঃ)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন–এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

www.pathagar.com

একটি ঘটনা' ঃ আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃষ্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল, তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কোরআনের روح منه (রূ-হুম মিনহু) শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কোরআনপাকের আয়াত পাঠ করলেন 'অছাখ্‌খারা লাকুম মা-ফিচ্ছামাওয়া-তি ওয়াল আরদি জামী-আম মিনহু'। যেখানে جميعا منه (জামী'আম মিনহু) শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্, তাআলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। অতএব, روح منه (রূহুম মিনহু) শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অংশ, তবে جميعا منه (জামী'আম মিনহু) শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র অংশ। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃষ্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো– মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো– মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (রাঃ) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তাআলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত

www.pathagar.com

তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী-খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আসমান ও যমীনে উপর হতে নীচে পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক; তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। (তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ২৯৮–২৯৯)।

কুরআন বলে, "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, 'আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করছি; যখন আমি তাহাকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার 'রূহ' সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত (ভক্তি ভরে প্রণত) হইও।" (১৫ সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত ২৮–২৯)।

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হইও।" (৩৮ সূরা সাদ ঃ আয়াত ৭১–৭২)।

"এবং স্মরণ কর সেই নারীকে (মারিয়ামকে) যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি (আল্লাহ্) আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম,

www.pathagar.com

এবং তাকে ও তার পুত্রকে (ঈসাকে) করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৯১)।

রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ– এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আব্দুর রউফ মানাভী বলেন' ঃ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نفخ শব্দের অর্থ ফুঁক দেয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেয়া হয়, তবে ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা। (বয়ানুল-কোরআন)।

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন' ঃ রূহ দুই প্রকার–স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ্ তাআলার একটি সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের (অর্থাৎ আল্লাহ্র পরিচালনা কেন্দ্রের) উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম! স্বর্গজাত রূহ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর–নীচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই' ঃ কল্ব, রূহ, সির, খফী আখ্ফা– এগুলো আদেশ–জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান– অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এ মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত

www.pathagar.com

থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্তজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা- উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই আত্মা ফুঁকা বলা, আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা 'রূহ'কে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ, মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্র আদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর (জ্যোতি) গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যেই কুরআনে মানব সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশ জগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা। (তাফসির মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৭২৯-৭৩০)।

কুরআন বলে, "যিনি (আল্লাহ্) তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে নিজের 'রূহ' সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।" (৩২ সূরা সেজদাহ ঃ আয়াত ৭-৯)।

www.pathagar.com

অন্যত্র আছে, "এই কিতাবে মারিয়ামের (ঈসার মাতার) কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার 'রূহ' প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।" (১৯ সূরা মারয়াম ঃ আয়াত ১৬-১৭)।

উপরের সূরা 'মারয়ামে 'রূহ' বলে ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল (আঃ)কে বোঝানো হচ্ছে, এটি অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মত। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা মারিয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তিই অগ্রগণ্য। কোরআনের পরবর্তী ব্যাখ্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়। (তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন ঃ পৃষ্ঠা ৮৩২)।

কুরআনে আছে, "আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ। 'রূহুল আমীন' (বিশ্বস্থ রূহ অর্থাৎ জিবরাঈল ফেরেশতা) তা নিয়ে অবতরণ করেছে।" (২৬ সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৯২-১৯৩)।

উপরের আয়াতে 'রূহ' বলতে সংবাদবাহক জিব্রাইল ফিরিশতাকে বোঝানো হয়েছে।

কুরআন বলে, "তাদের (যারা বিশ্বাসী) অন্তরে আল্লাহ ঈমান (ধর্মে বিশ্বাস) লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর রূহ (অদৃশ্য শক্তি বা নূর) দ্বারা। (৫৮ সূরা মুজাদালা ঃ ২২ আয়াত)।

উপরের 'রূহ'-এর ব্যাখ্যা কেউ কেউ করেছেন 'নূর' (জ্যোতি) যা বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ 'রূহ'-এর ব্যাখ্যা করেছেন কুরআন মজীদ ও কুরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই বিশ্বাসীর আসল শক্তি।- (কুরতুবী) (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা ১৩৪৯)।

উপরের তথ্য ও আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে 'আত্মা' একটি জটিল বিষয়। মানুষকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে এ সম্পর্কে। কুরআন তাই 'রূহ' সম্পর্কে বলে, "এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে (রূহ সম্পর্কে)"। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৫)।

www.pathagar.com

এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, 'রূহ' বস্তুগত কোন জিনিস না হলেও, এটি স্রষ্টার একটি আদেশস্বরূপ। স্রষ্টার আদেশ, 'কমাণ্ড', 'অর্ডার'-এর সঙ্গে এটি সরাসরি সংযুক্ত। আর স্রষ্টা নিজেই বলছেন যে, 'আত্মা' সম্পূর্ণ খতম হবে না। তার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি অপেক্ষা করছে তার কর্মফল অনুযায়ী। কাজেই মানুষের দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মা মরে যায়, এটি নাস্তিকদের একটি অনুমান মাত্র। এ ব্যাপারটি মানুষ ছাড়া অন্য জীবের জন্য হতে পারে। তবে মানুষের জন্য নয়। নাস্তিকেরা কি মানুষ ও অন্যান্য জীবের পার্থক্য এখনও অনুধাবন করতে পারে নাই?

(২২) নাস্তিকগণ মনে করে যে, কোন moral absolutes (শর্তহীন, বিশুদ্ধ, খাঁটি, ভেজালহীন নৈতিকতা) বলে কিছু নেই, কারণ নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা থাকলে একজন 'এবসলুট ল গিভার' (absolute Law giver অসীম, পুরাদস্তুর স্বাধীন আইন প্রণেতা) অর্থাৎ স্রষ্টাকে মান্‌তে হয়। নাস্তিকরা বলে যে, মূল্যবোধগুলো মানুষের সৃষ্টি। জন ষ্টুয়ার্ট মিল Utilitarianism (দ্রব্যের কার্যকারিতাই বা মানবের সুখই নৈতিক মানদণ্ড এবমপ্রকার মতবাদ) প্রদান করলেন। কেউ কেউ আবার expedient behaviour (স্বার্থ সংবর্ধক আচরণ), আর কেউ কেউ self-interest (স্বীয় স্বার্থ)– কেই নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাটি ঠিক করল। সব নাস্তিকই বলল যে, মানুষই তার নৈতিক মূল্যবোধের নীতি তৈরী করবে। Humanist Manifesto ঘোষণা করল। "Humanism aserts that the nature of the universe depicted by modern science makes unacceptable any supernatural or cosmic guarantee of human values." (Paul Kurtz, *Humanist Manifestos 1& II,* Buffalo; Promethius Press, 1973) .

(অনুবাদ' ঃ মানবতাবাদ জোরালোভাবে বলে যে. আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বজগতের যে প্রকৃতি প্রদান করেছে তাতে মানবীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় অথবা 'কসমিক' (বিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্ব সম্পর্কীয় ধর্মীয় ধারণা সম্বলিত) নিশ্চয়তা অগ্রহণযোগ্য।"

যেহেতু নাস্তিকগণ স্রষ্টার ধারণাই রাখে না, তাই তারা স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মানে না। অন্যান্য ধর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত ইসলামের যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার তত্ত্ব রয়েছে, তার একটা

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে। এতে কতকগুলো মৌলিক মূল্যবোধ ও নীতিকথা ফুটে উঠেছে। এগুলো কতকটা এরূপ ঃ

(ক) স্রষ্টাকে মান্য করতে হবে, তিনি সার্বভৌম ও মহাশক্তিশালী।

(খ) স্রষ্টাকে ছেড়ে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পূজা করা যাবে না।

(গ) মানুষ এক আদমের সন্তান ও ভাই ভাই।

(ঘ) বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে বসবাস করবে।

(ঙ) মানুষের সমান অধিকার।

(চ) হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, ওজনে কম দেওয়া, অন্যায় অপবাদ প্রদান, মিথ্যা কথা বলা, কটু কথা বলা, অত্যাচার, যুলুম করা ইত্যাদি অন্যায়।

(ছ) মানুষের সেবা করা, দরিদ্রের ও মযলুমের বিশেষভাবে সেবা করা, এতীম (পিতৃমাতৃহীন), খঞ্জ, বৃদ্ধ, অন্ধ, রোগী ইত্যাদির সেবা করা, দান করা, অন্নদান, পরোপকার করা, বিদ্যাশিক্ষা করা, গুরুজনে ও শিক্ষককে ভক্তি করা, পিতা-মাতার সেবা করা, শিশুদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ভালোবাসা, প্রতিবেশীর সেবা করা, সফরকারীদের সেবা করা, আতিথেয়তা, দাস-দাসীর সঙ্গে সুব্যবহার, রং বা বর্ণ নয় সততাই ভালো-মন্দের মাপকাঠি, সুবিচার করা ইত্যাদি কর্ম বড়ই সৎকর্ম। এই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং আরো কিছু এর সঙ্গে হাজার হাজার বছর চলে আসছে। ইসলামের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তার আইনশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। নৈতিকতার সীমারেখা লঙ্ঘনের কোন ক্ষমতা নেই। ইসলামের সর্বশেষ রূপ কুরআন ও হাদীসে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিধৃত হয়েছে। সে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা নেই কারো, এমনকি কোন শক্তিধর নেতা বা সম্রাটেরও নেই।

সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে কুরআন বলে, "আমি (আল্লাহ্) সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিফল দেব।" (৭ সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪১)।

"আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (৭ সূরা আ'রাফ ঃ ৫৫ আয়াত, ২ সূরা 'বাকারা' ঃ আয়াত ১৯০, সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮৭ আয়াত)।

"সীমালঙ্ঘনকারী সেদিন (পরকালে) নিজের হাত দুটো কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুক অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে (কুরআন) উপদেশ পৌঁছানোর পর আমাকে তো বিভ্রান্ত করেছিল।

www.pathagar.com

– "শয়তান তো মানুষকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে যায়।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ২৭–২৯)।

"আর সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে (আমি আল্লাহ্) রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।" (১৯ সূরা মরয়াম ঃ আয়াত ৭২)।

"আর আমি (আল্লাহ্) কোনো জনপদকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করে।" (২৮ সূরা কাসাসঃ আয়াত ৫৯)।

"না, ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না তা অস্বীকার করে। আর এখনও এর (কোরআনের) ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয়নি। এ ভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। সুতরাং দেখ, সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩৯)।

"আর যদি পৃথিবীর সব কিছুই সীমালঙ্ঘনকারীদের হতো, তাহলে নিশ্চয় সে তো মুক্তিপণ হিসাবে (পরকালের মুক্তির জন্য) পেশ করে দিত।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৪)।

"তিনি (আল্লাহ্) আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করে থাকে। মারাত্মক কঠিন মার তাঁর! যে পরলোকের শাস্তির ভয় করে নিশ্চয়ই এতে তার জন্য নিদর্শন আছে।" (১১ সূরা হূদ ঃ ১০২–১৩৩) আয়াত)।

"যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের দিকে তুমি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে, আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর তখন তোমাদের সাহায্য করা হবে না।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১১৩)।

"সীমালঙ্ঘনকারীরা (তোমাদের পূর্ব যুগে) তারই অনুসরণ করত যাতে সুখ-সুবিধা পেত, আর ওরা ছিল অপরাধী।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১১৬)।

"সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (৩১ সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১১)।

"ওরা ওদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তারাও তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে, আর এরা আল্লাহ্র শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫১)।

"নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।" (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ২১)।

www.pathagar.com

"সীমালঙ্ঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ১৯)।

"সীমালঙ্ঘনকারীদের ভাগ্যে তাই রয়েছে, যেমন ছিল তাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্যে। সুতরাং তারা যেন আমার (আল্লাহ্‌র) কাছে তাড়াহুড়ো না করে।" (৫১ সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৫৯)।

"আমি (আল্লাহ্) সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার বেড় ওদেরকে ঘিরে থাকবে।" (১৮ সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ২৯)।

"(অতীতে) সেই সব জনপদের অধিবাসীদের আমি (আল্লাহ্) ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি ঠিক করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।" (১৮ সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ৫৯)।

"আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল দেরী বা তাড়াহুড়ো করতে পারে না।" (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৬১)।

"তুমি কখনও মনে করো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সচেতন নন, তবে তিনি ওদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন, যেদিন তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।" (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৪২)।

'আমি (আল্লাহ্) কত জনপদ (অতীতে) ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১১)।

"সেদিন (পরকালে) সীমালঙ্ঘনকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কাজে আসবে না ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সুযোগও ওদের হবে না।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৫৭)।

"তিনি (আল্লাহ্) যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন নিদারুণ শাস্তি।" (৭৬ সূরা দাহর ঃ আয়াত ৩১)।

"শেষে অবিশ্বাসী ও মুনাফেক উভয়ের পরিণাম জাহান্নাম (দোযখ)। সেখানে এরা স্থায়ী হবে,আর এ-ই সীমালঙ্ঘনকারীদের কর্মফল।" (৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াত ১৭)।

www.pathagar.com

নাস্তিকরা যে বলে স্রষ্টা-প্রেরিত কোন মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নেই, তারা কুরআন ও হাদীস পাঠ করলেই সেই মুল্যবোধ ও নৈতিকতা পেতে পারত। হ্যাঁ, মানুষও কিছু কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিকতা তৈরী করে। এতে স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূলনীতিসমূহ স্রষ্টা প্রদান করেছেন। সেগুলি অলঙ্ঘনীয়। মানুষ সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে আরো সুন্দর সুন্দর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষকে তো সে যোগ্যতা দিয়েই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ছাড়া অন্য জীব-জন্তুতে তা পাওয়া যাবে না। স্রষ্টা দাস-দাসীদের সঙ্গে সুব্যবহার করতে বলেছেন, দাসমুক্ত করতে বলেছেন, দাস-দাসীদের সঙ্গে ভাই-বোনের মত ব্যবহার করতে বলেছেন। আধুনিক মানুষ, আধুনিক সমাজ দাস প্রথাই তুলে দিয়েছে। মানুষ যে এ ভালো পরিবর্তনটুকু এনেছে, তাতে মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে উঠেছে। অতীতে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রসারিত করা হতো। এখন যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সীমারেখা পরিবর্তনের নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য দু'একটি রাষ্ট্র রয়েছে, যেমন– ইসরাঈল, ভারত (প্যালেস্টাইন, লেবাননের অংশ, জর্ডানের অংশ, গোলান, গোয়া, দমন, দিউ, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মান্‌ভাদর, কাশ্মীরে) শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সীমা সম্প্রসারিত করেছে। জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমে বেসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে মানবীয় ব্যবহারের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যদিও অনেক রাষ্ট্র এসবের লঙ্ঘন করে চলেছে। মানুষের এসব বাড়তি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা তৈরী করাতে স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বরঞ্চ মানুষ যে সৃষ্টির সেরা ও পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি সেটিই প্রমাণিত হয়। স্রষ্টার দেওয়া মুল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে "ইউটিলিটারিয়ানিজম"-এর মাধ্যমে পাওয়া মানব জাতির সম্মিলিত কোন মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গ্রহণযোগ্য হলে, তা অবশ্যই বিবেচ্য। তবে তা যেন স্রষ্টার মূলনীতির বিরোধী না হয়। আর স্রষ্টার মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে পাশ কাটিয়ে শুধু "ইউটিলিটারিয়ানিজম"-এর মাধ্যমে গৃহীত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। স্রষ্টার দেওয়া মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, আর "ইউটিলিটারিয়ানিজম"-এর মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় 'ওভারল্যাপ' (একে অন্যের উপরে স্থাপিত) হয়, তাতে দোষের কিছু নেই। এতে স্রষ্টার মূল্যবোধ, নৈতিকতারই যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

ভালো-মন্দ মূল্যবোধ আপেক্ষিক ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থিরীকৃত হয়, কোন কোন নাস্তিক বলে। হ্যাঁ, মূলনীতি ঠিক রেখে বিস্তারিতে কিছু কিছু পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে মূল কাঠামো বাতিল হবে না।" "এক্সপেডিয়েন্ট বিহেভিয়ার" (সুবিধাজনক, কৌশলগত আচরণ) কোন কোন

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। সর্বক্ষেত্রে এটি গ্রহণ করলে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূল কাঠামোই হাওয়া হয়ে যেতে পারে। ফলে ভালো হবে মন্দ, মন্দ হয়ে যেতো ভালো। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে এভাবে ছেলের হাতের মোয়ায় পরিণত করা যায়। "সেলফ ইন্টারেস্ট"(স্বীয় স্বার্থ) কে নীতি হিসাবে নিলে ঐ একই ফল দাঁড়াবে। স্বীয় স্বার্থ যদি নৈতিক দিক দিয়ে ভালো হয়, তাহলে সমস্যা নেই। তবে স্বীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে সবকিছু করতে গেলে সমাজে হিটলার, মিলোসেভিচ, পলপটে ছেয়ে যাবে। কাজেই "চেঞ্জিং সিচুয়েশন', 'এক্সপেডিয়েন্ট বিহেভিয়ার', 'সেলফ ইন্টারেস্ট' ইত্যাদি নীতির গ্রহণযোগ্যতা আপেক্ষিক মাত্র, চূড়ান্ত নয়।

আর 'হিউম্যানিজম' নীতি ভালো কথা। স্রষ্টার নীতিই 'হিউম্যানিজম'-এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। স্রষ্টার 'হিউম্যানিজম'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষের 'হিউম্যানিজম'-এর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে স্রষ্টার নীতির বিরোধিতা করে হবে না। মানুষের 'হিউম্যানিজম' যদি বিবাহ ছাড়া অবাধ যৌনমিলন, 'লিভটুগেদার' ও এই ধরনের মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সমর্থন করে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ পৃথিবীতে কোন সন্তান পিতৃপরিচয় চায় না? পিতৃ পরিচয়ের লোপাটকারী 'হিউম্যানিজম'-এর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মানুষকে বর্বর পশুর স্তরে নিয়ে যাবে। মানুষ জীব হলেও সে তো পশু নয়– সে সৃষ্টির সেরা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নীতি নির্ধারণ সবটুকু মানুষের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। মানুষ নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি ও ভুলত্রুটির জন্য নীতি নির্ধারণে যোগ্যতার পরিচয় নাও দিতে পারে। তাই দেখা যায় দেশে দেশে, সমাজে সমাজে অনাচার, অবিচার। অতীত আরবে কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর প্রদান, ভারতে ও অতীতের আমেরিকাতে নরবলি, শিশুবলি, গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপ, সতীদাহ, বিধবা গঞ্জনা, অস্পৃশ্যতা, দলিত সমস্যা, আমেরিকার বর্ণ বৈষম্য, আমেরিকাতে এই সেদিনও বিশেষ করে আলাবামাতে সাদা-কালোর আলাদা স্কুল– হোটেল ইত্যাদি, এই সেদিনের দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য ইত্যাদি মানুষের তৈরী মূল্যবোধ নৈতিকতা ভিত্তিক ব্যবস্থাসমূহ। মানুষই সব নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ঠিক করলে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য।

মানুষ অনেক সময় নিজের ভালো-মন্দও ঠিকমত বুঝে না। হয়ত যা ভাল হবে তাকে সে মন্দ মনে করছে, আর যা মন্দ হবে তাকে ভালো বলছে।

কুরআন বলে, " . . . কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য তা ভালো। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তোমাদের জন্য তা মন্দ। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জান না।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৬)।

"মানুষ যেভাবে ভালো চায়, সেভাবেই মন্দ চায়; মানুষের বড় তাড়াহুড়ো।" (১৭ সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ আয়াত ১১)।

"বলো, ভালো ও মন্দ এক নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই হে বোধশক্তিসম্পন্নরা। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০০)।

বলা হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় কোন কিছুকে গ্রহণ করো না। আমরা বলব যে, বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয় অতীন্দ্রিয়তা (Supernaturalism)। বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতি (nature) নিয়ে কর্মরত। অতীন্দ্রিয়তা বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়বস্তু। বিজ্ঞানই মানবের সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের বাইরেও জ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

অনেক মানুষ স্রষ্টার মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মানে না বলেই স্রষ্টা নেই, এমন যুক্তি সঠিক নয়। সমগ্র মানুষজাতি স্রষ্টার দেওয়া মূল্যবোধ ও নৈতিকতা পরিত্যাগ করলেও স্রষ্টার কিছুই যায়-আসে না। আসলে মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে এমনি একটি সময় আসবে যখন একজন মানুষও স্রষ্টার ধার ধারবে না– কেউই স্রষ্টাকে মান্য করবে না। আর তখনই সেই প্রতিশ্রুতি– মহাপ্রলয় শুরু হবে, যার ওয়াদা কুরআনে রয়েছে।

কুরআন বলে, "বল, তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে-যায় না। তোমরা অস্বীকার করছ, ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭৭)।

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন।" (৬ সূরা আন্'আম ঃ আয়াত ১৩৩)।

"বল, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।" (১১২ সূরা ইখ্লাস্ ঃ আয়াত ১–২)।

স্রষ্টার নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে কিভাবে নাকচ করা যায়? কুরআন বলে, "খাবারের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা (বিশ্বাসীগণ) অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন ও বন্দীকে খাবার দান করে, আর বলে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

www.pathagar.com

লাভের উদ্দেশ্যে) তোমাদের খাবার দিচ্ছে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।' (৭৬ সূরা দাহর ঃ আয়াত ৮–৯)।

(২৩) নাস্তিকেরা বলে মানুষের ভাগ্য হলো মৃত্যু। তারা ব্যক্তির কোন অমরত্ব মানে না। তবে কেউ কেউ জাতির সামগ্রিক অমরত্ব মান্য করে। আবার কোন কোন নাস্তিক পৃথিবীতেই স্বর্গ, এমনি বিশ্বাস করে। বি, এফ, স্কিনার "behaviourally controlled utopia" (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কাল্পনিক আদর্শ অবস্থা)-এর প্রস্তাবনা প্রদান করেছেন (B.F. Skinner,*Walden Two,* Newyork; Macmillan, 1976, P. 182)। কম্যুনিজমের প্রধান তাত্ত্বিক কার্ল মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব (economic dialectic of history) অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি কম্যুনিস্ট স্বর্গ সৃষ্টি করবে। আয়ান র‍্যাণ্ড (Ayn Rand) বিশ্বাস করেন যে, খাঁটি পুঁজিবাদ (Capitalism) যথার্থ সমাজ (perfect society) সৃষ্টি করতে পারে। আবার অন্যরা মনে করে যে, human reson (মানবীয় বিবেক, যুক্তি) এবং বিজ্ঞান আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। মোটকথা, সব ধরনের নাস্তিকই ব্যক্তি মানুষের নিঃশেষ হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে সান্ত্বনা পায় এই আশা করে যে, সে ধ্বংসকাল লক্ষ লক্ষ কাল পরে আসবে।

কুরআন বলে, "মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে; এর থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ।" (৫০ সূরা কাফ ঃ আয়াত ১৯)।

"আমি (আল্লাহ্) তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি।" (৫৬ সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ৬০)।

"তিনিই (আল্লাহ্ই) জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।" (৪০ সূরা মুমিন ঃ আয়াত ৬৮)।

"আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন।" (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৭০)।

"মহামহিমান্বিত তিনি (আল্লাহ্), যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।" (৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ১–২)।

www.pathagar.com

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে থাকলেও।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৮)।

"তিনি (আল্লাহ্) জীবন দান করেন আর তিনিই মৃত্যু ঘটান।" (৯ সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১৬)।

" আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেননা তার মেয়াদ অবধারিত।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৫)।

হ্যাঁ, আমরাও বলব যে, মানুষ অমর নয়, তার একটা সময়ে জন্ম হয়েছে। তার মৃত্যু নিশ্চিত। প্রতিটি জীবের মৃত্যু অনিবার্য, তা সে মানুষ হোক বা নিম্নতর কোন জীব। কুরআন বলে, "নফ্স (জীব) মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩৫)।

নাস্তিকেরা মানুষ মরণশীল বললেও 'রেস' (জাতি)-এর জন্য সামগ্রিক অমরত্ব ধারণা করেছে। এটি একটি স্ব-বিরোধিতা। রেস বা জাতি বেঁচে থাকবে, মানুষ মরে যাবে– এটি কি যুক্তিগ্রাহ্য? তাহলে তো মানুষ অমরই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। আমরা বলব যে, সব 'রেস' বা জাতি নিশ্চিহ্ন হবে, কিন্তু মানুষই অন্যরূপে অবস্থান করবে। তবে মানুষ বা সব জীবকে মরতেই হবে একবার। স্ব-বিরোধিতার আর বাকী ধারণাগুলি হলো পৃথিবীতেই স্বর্গ, ব্যবহারিক কাল্পনিক আদর্শ স্থান, কম্যুনিস্ট স্বর্গ, পুঁজিবাদী 'পারফেক্ট সোসাইটি' (ত্রুটিহীন, পূর্ণাঙ্গ সমাজ), 'সোসাল ইউটোপিয়া' (আদর্শ সমাজ) ইত্যাদি। নাস্তিকগণ বলে যে, মানুষ মরণশীল, তবে মৃত্যুকে তারা ডরায় বলেই তারা মনকে সান্ত্বনা দিতে পৃথিবীতে নানা স্বর্গের বাহানা প্রদান করেছে। পৃথিবী এর ভিতরেই পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী স্বর্গের নগ্নরূপ দর্শন করেছে। পৃথিবীতে স্বর্গ হবে না, কখনও কখনও স্বর্গসদৃশ সামাজিক অবস্থা অল্প সময়ের জন্য আস্তে পারে, তবে স্থায়ী হবে না। ব্যবহারিক, কাল্পনিক আদর্শ স্থান একটি কল্পনা ও অনুমান। যুক্তি ও বিজ্ঞান আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করবে কিভাবে? যুক্তি ও বিজ্ঞান ছাড়াও সমাজ গঠনে বহু উপাদান প্রয়োজন। যুক্তি ও বিজ্ঞান একাই তা করতে অসমর্থ। বিজ্ঞানের কাজ প্রকৃতি নিয়ে কাজ করা, সমাজ নিয়ে নয়। 'সমাজ-বিজ্ঞান' কথাটা আছে, তবে যে ধারণায় পদার্থবিদ্যা, জীব বিদ্যা বিজ্ঞান, সে ধারণায় সমাজ বিদ্যা বিজ্ঞান নয়। মানুষের ধ্বংস বহু লক্ষ লক্ষ বছর দূরে আছে। এটি একটি ধারণা মাত্র। নাস্তিক ও আস্তিক সবাই মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী বলেছে। তবে কুরআন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ নয়– এটি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে। 'জাতির সামগ্রিক

www.pathagar.com

অমরত্বে' কোন কোন নাস্তিক বিশ্বাস করে, কিন্তু মানুষের আত্মার ধারাবাহিকতা স্বীকার করে না– এটি একটি স্ব-বিরোধিতা। সাধারণ জীব ও মানুষের মৃত্যুতে পার্থক্য রয়েছে, যেমনি পার্থক্য রয়েছে সাধারণ জীব ও মানুষে।

মানুষকে অস্তিত্বে আনতে জীবনের জন্য জন্ম প্রয়োজন। তেমনি মানুষের কর্মফল প্রদানে মৃত্যুও একটি স্বাভাবিক পর্যায়, কিন্তু মৃত মানুষকে তো তার কর্মফল দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাই তাকে পুনর্বার জীবন্ত হতে হবে। তবে সে জীবন্ত অবস্থা পৃথিবীর ন্যায়, না অন্য প্রকারের, তা মানুষের বোধগম্য নয়। তবে আল্লাহ্ বলেছেন যে, মহাপ্রলয়ের পরে যে পৃথিবী সম্মুখে পুনর্বার সৃষ্টি হবে তা একটু পৃথক হবে। পুনর্জীবন তাই মানুষের ধারাবাহিকতা, উন্নতি ও পূর্ণতার স্বাভাবিক পর্যায়।

কুরআন বলে, "অবশেষে তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমার (আল্লাহ্র) প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোনো কসুর করে না। তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের কাছে তাদের আনা হয়। দেখ, হুকুম তো তাঁরই, আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে তৎপর।" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ৬১–৬২)।

"তোমার তো মৃত্যু হবে ও তাদেরও মৃত্যু হবে। তারপর কিয়ামতের (মহাবিচারের) দিন তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তর্কাতর্কি করবে।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩০–৩১)।

"এরপর তোমাদের মৃত্যু হবে, তারপর কিয়ামতের দিন আবার ওঠানো হবে।" (২৩ সূরা মুমিন ঃ আয়াত ১৫–১৬)।

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। তারপর তোমাদের আমারই (আল্লাহ্রই) কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।" (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৫৭)।

"তোমরা কেমন করে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না। তিনিই তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮)।

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো করে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে (বেহেশ্তে) যেতে দেওয়া হবে সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)।

www.pathagar.com

"বলো, তোমরা যে মৃত্যু হতে পালাতে চাও তোমাদের সে মৃত্যুর সামনে যেতেই হবে। তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে আর তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।" (৬২ সূরা জুম্‌আ ঃ আয়াত ৮)।

মানুষ পূর্ণভাবে অমর নয়, তবে আল্লাহ্ মানুষকে মৃত্যুর পরেও তার জীবনের ধারাবাহিকতা রেখেছেন। এর ফলে মরেও সে অমর। মানুষের পাপ-পুণ্যের জন্যই পরকাল নির্ধারিত।

কুরআন বলে, "তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও স্থায়ী। এতো আছে পূর্বের গ্রন্থে, ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে (লেখা)।" (৮৭ সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১৬-১৯)।

"তোমার জন্য পরকাল তো ইহকালের চেয়ে ভালো।" (৯৩ সূরা দোহা ঃ আয়াত ৪)।

"ইহকাল ও পরকাল তো আল্লাহ্‌রই" (৫৩ সূরা নজ্‌ম ঃ আয়াত ২৫)।

"পরকালের শাস্তিতো অবশ্যই আরও কঠিন, আরও স্থায়ী।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১২৭)।

"আমি (আল্লাহ্) অবিশ্বাসীদের কাউকে কাউকে তাদের পরীক্ষা করার জন্য, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসাবে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখন ও লক্ষ্য করো না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবনের উপকরণ আরো ভালোও আরো স্থায়ী।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১৩১)।

"যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, তাই ওরা বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, এদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি ও এরাই পরকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।" (২৭ সূরা নমল ঃ আয়াত ৪-৫)।

"বলো, আল্লাহ্ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। আর ওরা জানে না, ওদের আবার কখনও উঠানো হবে (পরকালে)। পরকাল সম্পর্কে ওদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে। কারণ, তারা তো (তা) দেখতে পায় না।" (২৭ সূরা নমল ঃ আয়াত ৬৫-৬৬)।

"তোমাদের যা-কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা; আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা (আরও) ভালো ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না? যাকে আমি (আল্লাহ) ভালো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে

www.pathagar.com

পাবে, সে কি ঐ লোকের সমান– যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন অপরাধী করে উপস্থিত করা হবে?" (২৮ সূরা কাসাস ঃ ৬০-৬১ আয়াত)।

"আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি (আল্লাহ্) প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।" (১৭ সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ আয়াত ১০)।

"বলো, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তারা সফলকাম হবে না।' ওদের জন্য আছে পৃথিবীতে কিছু সুখভোগ, পরে আমারই (আল্লাহ্রই) নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদের আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬৯–৭০)।

"যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী, তাদের কাছে পরকালের পুরষ্কার উত্তম।" (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৭)।

"আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়; আর যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝো না?" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ৩২)।

"বস্তুত যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ৮)

'আল্লাহ্ এক'– একথা বললে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, আর তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" (৩৯ সূরা যুমারঃ আয়াত ৪৫)।

"আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের না ঠকায়, আর শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের ধোঁকা না দেয়।" (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৩)।

"যারা ইহ জীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় ও আল্লাহ্র পথ বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো বড় বিপথে রয়েছে।" (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩)।

"নিশ্চয়ই যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা তো সরলপথ থেকে সরে গেছে।" (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ৭৪)।

"ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, পরকাল সম্বন্ধে অনবধান।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৭)।

www.pathagar.com

"এবং যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাতকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাক্‌বে।" (৩০ সূরা 'রূম' ঃ আয়াত ১৬)।

"এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি ওরা জানত।" (২৯ আনকাবুত ঃ আয়াত ৬৪)।

"অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের (মহাবিচারের) দিন তারাই তাদের ওপর থাকবে।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১২ ।

'বলো, পার্থিব ভোগ সামান্য! আর যে সংযমী তার জন্য পরকালই ভালো। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না।' (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৭)।

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, আত্মপ্রশংসা ও ধনে জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্যসম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়,তাই তুমি তা হলদে দেখ, শেষে তা খড়কুটো হয়ে যায়। কিন্তু যে পরকাল ছেড়ে পৃথিবীতে মশগুল রয়েছে, তার জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া কিছুই নয়।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২০)।

"আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত, যদিও ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ২৬)।

ইসলামের বিধানে পরকাল অবশ্যম্ভাবীভাবে রয়েছে। এর স্বাভাবিক পূর্বরূপ হলো কিয়ামত (মহাপ্রলয়) এবং পরবর্তীতে মানুষের পুনরুত্থান।

কুরআন বলে, "কিয়ামত আসন্ন। আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউই এটা ঘটাতে সক্ষম নয়। তোমরা কি এ কথায় অবাক হচ্ছ, আর হাসিঠাট্টা করছ, কাঁদছ না? তোমরা তো উদাসীন। বরং আল্লাহ্‌কে সিজদা কর (ভক্তিভরে প্রণত হও) ও তাঁর উপাসনা কর।" (৫৩ সূরা নজম ঃ আয়াত ৫৭–৬২)।

"মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয় কি?

মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান?

সেদিন মানুষ বাতির পোকার মতো বিক্ষিপ্ত হবে আর পাহাড়গুলো রঙীন

www.pathagar.com

পশমের মতো ধোনা হবে।

তখন (পুনরুত্থানের পরে) যার পাল্লা (ভালো কাজে) ভারী হবে, সে তো পাবে সুখ ও শান্তির জীবন, কিন্তু যার পাল্লা (ভালো কাজে) হালকা হবে, তার জায়গা হবে 'হাবিয়া' (দোযখ)।

সে কি, তুমি কি তা জান?

"(সে) এক গনগনে আগুন।" (১০১ সূরা কা'রিয়াহ ঃ আয়াত ১- ১১)।

"পৃথিবী যখন চূর্ণবিচূর্ণ হবে, আর যখন তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে উপস্থিত হবেন, সেদিন জাহান্নাম (দোযখ)কে উপস্থিত করা হবে। আর সেদিন মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্মরণ কি তার কাজে আস্‌বে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি আগে থেকে ভালো কাজ করে রাখতাম।"

"তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে জানে, যখন কবরে যা আছে তা উঠানো হবে; অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন ওদের কি ঘটবে, ওদের প্রতিপালক অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন।" (১০০ সূরা নজমঃ আয়াত ৪৭)।

"পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই (আল্লাহ্‌রই)।"

"তারপর তার (মানুষের) মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন।" (৮০ সূরা আবাসা ঃ আয়াত ২১-২২)।

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি (আল্লাহ্) তার (বিচ্ছিন্ন) হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? আসলে, আমি ওর আঙ্গুলগুলোর গিরা পর্যন্ত আবার সাজাতে পারব।" (৭৫ সূরা কিয়ামা ঃ আয়াত ৩-৪)।

"সেদিন (মহা বিচারের দিনে) দুর্ভোগ তাদের, যারা মিথ্যা আরোপ করে। সেদিন বলা হবে, এই বিচারের দিন, তোমাদের আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্র করেছি তোমাদের কোন কায়দা থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। সেদিন দুর্ভোগ তাদের, যারা মিথ্যা আরোপ করে।" (৭৭ সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ৩৭-৪০)।

"কাফ। সম্মানিত কুরআনের শপথ। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী (হযরত মুহাম্মদ) আবির্ভূত হতে দেখে অবাক হয় ও বলে, এতো এক আজব ব্যাপার! আমরা মরে গেলে আর আমরা মাটি হয়ে গেলে

www.pathagar.com

আমাদের কিভাবে ওঠানো হবে? এ (পুনরুত্থান) সুদূর পরাহত। আমি (আল্লাহ্) তো জানি মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করে। আর আমার কাছে যে কিতাব (রেকর্ড) রয়েছে, তাতো (সবকিছু) সংরক্ষণ করে যাচ্ছে।" (৫০ সূরা কাফ ঃ আয়াত ১-৪)।

"একদিন শিঙ্গায় (রণবংশীতে) ফুৎকার দেওয়া হবে, সে-ই শাস্তির দিন (কিয়ামত)। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হবে, তার সঙ্গে থাকবে তার কর্মের সাক্ষী (দুই ফেরেশতা)। (বলা হবে), তোমরা এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন (আমি আল্লাহ্) তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি। আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।" (৫০ সূরা 'কাফ্' ঃ আয়াত ২০-২২)।

"শোনো, যেদিন এক ঘোষক নিকটবর্তী স্থান থেকে ডাক দেবে, যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহাগর্জন, সেদিন উত্থানের দিন। আমি (আল্লাহ্) জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই আর সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে। এইভাবে (মৃতদের) সমবেত করা আমার জন্য অতি সহজ।" (৫০ সূরা কাফ্ ঃ আয়াত ৪১-৪৪)।

"নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) তাকে (মানুষকে) ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যেদিন গোপন তথ্যের পরীক্ষা হবে সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবে না আর (কেউ) সাহায্য করবে না।" (৮৬ সূরা তারিক ঃ আয়াত ৮-১০)।

"প্রত্যেক ব্যাপারের গতি তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে। ওদের (অবিশ্বাসীদের) কাছে খবর এসেছে যাতে আছে (কিয়ামতের) সাবধানবাণী-এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান; তবে এ সতর্কবাণী ওদের কোন উপকারে আসে না। অতএব, তুমি ওদের উপেক্ষা কর। যেদিন (আল্লাহ্র) আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে অপমানে চোখ নীচু করে, ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে, 'ভয়াবহ এ দিন!" (৩৮ সূরা কামার ঃ আয়াত ৩-৮)।

"এরা (অবিশ্বাসীরা) যে (কিয়ামতের) মহাগর্জনের অপেক্ষা করছে তাতে দম ফেলার ফুরসত পাবে না। এরা (ব্যঙ্গ করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের(শাস্তি বা পুরস্কারের) পাওনা মিটিয়ে দাও না।' এরা যা বলে তার জন্য তুমি (হে হযরত মুহাম্মদ) ধৈর্য ধর।" (৩৮ সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ১৬-১৭)।

www.pathagar.com

তারা তোমাকে (হযরত মুহাম্মদকে) জিজ্ঞাসা করে, সেই সময় (কিয়ামত) কখন ঘটবে?

"বলো, এ সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন"।

সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর। তুমি এ বিষয়ে ভালোভাবে জান– এই ভেবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, এ সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন, কিন্তু বেশীরভাগ লোক তা জানে না'।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৮৭)।

"যখন সিঙ্গায় (বাঁশিতে) ফুঁ দেওয়া হবে, তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ওরা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের। কে আমাদের ঘুম থেকে উঠালো? করুণাময় আল্লাহ্ তো এর কথাই বলেছিলেন, আর রাসূলরাও সত্যি বলেছিলেন।"

এ হবে এক মহাগর্জন। তখনই ওদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আর বলা হবে, 'আজ কারও ওপর কোন যুলুম করা হবে না। আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'।" (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৪৮–৫৪)।

"মানুষ আমার (আল্লাহ্র) ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা বানায়, অথচ তার নিজের সৃষ্ট হওয়ার কথা ভুলে যায় এবং বলে, 'হাড়ে আবার প্রাণ (পুনরায়) দেবে কে? যখন তা পচে-গলে যাবে?' বলো, 'ওর মধ্যে তিনি প্রাণ দেবেন যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে যিনি ভালো করেই জানেন।"(৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৪৮–৫৪)।

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি প্রাণহীন জমির দিকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি তা দিয়ে মাটিকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। পুনরুত্থান এভাবেই হবে।" (৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৯)।

"(কিয়ামতের) সময় ঠিকই আসবে। আমি (আল্লাহ্) এর কথা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফললাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি (সেই) সময়কে বিশ্বাস করে না, বরং নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে সেই বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে না দেয়, দিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১৫–১৬)।

www.pathagar.com

"সেদিন (কিয়ামতের দিনে) ওরা সসমনকারীর অনুসরণ করবে, এদিক-ওদিক করা চলবে না। করণাময়ের সম্মুখে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। পদশব্দ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে তারা তাও আয়ত্ত করতে পারবে না।

চিরঞ্জীব অনাদির কাছে সকলেই মুখ নীচু করে থাকবে। আর যে অত্যাচারের ভার বহন করবে সে হতাশ হয়ে পড়বে। আর যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তার কোন অত্যাচার বা ক্ষতির ভয় থাকবে না।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১০৮-১১২)।

"পরকালের শাস্তি তো আরও কঠিন, আরও স্থায়ী।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১২৭)।

"ওরা বলত, 'আমরা মরে হাড় ও মাটি হয়ে গেলেও কি আবার উঠানো হবে? আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও'? বলো, 'যারা আগে গেছে ও পরে যারা আসবে, সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে।" (৫৬ সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ৪৭-৫০)।

"আমি (আল্লাহ্) তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না (পুনরুত্থানে)?" (৫৬ সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ৫৭)।

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদের আবার উঠানো হবে? আমাদের তো এ ব্যাপারে ভয় দেখানো হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও এমন ভয় দেখানো হয়েছিল। এতো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বলো, 'পৃথিবীতে সফর কর ও (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বাড়ীঘর, শহর) দেখ অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছিল।" (২৭ সূরা নম্‌ল ঃ আয়াত ৬৭-৬৯)।

"এ ওদের প্রতিফল, কারণ ওরা আমার (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব?' ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই।" (১৭ সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ আয়াত ৯৭-৯৯)।

www.pathagar.com

"মৃত্যুর পর তোমাদের আবার উঠানো হবে– তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা বলে, 'ওতো স্পষ্ট অলীক কল্পনা'। আমি (আল্লাহ্) নির্দিষ্টকালের জন্য যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তো ওরা বলে, কে এতে বাধা দিয়েছে?

সাবধান, যেদিন ওদের কাছে এ আসবে সেদিন তা ওদের কাছ থেকে ফিরে যাবে না, আর যা নিয়ে ওরা হাসিঠাট্টা করে তা ওদেরই ঘিরে রাখবে। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৭–৮)।

"যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে– নিশ্চয় তার জন্য এর মধ্যে প্রাচীন (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে যার অনেকগুলি আরবে রয়েছে) নিদর্শন রয়েছে। এই সেদিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে– এই সেদিন, যখন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আর আমি (আল্লাহ্) তা নির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখব। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথাবার্তা বলতে পারবে না।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০৩–১০৫)।

"কিয়ামতের দিন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না।" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ১২)।

"যারা আল্লাহ্র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যখন হঠাৎ করে তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা বলবে, 'হায়! একে আমরা যে অবজ্ঞা করেছিলাম– আফ্সোস্ তার জন্য। তাদের পিঠে তারা তাদের পাপ বইবে। দেখ, তারা যা বইবে তা খুব খারাপ।" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ৩১)।

"আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারপর তাঁর দিকে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ৩৬)।

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।" (৩৩ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ২৮)।

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হবো না।'

বলো, 'কেন হবে না? তোমাদের ওর সম্মুখীন হতেই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন, আকাশ ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট বা বড় কিছুই যাঁর অগোচর নয়, ওর

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি স্পষ্ট কিতাবে লেখা হয়েছে। এ এজন্য যে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন। এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য ভয়ঙ্কর নির্মম শাস্তি রয়েছে।'

যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এ মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসাই আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদের বলে যে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুন করে আবার উঠানো হবে? হয় সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায়, নয় সে পাগল।'

না, যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারাই শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩-৮)।

"যারা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের বাসস্থান কি জাহান্নাম (দোযখ) নয়?" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬০)।

"সেদিন (যখন প্রথম বার) সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তার ফলে আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছা যাবে। তবে যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন, তারা নয়। তারপর আবার (দ্বিতীয়বার) সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তক্ষণি ওরা (মানুষ জীবন্ত হয়ে) দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। বিশ্ব প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব। আমলনামা (কর্মফল সনদ) উপস্থিত করা হবে এবং নবীদের ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে। আর সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।" (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৭-৭০)।

"অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়া নেমে এসে মানব জাতিকে গ্রাস করবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি।" (৪৪ সূরা দুখান ঃ আয়াত ১০-১২)।

"আর ওদেরকে আমি (আল্লাহ্) সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজেরাই একে অপরের ওপর ঈর্ষা করে ওরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে

www.pathagar.com

বিষয়ে মতদ্বৈততা করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ১৭)।

"ওরা বলে, 'পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। সময়ই আমাদের ধ্বংস করে।'

বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। ওদের কাছে যখন আমার (আল্লাহ্‌র) স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন ওদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এ কথা ছাড়া যে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর।"

বলো, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিন একত্র করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ী হবে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যেক সম্প্রদায় হবে ভয়ে নতজানু। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে ডাকা হবে ও বলা হবে, 'তোমরা যা করতে আজ তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।'

এ আমলনামা আমার কাছে সংরক্ষিত, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রেখেছিলাম।

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন। এ-ই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলা হবে, 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পড়া হয়নি? কিন্তু তোমরা তো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র কথা সত্য ও কিয়ামত ঘটবে এতে কোন সন্দেহ নেই', তখন তোমরা বলে থাক, 'কিয়ামত কি? আমরা জানি না, আমাদের এ বিষয়ে রয়েছে ঘোর সন্দেহ, আর আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।'

ওদের মন্দ কাজগুলো ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত, তা ওদের ঘিরে ফেলবে। ওদের বলা হবে, "আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয় হবে আগুন আর তোমাদের কেউ সাহায্য করবে না।" (৪৫ সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ২৪–৩৪)।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ডাকলে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? আর তারা ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে ওদের শত্রু, আর তারা অস্বীকার করবে তারা যা উপাসনা করতো।" (৪৬ সূরা আহ্‌কাফ ঃ আয়াত ৫–৬)।

"ওরা কি বোঝে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর এ সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম।"

তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যেদিন অবিশ্বাসীদের আগুনের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদের বলা হবে, 'একি সত্য নয়?'

ওরা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এ সত্য।'

তখন ওদের বলা হবে, 'শাস্তি ভোগ কর! তোমরা তো অবিশ্বাস করতে।' (৪৬ সূরা 'আহ্‌কাফ' ঃ আয়াত ৩৩–৩৪)।

"ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে ওরা যেন এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে থাকেনি।" (৪৬ সূরা আহ্‌কাফ ঃ আয়াত ৩৫)।

"শপথ তাদের, যারা উড়িয়ে নিয়ে যায়! শপথ তাদের, যারা বয়ে যায় (বৃষ্টির) ভার। শপথ তাদের, যারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে! শপথ তাদের, যারা আদেশে বিতরণ করে (আশীর্বাদ)! তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয় সত্য ও বিচারের দিন তো অবশ্যম্ভাবী। শপথ তরঙ্গিত আকাশের। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কথায় কোন মিল নেই।

যে এ (সত্যধর্ম) থেকে ফিরে যায়, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অভিশপ্ত সেই মিথ্যাবাদীরা, যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। ওরা বলে 'বিচারের দিন আবার কি?'

বলো, 'সেদিন আগুনে তাদের পরীক্ষা করা হবে।'

(তাদের বলা হবে) 'তোমরা শাস্তি ভোগ কর। তোমরাই এর জন্য তাড়াহুড়ো করেছিলে।" (৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ১–১৪)।

"তোমার কাছে তো কিয়ামতের সংবাদ এসেছে। সেদিন অনেকেরই মুখমণ্ডল হবে অবনত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ওদের

www.pathagar.com

খুব গরম ঝরণা থেকে পান করানো হবে। ওদের জন্য থাকবে না কোনো খাদ্য– শুকনো কাঁটা ছাড়া যা ওদের পুষ্ট করবে না এবং ওদের খিদেও মেটাবে না। সেদিন অনেকের মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল, নিজ কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত।" (৮৮ সূরা গাশিয়া ঃ আয়াত ১–৯)।

"যেদিন আমি (আল্লাহ্) পর্বতকে উপড়ে ফেলব আর তুমি পৃথিবীতে দেখবে একটা শূন্য ময়দান। আমি সেদিন সকলকে একত্র করব এবং কাউকেও অব্যাহতি দেব না। আর তাদের তোমাদের প্রতিপালকের সামনে সারি বেঁধে হাজির করান হবে। আর (বলা হবে), 'তোমাদের প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার সামনে হাজির হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আমি উপস্থিত করব না'। আর উপস্থিত করা হবে আমলনামা, আর ওতে যা লেখা আছে তার জন্য তুমি দোষীদের আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে।" (১৮ সূরা কাহাফ্ ঃ আয়াত ৪৭–৪৯)।

"ওরা জোর করে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' না, তাঁর পক্ষে এ সত্য প্রতিশ্রুতি; কিন্তু বেশীরভাগ লোক তা জানে না।" (১৬ সূরা নাহল্ ঃ আয়াত ৩৮)।

"তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ– আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তা তো পরিষ্কার করে প্রকাশ করে দেবেন।" (১৬ সূরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯২)।

"তবু ওরা ওদের পূর্ববর্তীদের মতো বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলেও আমরা মাটি ও হাড় হয়ে গেলেও কি আমাদের আবার উঠানো হবে? আমাদের তো এ ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে, আর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও। এতো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ৭৯–৮৩)।

"ওরা বলে, 'আমরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?'

ওরা তো ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাতকার অস্বীকার করে। বলো; 'মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ নেবে। শেষে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে'।" (৩২ সূরা সিজদা ঃ আয়াত ১০–১১)।

"ওরা পরস্পরকে কি জিজ্ঞাসা করছে সেই (কিয়ামতের) মহাসংবাদ সম্বন্ধে, যে বিষয়ে তারা একমত হতে পারে না? অবশ্যই তারা শীঘ্রই জানতে

www.pathagar.com

পারবে; অবশ্য অবশ্যই তারা জানতে পারবে।" (৭৮ সূরা নাবাঃ আয়াত ১-৫)।

"তারা (অবিশ্বাসীরা) বলবে, 'আমাদের আগের অবস্থায় ফিরানো হবে কি? হাড়গুলো পচে যাওয়ার পরও'? তারা বলবে, 'এ ফিরে যাওয়া তো সর্বনাশা।'

কিন্তু এ একটিমাত্র শোহরত (এর পরে হবে), আর দেখ, তারা (মৃত থেকে) জেগে উঠবে।" (৭৯ সূরা নাযিয়াত ঃ আয়াত ১০-১৪)।

"আর কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? আবার (বলি), কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? সেই একদিন সেদিন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।" (৮২ সূরা ইনফিতার ঃ আয়াত ১৭-১৯)।

"সে (অবিশ্বাসী) তার আপনজনের মধ্যে নিশ্চিন্তে ছিল এবং ভাবত যে, সে কখনই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে না। কিন্তু তার প্রতিপালক তো তার উপর নজর রেখেছিলেন (এবং তাকে বিচারের মুখোমুখি করেছেন)।" (৮৪ সূরা ইন্‌শিকাক ঃ আয়াত ১৩-১৫)।

"তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদের মাটি থেকে উঠার জন্য ডাকবে, তখন তোমরা উঠে আসবে।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ২৫)।

"ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদের আবার ওঠানো হবে (মৃত্যুর পরে) সেই মহাদিনে, যেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? না, দুষ্কৃতিকারীদের কর্মবিবরণী তো থাকবে সিজ্জীনে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান? এ এক লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী।

'সেদিন মিথ্যাচারীদের হবে মন্দ পরিণাম, যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী এ অস্বীকার করে, তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা।' না, তা সত্য নয়, তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ৪-১৪)।

"ইহুদীরা বলে, 'খৃস্টানদের কোন ভিত্তি নেই'; আর খৃস্টানরা বলে, 'ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন।" (২ সূরা বাকারাঃ আয়াত ১১৩)।

www.pathagar.com

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো করে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে (বেহেশ্‌তে) যেতে দেওয়া হবে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)।

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের শেষ বিচারের দিনে একত্র করবেন এতে তো কোন সন্দেহ নেই।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৮৭)।

"যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তো তাদের কথা; মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন পাব?' তারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদের গলায় থাকবে শিকল। ওরা আগুনে বাস করবে ও সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৫)।

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ! আমি (আল্লাহ্) তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর আংশিক আকারপ্রাপ্ত ও আংশিক আকারহীন মাংসপিণ্ড থেকে– তোমাদের কাছে আমার শক্তি প্রকাশ করার জন্য। আমি এক নির্দিষ্টকালের জন্য মার্তৃগর্ভে রেখে দিই। তারপর, আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও।

তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটবে আবার কেউ কেউ বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছবে, (তাই) সব কিছু জানার পরও তার আর কোনও জ্ঞান থাকবে না (বয়সের ভারে)।

তুমি মাটিকে দেখ নিষ্প্রাণ, তারপর আমি সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফলেফুলে–ফেঁপে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানা সুন্দর জিনিস। এই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

কিয়ামত ঘটবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদের আবার উঠাবেন। তবু মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশ ছাড়া, আলোকময় কিতাব ছাড়া আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কূটতর্ক করে। (অন্যদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য সে দম্ভভরে বিতণ্ডা করে। তার জন্য এই দুনিয়ায় আছে লাঞ্ছনা। কিয়ামতের দিনে আমি তাকে পুড়িয়ে শাস্তির স্বাদ নেওয়াব। সেদিন তাকে বলা হবে এ তো তোমার কৃতকর্মের ফল; কারণ,আল্লাহ্ দাসদের ওপর অত্যাচার করেন না।" (২২ সূরা হজ্জঃ আয়াত ৫–১০)

www.pathagar.com

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিশ্বাসী, ইহুদী, সাবেয়ী (আরবের এক প্রাচীন ধর্মের অনুসারী), খৃস্টান, মাজুস (আগ্নউপাসক) ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।" (২২ সূরা হজ্জঃ আয়াত ১৭)।

"অবিশ্বাসীরা ওতে (সরল পথে) সন্দেহ করা থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের কাছে হঠাৎ করে কিয়ামত এসে পড়বে বা এসে পড়বে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি। সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহ্রই। তিনি ওদের বিচার করবেন।" (২২ সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৫৫–৫৬)।

"আর তিনি (আল্লাহ্) তো তোমাদের জীবন দান করেদেন। তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন।" (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬৬)।

স্মরণ কর সেদিনের কথা, যে দিন ওদের সকলকে একত্রে উঠানো হবে (মৃত্যুর পরে) ও ওদের জানিয়ে দেওয়া হবে– যা ওরা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন যদিও ওরা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।" (৫৮ সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত ৬)।

"অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, ওদের কখনও (মৃত্যুর পরে) আবার ওঠানো হবে না। বল,'নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ। তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে।' এ আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ৭)।

"সেদিন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সমবেত করবেন, সেদিন হবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন ও তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য।

কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ফিরে যাওয়ার জন্য সে কি খারাপ জায়গা।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ৯–১০)।

কুরআন মজীদ থেকে উপরে বহু আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে মহাপ্রলয় ও পরবর্তীতে মহাবিচারের সমর্থনে। নাস্তিকগণ এগুলো অস্বীকার করলেও স্রষ্টার কিছু যায়- আসে না। স্রষ্টা তাঁর যুক্তিসমূহ তাঁর বাণীতে স্পষ্ট করেছেন। পাপ-পুণ্য অবশ্যই রয়েছে। তবে পাপ-পুণ্য না থাকলে স্রষ্টা থাকবেন না, এমন কোন যুক্তি নেই। মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করতে পাপ-পুণ্য

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী এসে পড়ে। পাপ আছে বলে স্রষ্টা থাকবেন না, এটি একটি অনুমান মাত্র নাস্তিকদের। স্রষ্টা ইবলীস শয়তানকে সৃষ্টি না করলে হয়ত পাপের জন্ম হতো না। তবে শয়তানের জন্মের পূর্বেই স্রষ্টা অবস্থান করছেন। শয়তান বা পাপ একটি কালে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি স্রষ্টার মহাজগত পরিচালনার একটি কৌশল বটে।

কুরআন বলে, 'তিনি (আল্লাহ্) তাঁর দাসদের (মানুষের) পাপ সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৫৮)।

"আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ করে, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে।" (৬ সূরা আনআম ঃ আয়াত ১২০)।

"হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে ও যাদের পাপরাশি তাদের ঘিরে রাখে, তারাই অগ্নিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (২ সূরা বাকারাঃ আয়াত ৮১)।

"দেখ! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কৈমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এই যথেষ্ট।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৫)।

"আর যে কেউ পাপ কাজ করে, সে তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১১)।

"যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়, তারা দারুণ পথভ্রষ্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। আর তাদের কোনো পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের (দোযখের) পথ ছাড়া, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ-তো আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৭-১৬৯)।

"যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্র পথে মানুষকে বাধা দেয়, তারপর অবিশ্বাসকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।" (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ৩৪)।

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্তা, সব কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির অর্থ দান করলে আর নামায কায়েম করলে ও যাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী ও সাবধানী।" (২ সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৭৭)।

www.pathagar.com

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্তাআলা বলবেন ঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে ঃ আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ বলবেন' ঃ সামনে লওহে-মাহফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেন ঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত মা'আরেফুল কোরআন,' পৃষ্ঠা ৮১০)।

উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে পাপ-পুণ্য রয়েছে, মন্দও রয়েছে, ভালোও রয়েছে। স্রষ্টা শুধু মন্দ দিয়ে পৃথিবী ভরে দেন নাই; পৃথিবীতে শতকরা একশতভাগ ভালোর অবস্থারও গ্যারান্টি দেন নাই। মানুষকে যে প্রচণ্ড রকমের স্বায়ত্ত শাসন ও ক্ষমতা স্রষ্টা দিয়েছেন তারই পরিণতি পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ।

ভাল-মন্দের প্রশ্নের সঙ্গে বেহেশ্ত-দোযখ, পুরস্কার-শাস্তির কথা এসে যায়। কোন কোন নাস্তিক দুনিয়াতে স্বর্গ কামনা করে, কেউ কেউ সাম্যবাদী স্বর্গ ইত্যাদি। কিন্তু এসব স্বর্গ খোদায়ী স্বর্গের বর্ণনার ধারে-কাছেও নেই। মানুষ যা কিছু আদর্শ অবস্থান ও আদর্শ শান্তি কল্পনা করতে পারে, তা কুরআনের বেহেশ্ত ও দোযখে বিস্তারিত রয়েছে। বেহেশ্ত-দোযখ আসলেই আদর্শ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বাস্তব রূপ।

কুরআন বলে, "জান্নাত (বেহেশ্ত) উপস্থিত করা হবে সাবধানীদের কাছে। (তাদের বলা হবে), "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র অনুরাগী ও সাবধানীদের প্রত্যেককে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যারা না দেখে করুণাময় আল্লাহ্কে

www.pathagar.com

ভয় করে ও নম্রভাবে উপস্থিত হয় তাঁর কাছে (তাদের বলা হবে), 'শান্তির সাথে তোমরা ওখানে প্রবেশ কর; এই দিন থেকেই অনন্ত জীবন'। সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে। আর আমার (আল্লাহ্‌র) কাছে রয়েছে তারও বেশী।" (৫০ সূরা কাফ্ ঃ আয়াত ৩১-৩৫)।

"সাবধানীরা থাকবে নহর ধৌত জান্নাতে (বেহেশ্‌তে), যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র কাছে।" (৫৪ সূরা কামার ঃ আয়াত ৫৪ -৫৫)।

"আমি (আল্লাহ্) কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর আমি তাদের অন্তর হতে মনোমালিন্য দূর করব, তাদের নিচে নদী বইবে ও তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই- যিনি আমাদের এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলেরা তো সত্য বাণী এনেছিল।

আর তাদের সম্বোধন করে বলা হবে যে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদের এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

জান্নাতবাসীরা দোযখবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। আমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?'

ওরা বলবে, 'হ্যাঁ'। তারপর এক ঘোষণাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে, সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ'।" (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ৪২-৪৪)।

"ওদের জিজ্ঞাসা কর, 'এই-ই (দোযখ) ভালো, না স্থায়ী জান্নাত- যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদের? এ-ই পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে ও চিরকাল থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব তোমার প্রতিপালকেরই।" (২৫ সূরা ফুরকান আয়াত ১৫-১৬)।

"আর যারা তাঁর কাছে বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকাজ করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মর্যাদা- স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ পুরস্কার তাদেরই জন্য-যারা পবিত্র।" (২০ সূরা তা'হা ঃ আয়াত ৭৫-৭৬)।

www.pathagar.com

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আর তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ২৩)।

"যারা ভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০৮)।

"তারা (বেহেশ্‌তবাসী মানুষ) একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল, সে বলত, 'তুমি কি সত্যি এতে বিশ্বাস কর যে, আমাদের মৃত্যুর পর, আমরা হাড় ও মাটি হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আবার হিসাব নেওয়া হবে'? বলা হল, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?' তারপর সে ঝুঁকে দেখবে আর তাকে জাহান্নামের (দোযখের) মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, 'তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকে তো শাস্তি দেওয়া হত। আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর আর আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না।' নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। এমন সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত। আপ্যায়নের জন্য কি এ-ই শ্রেয়, না ঝাক্কুম গাছ (দোযখের একটি নিকৃষ্ট খাদ্যের উপাদান)" (৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৫০–৬২)।

"যারা বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, 'তোমরা ভয় পেও না, চিন্তা করো না।

আর তোমাদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দ কর। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে, যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা কামনা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালুর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে এ হবে এক আপ্যায়ন'।" (৪১ সূরা হামিম সিজ্‌দা ঃ আয়াত ৩০–৩২)।

"যারা বলে, ' আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্' এবং এ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নাই ও তারা দুঃখিতও হবে না। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ-ই তাদের কর্মফল।" (৪৬ সূরা আহ্‌কাফ ঃ আয়াত ১৩–১৪)।

"সেদিন সাবধানীরা থাকবে ঝরণাঝরা জান্নাতে, উপভোগ করবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদের দেবেন। কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল

www.pathagar.com

সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমে কাটাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত।" (৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ১৫–১৯)।

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস (শ্রেষ্ঠ বেহেশ্‌ত) যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও পরিবর্তে অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না।" (১৮ সূরা কাহফ্ ঃ আয়াত ১০৭–১০৮)।

"কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, তারাই বাস করবে জান্নাতে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮২)।

"আর তারা বলে, ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ তাদের মিথ্যা আশা। বলো, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১১)।

"সেদিন (পরকালে) তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের, তাদের সামনে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুখবর জান্নাতের– যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য।" (৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১২)।

"সাবধানীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা ওর নিচে নদী বইবে, ওর ফল ও ছায়া চিরস্থায়ী যারা সাবধানী তাদের কর্মফল– আর অবিশ্বাসীদের কর্মফল আগুন।" (১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৫)।

"তুমি যখন সেখানে (জান্নাতে) দেখবে, দেখতে পাবে পরম সুখের এক বিশাল রাজ্য।" (৭৬ সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ২০)।

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে তাদের পুরস্কার– স্থায়ী জান্নাত– যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট। এ তো তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।" (৯৮ সূরা বায়্যেনাহ ঃ আয়াত ৭–৯)।

আল্লাহ্ বলবেন, "এই সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য আছে জান্নাত– যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবে আর তারাও তাতে সন্তুষ্ট হবে। এ-ই মহাসাফল্য (৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৯)।

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।" (৯ সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১১)।

"আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যার নিচে নদী বইবে– সেখানে তারা থাকবে চিরকাল– আর স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানে, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে ভালো আর সে-ই মহাসাফল্য।" (৯ সূরা তওবা ঃ আয়াত ৭২)।

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। যারা মন্দ কাজ করে, তাদের তিনি দেন মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তাদের দেন উত্তম পুরস্কার।" (৫৩ সূরা নজম ঃ আয়াত ৩১)।

"আমি (আল্লাহ্) তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে। তারপর আমি তাকে হীনাদপি হীনে পরিণত করি, কিন্তু তাদের নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।" (৯৫ সূরা ত্বীন ঃ আয়াত ৪–৬)।

"জেনে রাখ, আল্লাহ্র বন্ধুদের কোনো ভয় নাই ও তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য সুখবর পার্থিব জীবনে ও পরকালে। আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই মহাসাফল্য।" (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬২–৬৪)।

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আছে সুখকর উদ্যান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।" (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৮–৯)।

"যে সৎকাজ করে, সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের ওপর কোনো যুলুম করেন না।" (৪১ সূরা হা-মিম সিজদা ঃ আয়াত ৪৬)।

"যে সৎ কাজ করে, সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে।" (৪৫ সূরা জাছিয়াহ ঃ আয়াত ১৫)।

"যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সে-ই দায়ী। যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করে। কারণ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।" (৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৪৪–৪৫)

www.pathagar.com

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)।

"অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে অবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের অবহিত করবার নয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন (বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করতে)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার। (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৯)।

"আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, যার নিচে নদী বইবে; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ্র চেয়ে বড় সত্যবাদী?" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২২)।

"আর পুরুষই হোক বা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে ও তাদের প্রতি অণুপরিমাণ যুলুম করা হবে না।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৪)।

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তোমাদের পুরো পুরস্কার দেবেন, আর নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন। কিন্তু যারা অবজ্ঞা করে ও অহংকার করে তিনি তাদের নিদারুণ শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ ছাড়া তারা তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৭৩)।

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচে নদী বইবে, কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে না, ভোগ-বিলাসে মেতে থাকে ও জন্তু-জানোয়ারের মতো পেটপুরে, তারা বাস করবে জাহান্নামে (দোযখে)।" (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ১২)।

"বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্য নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত (অভাবীদের জন্য প্রদত্ত অর্থ) দেয় ও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (৯ সূরা তওবা ঃ আয়াত ৭১)।

"আমি (আল্লাহ্) তো বহু জীন ও মানুষ জাহান্নামের (দোযখের) জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না– এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট, এরাই উদাসীন।" (৭ সূরা ঃ আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)।

www.pathagar.com

"তারপর যারা হতভাগ্য, তারা আগুনে থাকবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।" (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০৬-১০৭)।

'তাছাড়া, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।" (৪১ সূরা হা-মিম সিজ্‌দা ঃ আয়াত ২২-২৩)।

"আমি (আল্লাহ্) তো অবিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব আর নিশ্চয়ই আমি ওদের খারাপ কাজ-কর্মের প্রতিফল দেব। জাহান্নাম, এ-ই আল্লাহ্‌র শত্রুদের পরিণাম। আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অবিশ্বাসীরা (পরকালে) বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক। যে সব জীন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের দেখিয়ে দাও- আমরা ওদের পায়ে পিষে ফেলব, যাতে ওরা অধোনমিত হয়।" (৪১ সূরা হা-মিম সিজদা ঃ আয়াত ২৭-২৯)।

"সকাল-সন্ধ্যায় ওদের (পাপীদের) আগুনের সামনে হাজির করা হবে ও যেদিন কিয়ামত ঘটবে, সেদিন ফেরেশ্‌তাদের বলা হবে (মিসরের) ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে ফেলে দাও। যখন ওরা জাহান্নামের নিজের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করবে তখন দুর্বলেরা প্রবলদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করেছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের জন্য জাহান্নামে আগুন কিছু কমাবার চেষ্টা করবে?" প্রবলেরা বলবে, "আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের বিচার করে ফেলেছেন।" (৪০ সূরা মুমিনঃ আয়াত ৪৬-৪৮)।

"অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি কমানো হবে না। আর ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। আমি ওদের ওপর যুলুম করিনি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ওরা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা), তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিক না।'

সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।'

ওরা (পাপীরা) কি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে? সিদ্ধান্ত তো আমারও (আল্লাহ্‌রও) রয়েছে। ওরা কি মনে করে আমি (আল্লাহ্) ওদের গোপন বিষয় ও

www.pathagar.com

পরামর্শের খবর রাখি না। অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা ওদের কাছে অবস্থান করে সব লিখে রাখে।" (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৭৪–৮০)।

"ঝাক্কুম গাছ (জাহান্নামের এক প্রকার ক্ষতিকারক গাছ) হবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তামার মতো তা তার পেটে ফুটতে থাকবে, উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটতে থাকে। (বলা হবে), 'ওকে ধর ও টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে, তারপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। স্বাদ নাও হে (পৃথিবীর তথাকথিত) শক্তিশালী সম্মানিত! এ সম্পর্কে তো তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।" (৪৪ সূরা দুখান ঃ আয়াত ৪৩–৫০)।

"তারপর ওরা (অবিশ্বাসীরা পরকালে) আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা তো কখনো খারাপ কাজ করিনি।' হ্যাঁ, তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন, তাই তোমরা জাহান্নামের দরজায় ঢোক, সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কি খারাপ!" (১৬ সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ২৮–২৯)।

"তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে অস্বীকার করে ও ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসক্ষেত্রে, জাহান্নামে যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট এই বাসস্থান। আর ওরা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ বানায়। বল, ভোগ করে নাও। অবশেষে আগুনই হবে তোমাদের ফেরার জায়গা।" (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ২৮–৩০)।

"ওরা (দোযখে পতিত পাপীগণ) বলবে, 'অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী (নবী বা ধার্মিক বিশিষ্ট ব্যক্তি) এসেছিল, আমরা ওদের মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম ও বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাও তো বড় ভুলের মধ্যে রয়েছ।'

আর ওরা আরও বলবে, 'যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমাদের জাহান্নামে বাস করতে হতো না।'

ওরা ওদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।" (৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৯–১১)।

"যারা (আল্লাহকে) অবিশ্বাস করে দেশ-বিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায়, তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এতো সামান্য উপভোগ। তারপর তারা জাহান্নামে বাস করবে। আর তা কত খারাপ বাসস্থান।" (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৬–১৯৭)।

www.pathagar.com

"যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে (অর্থাৎ পাপীগণ) তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশ্‌তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম (তাই আল্লাহ্‌র পথে আসার আমাদের সাহস ও সুযোগ ছিল না)'; তারা (ফেরেশতাগণ) বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে কি বসবাস করতে পারতে না?' –এরাই বাস করবে জাহান্নামে, আর তা কত খারাপ বাসস্থান!" (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯৭)।

"কিতাবী ও অংশীবাদীদের (মধ্যে) যারা অবিশ্বাস করে, তারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে– ওরাই তো সৃষ্টির অধম।" (৯৮ সূরা বায়্যেনা ঃ আয়াত ৬)।

"যখনই কোনো দল সেখানে প্রবেশ করবে তখনই তারা অন্য দলকে অভিশাপ দেবে, এমনকি যখন সকলে সেখানে একত্র হবে তখন যারা তাদের পরে এসেছিল তারা তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের সম্বন্ধে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদের দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।'

তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা জান না।' আর তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদের বলবে, 'আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।" (৭ সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৮–৩৯)।

"জান্নাতবাসীরা দোযখবাসীদের সম্বোধন করে (পরকালে) বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যা বলেছিল তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?'

ওরা বলবে, 'হ্যাঁ'। তারপর এক ঘোষণাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে, সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।' যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত ও তার মধ্যে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করত।' আর তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করত।" (৭ সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৪–৪৫)।

"দোযখীদের দলপতিদের বলা হবে, 'এ-ইতো একদল তোমাদের সঙ্গে (দোযখে) প্রবেশ করছে। এদের জন্য অভিনন্দন নেই, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।' অনুসারীরা (তাদের দলপতিদের) বলবে, 'তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের এর (দোযখের) সামনে এনেছ। বাস করার জন্য একি খারাপ জায়গা!"

(তারপর) তারা (দলপতিদের অনুসারীরা) বলবে, 'হে আমাদের

www.pathagar.com

প্রতিপালক! যে আমাদের এর সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করে দাও।' তারা আরো বলবে, 'আমাদের কি হল যে, আমরা যাদের মন্দ বলে মনে করতাম, তাদের দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি আমরা নিরর্থক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম। কেন, আমাদের চোখ ও ওদের (যারা পৃথিবীতে আমাদের বিরুদ্ধবাদী, মুসলমান ছিল তাদের) দেখতে পাচ্ছে না (এই দোযখে)?'

অবশ্যই অগ্নিবাসীরা (দোযখে) নিজের মধ্যে এই তর্কাতর্কি করবে।" (৩৮ সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৫৯–৬৪)।

পরকাল যে অবশ্যম্ভাবী তাই প্রতিপন্ন করেছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে। আর পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি অবধারিত।

(২৪) বলা হয় যে, নাস্তিকতাবাদ যারা মান্য করে, তারা মানবতাবাদী, মানুষের মূল্য অনুধাবন করে, মানব সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেয়। তারা কলা, বিজ্ঞান, শিল্পকে উৎসাহ দেয়। বর্ণবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, শিশু নির্যাতন ইত্যাদিকে ঘৃণা করে।

আমরা বলব যে, নাস্তিকগণ যেসব ভালো কাজ আছে সেগুলো করলে ভালোই বলা হবে। তবে এসব কাজ আস্তিকগণও করে। আবার উভয় দলে মন্দ লোকেরও অভাব নেই। কম্বোডিয়ার খেমাররুজ কম্যুনিস্ট নাস্তিকগণ দেশের বিশ লাখ লোককে গায়েব করে দিল একটি অবাস্তব 'ইউটোপিয়া' প্রতিষ্ঠায়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নাস্তিক রাজনীতিবিদগণ কোন কোন সংখ্যালঘু 'রেস' ও জাতিসত্তা এক প্রকার নিশ্চিহ্নই করে ফেলে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে। ক্রিমিয়ার তাতার ও চেচনিয়ার মুসলমানদের উপর নাস্তিকগণ কম অত্যাচার করে নাই।

তবে কথা হলো কি– নাস্তিকগণের ভিতর যারা সত্যিকারের মানবতাবাদী আছেন, তাদের সমর্থন করতে গিয়ে স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে হবে কেন? নাস্তিকদের খণ্ডিত মানবতাবাদের খণ্ডিত সমর্থন স্রষ্টাকে উড়িয়ে দিতে যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত করা যাবে না।

(২৫) বলা হয় যে, নাস্তিকতা আসলে আস্তিকতা শাণিত হওয়ার জন্য সাহায্য করে। নাস্তিকতা আছে বলে বিশ্বাসীরা অবাস্তব যুক্তিতর্ক পরিহার করে এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়। আর তাদের প্রবল উৎসাহের রাশ ধরে টান দেয়। নাস্তিকতা না থাকলে বিশ্বাসীরা কাদের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনা করে স্রষ্টা সম্পর্কে নিজস্ব তত্ত্বের সার্বিক রূপ দিত?

আমরা বলব যে, স্রষ্টা যদি থেকেই থাকে, তাহলে উপরের এ যুক্তি মানার কি সার্থকতা। নাস্তিকতা আছে বলে আস্তিকদের শ্রেষ্ঠাত্ব সঠিক রূপ পাচ্ছে– এটি একটি সঠিক যুক্তি হলো না। নাস্তিকতা মান্য করলে, স্রষ্টার স্থানই সেখানে

www.pathagar.com

থাকছে না। কাজেই নাস্তিকতা স্রষ্টার থাকা-না থাকার ব্যাপারে কোন কিছু করতে সক্ষম নয়। স্রষ্টার স্থিতি নাস্তিকতার উপর নির্ভরশীল নয়।

(২৬) স্রষ্টা নেই– এ মতের পিছনে পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত সমর্থন নেই। আস্তিকদের কতিপয় যুক্তিকে কথার মারপ্যাঁচে নস্যাৎ করলেই প্রমাণিত হবে না– নাস্তিকতাই সঠিক। এর দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হতে পারে যে, আস্তিক তার যুক্তি-তর্ক যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয় নাই। উপস্থাপিত যুক্তির বাইরেও যুক্তি থাকতে পারে যা আস্তিক এখনও আয়ত্তে আনতে পারে নাই। সময় হয়ত যুক্তিকে শাণিত করবে। আইনস্টাইনের বেশ কিছু তত্ত্বের তাৎক্ষণিক প্রমাণ ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু এখন কোন কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর অপ্রমাণিত তত্ত্বসমূহ প্রমাণ করছেন। স্রষ্টা যেখানে পদার্থ বিদ্যার কোন পদার্থ নয়, একটি মেটাফিজিক্যাল বিষয়, সেখানে জটিলতর এই ইস্যুটি তাড়াহুড়ো করে নাকচ করা অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড হবে। স্রষ্টা আছে বলে বহু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মন্তব্য করে গেছেন, তা পদার্থবিদ্যার ছকে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্রষ্টা পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু নয়। আর পদার্থ বিদ্যার বাইরেও জ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

(২৭) নাস্তিকদের নাস্তিকতার একটি যুক্তি হলো স্রষ্টাকে দেখা যায় না। আমরা বলব, সব অস্তিত্বসম্পন্ন জীব ও দ্রব্য কি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না, তার অনেকই অণুবীক্ষণও দূরবীন যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। বায়ু, অক্সিজেন, মাধ্যাকর্ষণ, ইথার, বৈদ্যুতিকশক্তি, চুম্বকশক্তি আরো কত কিছু দৃষ্টিতে আসে না। তবু সেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। চোখ দিয়ে না দেখেও কাজ দেখে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিশ্বাস করি। চোখের সাহায্যে দেখি, তাই দৃষ্টিশক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করি। কান দিয়ে শুনি, তাই শ্রবণশক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করি। ('যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, খন্দকার আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা ২৭)।

কুরআন বলে, "যখন তোমরা (মূসার সম্প্রদায়) বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না।' তখন তোমরা (এই রূপ দাবী করায় শাস্তি স্বরূপ ৭০ জন ইহুদী প্রতিনিধি) বজ্রাহত হয়েছিলে, আর তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৫৫)।

"যারা আমার (আল্লাহ্‌র) সাক্ষ্য (পরকালে) কামনা করে না, ওরা বলে, 'আমাদের নিকট ফেরেশতা (এঞ্জেল্‌স্‌) অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং ওরা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।"

"যেদিন ওরা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য

www.pathagar.com

সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর'।" (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ২১-২২)।

"এবং যারা কিছু জানে না, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৮)।

•"তারা শুধু এরই না প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফেরেশ্তা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে-ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই। বল, 'প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি।"(৬ সূরা আন্'আম ঃ আয়াত ১৫৮)।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেন,

"দৃশ্যমানতার বাইরেও মানুষের উপলব্ধিগত একটা দিক আছে। আমরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু যা প্রত্যক্ষ করি না, তা-ও যে আছে তা অনুভব করি এবং সে অনুভূতির সাহায্যে তাকে আমরা অস্তিত্বের অন্তর্গত করি। যেমন– বাতাস। বাতাস আমরা দেখি না, কিন্তু বাতাস আমাদের অস্তিত্বের অন্তর্গত। বেঁচে আছি বলেই আমরা জানি যে, বাতাস আছে বলেই আমরা আছি। এখানেও সত্যটা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু সত্যটা অনুভবের বস্তু। কোন অস্তিত্ব দেখা যায়, কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। যা দেখা যায় না তা অনুভূতির সাহায্যে আমরা মান্য করি। মানুষের কতকগুলো ইন্দ্রিয় আছে, সেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে দর্শন করে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, স্বাদ গ্রহণ করে, আবার আঘ্রাণ নেয়। এগুলো সবই কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। আমার একটি অস্তিত্ব আছে বলেই আমার দৃষ্টির অনুভূতি আছে, স্পর্শের অনুভূতি আছে। আমি স্পর্শ করে একটি বস্তুর উষ্ণতা ও শীতলতা অনুভব করতে পারি এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারি। আমি একটি উষ্ণতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, তেমনি শীতলতাকেও কতটা শীতল এবং কতটা উষ্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু উষ্ণতা অথবা শীতলতাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আমরা দাহনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং বরফকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু উষ্ণতা ও শীতলতাকে অনুভব করতে হয়। মানুষের এক বিস্ময়কর চেতনালোকে আছে, সেই চেতনালোকে যখন সাড়া পড়ে তখন উষ্ণতা ও শীতলতার ব্যাখ্যা আমাদের মনে আসে। তাই প্রত্যক্ষে এলেই একটি বস্তু সত্য হবে তা নয়, অপ্রত্যক্ষেরও সত্যবোধ আছে। সব মানুষ

www.pathagar.com

অবশ্য সত্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু যারা সচেতন তারা নির্ভাবনায় বলতে পারেন–'যা আছে তার সবটাই দৃষ্টিতে নেই, অনেকটা আছে আমার অনুভূতিতে। এই অনুভূতিকে আমি যদি নির্ণয় করতে পারি, তা হলে অস্তিত্বকে আমি নির্ণয় করতে পারব।'

মানুষের আরেকটি অনুভূতি হচ্ছে গন্ধের অনুভূতি। পৃথিবীতে সর্বত্র নানা প্রকার গন্ধ আছে। শুকনো মাটির গন্ধ আছে, ভেজা মাটির গন্ধ আছে। বাতাস কখনও কখনও অজানা গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। উদ্ভিদ জগতে বিচিত্র গন্ধ আছে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ অনেক রকম। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সে পৃথিবী বিচিত্র এক গন্ধের পৃথিবী।

একজন মানুষ গন্ধের সাহায্যে একটি অস্তিত্বের সাড়া পায়। গন্ধের উৎস অনেক সময় আমরা জানি না, কিন্তু গন্ধকে আমরা পাই রূপহীন, নিঃশ্বাসের মধ্যে। এভাবে দেখা যাবে, অস্তিত্ব এমন এক বস্তু– যার রূপ আছে, আবার রূপ নেই, যার আকৃতি আছে, আবার আকৃতি নেই; যার গন্ধ আছে, কিন্তু তার উৎস অনির্ণেয়; তার উষ্ণতা আছে, অথচ তা প্রত্যক্ষের বিচারে নেই। এভাবে আমাদের পৃথিবী অস্তিত্বের বহুবিদ বিস্ময় নিয়ে বিদ্যমান। আমরা কখনই সরলীকরণ করে অস্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে পারব না।

পার্থিব অস্তিত্ব যেখানে এত জটিল, সেখানে অস্তিত্বের অতীত যে অস্তিত্ব, তাকে আমরা কি করে অনুভব করব? প্রশ্ন হতে পারে, অস্তিত্বের অতীত আবার অস্তিত্ব কি?

পূর্বেই বলেছি, অধিকাংশ অস্তিত্বই অপ্রতুলতার বাইরে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্যের সীমার মধ্যে সহজে আসবে না। তা এত মহান, এত বিরাট এবং এত অকল্পনীয় যে, তাকে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বোধের আয়ত্বে আনতে পারি না। যেমন– অসম্ভব শব্দ যা আমাদের শ্রবণ ধারণ করতে অক্ষম, সে শব্দের সাড়া আমরা পাই না। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ে জানি, সে শব্দ আছে। তেমনি অস্তিত্বের অতীত যে অস্তিত্ব তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধিকারে নেই, কিন্তু তা বিশ্বাসের অভিনিবেশে এবং প্রত্যয়ে আছে।" (আল্লাহর অস্তিত্ব, পৃঃ ৩০–৩১)।

(২৮) নাস্তিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রচুর সমালোচনা করেছে। সেই সঙ্গে ইসলামের সমালোচনা করেছে। আর এসব সমালোচনার পরিণতি হলো নাস্তিকতা। যেভাবে বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মে যেভাবে অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে অন্য ধর্মসমূহে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত

www.pathagar.com

হয়েছে, এই একই ছাঁচে ইসলামকে ফেলা যাবে না। ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের চূড়ান্ত পরিণতি হলো ইসলাম। ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদে যে সব অযৌক্তিক মতবাদ ঢুকে পড়েছে, ইসলাম সে সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে। কাজেই শুধু ইহুদীবাদ খৃষ্টবাদের সমালোচনা করে স্রষ্টাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক হবে। নাস্তিককে ইসলামের সম্মুখীন হতে হবে।

সব ধর্ম এক নয়, যদিও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকতে পারে। বৈসাদৃশ্য পূর্ণ অংশে এত বেশী বৈসাদৃশ্য রয়েছে যে, সব ধর্মকে এক ছাঁচে মোটেও ফেলা যাবে না। খৃষ্টবাদ ইসলামের খুব কাছাকাছি, তবু ইসলাম কোন দিনই স্রষ্টার পুত্রতত্ত্ব বা তিন খোদার তত্ত্ব (ত্রিত্ববাদ) মান্‌বে না। আর স্রষ্টা এক না তিন, স্রষ্টার পুত্র-কন্যা আছে, কি নাই, এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণে ইসলামের যুক্তিই যুক্তিগ্রাহ্য ও বৈজ্ঞানিক। খৃষ্টবাদের পুত্রতত্ত্ব বা ত্রিত্ববাদ শেষতক নাস্তিকের হাতে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই লোপাট করেছে। ইসলামে সে সংকট নেই।

খন্দকার আবুল খায়ের (পৃষ্ঠা ১০১) সত্যধর্মের সন্ধান পেতে ছয়টি মূলনীতি প্রদান করেছেন। প্রথম শর্ত হচ্ছে, মনকে নিরপেক্ষ ও গোঁড়ামীমুক্ত করতে হবে এবং কোন ধর্ম ঠিক তা বুঝতে হলে বুঝার পূর্বে নিজেকে ধরে নিতে হবে যে, সন্ধানকারী কোন ধর্মেরই লোক নয়। দ্বিতীয়ত যুক্তি মানতে রাজি থাকতে হবে অর্থাৎ সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত– মানতে হবে ধর্ম কোন পৈতৃক সম্পদ নয়। এ হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার।

চতুর্থত– মানতে হবে বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্ত বা বংশের সঙ্গে নয়, এর সম্পর্ক সম্পূর্ণই জ্ঞানের সঙ্গে।

পঞ্চমত– মানতে হবে যে, পূর্ব পুরুষের ভুল-বিশ্বাস অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য।

ষষ্ঠত– মানতে হবে যে, পূর্বপুরুষের ভুল-বিশ্বাস যদি পরিবর্তনযোগ্য না-ই হতো, তাহলে জ্ঞান চর্চার কোন মূল্যই থাকতো না।

পূর্বপুরুষদের জাগতিক ভুল-বিশ্বাস যদি অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে, তাহলে ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ পুরুষদের ভুল-বিশ্বাসও পরিবর্তিত হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষদের ভুল-বিশ্বাস ত্যাগ করা যেমন কারও কোন প্রকার অমর্যাদা হয় নাই বরং মর্যাদা বেড়েছে, ঠিক তেমনই ধর্ম সম্পর্কীয়

www.pathagar.com

পিতৃপুরুষের ভুল-বিশ্বাস ত্যাগ করলেও মর্যাদা হ্রাস পাবে না বরং বৃদ্ধি পাবে। এসব যারা মানতে প্রস্তুত, তাদেরই চোখে ধরা পড়বে যে, কোন্‌টা ঠিক ধর্ম আর কোন্‌টা ঠিক নয়।

খন্দকার আবুল খায়ের (পৃষ্ঠা ১০৩) লেখেন যে, পরকালের মুক্তির পথ একটাই, বহু নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়– আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য একইভাবে কার্যকর রয়েছে। যেমন– দেখুন খাদ্যের ব্যাপারে, প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুই প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্য একই প্রকার ফল দেয়। ঠিক তেমনই রোগ চিকিৎসার বেলায়ও প্রত্যেক জাতির লোকের একই রোগে একই ঔষধ প্রয়োজন হয়। আমরা এরূপ কখনও দেখি না যে, মুসলমানদের কলেরায় স্যালাইন, হিন্দুদের কলেরায় কুইনাইন, খৃষ্টানদের কলেরায় এটেভীন, বৌদ্ধদের কলেরায় স্যাফাক্রিন, নাস্তিকদের কলেরায় নোভালজীন– এ ধরনের কোন ব্যবস্থা যেমন পার্থিব জীবনে নেই, ঠিক তেমনই পরকালীন জীবনেও বিভিন্ন জাতির মুক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার কোন ব্যবস্থা নেই। যে কোন জাতির লোকের একই রোগের যেমন একই ঔষধ প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনই পরপারের জীবনেও একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যেকের মুক্তি আসবে এটাই যুক্তি। একই রাষ্ট্রে যেমন এমন কোন আইন থাকতে পারে না যে, কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর কেউ চুরি করলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে; ঠিক তেমনই আল্লাহ্‌র আইনও এমন হতে পারে না যে, কেউ দেবতার পূজা করলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং কেউ তা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া বা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সঠিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, একই আল্লাহ্‌র আইন তার সৃষ্টি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একই প্রকার হতে হবে। অর্থাৎ পরকালের মুক্তির জন্য হরিদাস বাবুর জন্য যদি দুর্গাপূজার দরকার হয়, তবে আব্দুল্লাহ্‌ সাহেবের জন্যও তা দরকার হবে এবং দরকার হবে তা পোপ পলের জন্যও। আর যদি ইসলামী বিধান মেনে চলার প্রয়োজন হয় পরকালের মুক্তির জন্য, তবে এটাই প্রয়োজন হবে প্রত্যেকের জন্য। এটাই যুক্তি এবং এটাই বিবেকের সাক্ষ্য। এ ছাড়া বিবেক আরও সাক্ষ্য দেবে যে, এন্ড্রিন যেমন সব জাতের মানুষের জন্যই বিষ, ঠিক তেমনই পরকালের জীবনের জন্য যা বিষবৎ, যা হবে জাহান্নামের কারণ, তা প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্যই হবে জাহান্নামের কারণ।

কোন কোন ব্যক্তি যুক্তি দেখান যে, নানা পথেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে। আমরা বলব যে, এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। দু'টি বিন্দুর মাঝে একটি মাত্র সরল রেখা থাকে। সরল রেখাই সংক্ষিপ্ততম পথ, সহজ পথ। অন্যান্য পথ নিশ্চয়

www.pathagar.com

বাঁকা ও বিপদসঙ্কুল। সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত পথ থাক্‌তে অনিশ্চিত, বক্র, বিপদপূর্ণ পথে কি বুদ্ধিমান পা দেবে?

মুসলমান জাতি এমন একটা কথায় বিশ্বাস করে, যা অন্য কোন জাতি বিশ্বাস করে না। তা যদি করে, তাহলে তাদের ধর্ম টিকে না। তা হচ্ছে যে, মুসলমানগণ সব নবী (প্রফেট)কে মান্য করে। সব নবীকে না মান্য করলে কেউ মুসলমানই থাকতে পারে না। কিন্তু অন্য কোন ধর্মের অনুসারিগণ সব নবীকে মান্য করে না। একটা উদাহরণ হলো– ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একদিন ছিল, যে দিন বৃটিশ সরকারের রাজত্ব ছিল। তখন সবাই ছিল বৃটিশ সরকারের নাগরিক। পরে এলো ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সরকার। তখন সবাই হলো পাকিস্তান সরকারের নাগরিক। তারপর এলো বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে সবাই বাংলাদেশ সরকারের নাগরিক। এখন বাংলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ বৃটিশ সরকার ও পাকিস্তান সরকারকে এককালের সরকার হিসাবে ঐতিহাসিক কারণে মান্য করে। কিন্তু বর্তমানে আইন চলে একমাত্র বাংলাদেশ সরকারের। এই সরকারের আমলে যদি কেউ দাবী করে যে, সে বৃটিশ সরকারের বা পাকিস্তান সরকারের হুকুম-আইন-কানুন মেনে চলবে এবং বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের আইন মানবে না, তাহলে সেই ব্যক্তি যে পর্যায়ের অপরাধী হবে, ঠিক সেই একই পর্যায়ের অপরাধী হবে তারা, যারা বর্তমান শেষ নবীর আমলের মানুষ হয়ে শেষ নবীর আইন মান্য না করে পূর্ববর্তী নবীগণের আইন মেনে চলতে জেদ করবে। আমরা যদি হযরত মূসা (আঃ) বা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের মানুষ হতাম তাহলে তাঁদের আইন আমাদের মেনে চলতে হতো। কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্ম হয়েছে শেষ নবীর আমলে, তাই আমাদের মেনে চলতে হবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। (খন্দকার আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬)

(২৯) বৌদ্ধ ধর্মের নাস্তিকতা অথবা তথাকথিত নাস্তিকতা নাস্তিকদের হাতে আর একটি অস্ত্র। বৌদ্ধ ধর্ম খুব পুরাতন ধর্ম। যীশু খৃষ্ট ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বহু পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার ভারত উপমহাদেশ আক্রমণ করেন ৩২৭ খৃষ্টপূর্বে, আর গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয় তারও বহু পূর্বে ৫৪৪ খৃষ্টপূর্বে। এ সময়ে লিখিত তথ্যের পূর্ণ অভাব ছিল। গৌতম বুদ্ধ নিজেও কিছু লিখে যান নাই। পরবর্তীতে তাঁর নামে যা বৌদ্ধ পুরোহিতগণ প্রচার করেন তার অনেক কিছুই গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার বিপরীত। বৌদ্ধরা বলেন, বুদ্ধ নাকি বলেছিলেন যে, ভগবান (অর্থাৎ স্রষ্টা) নেই। আমি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যতদূর অধ্যয়ন করেছি তাতে কোথায়ও পেলাম না গৌতমবুদ্ধ সরাসরি কখনও

www.pathagar.com

ভগবান নেই, এমন কথা বলেছিলেন। 'ভগবান' একটি ভারতীয় শব্দ। স্রষ্টা বলতে এ অঞ্চলের লোক, 'ভগবান' শব্দ ব্যবহার করে; যেমন–ইরানে স্রষ্টা বলতে 'খোদা' এবং ইংরেজী বা প্রাচীন ইংরেজীতে, পুরাতন স্যাক্সন ও পুরাতন নর্স ভাষায় 'গড্' পুরাতন হাই জার্মান ভাষায় 'গট্', গথিক ভাষায় 'গুথ্', জার্মানিক ভাষায় 'গুধ্' ও অতীত ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষায় 'ঘুট্' বলা হয় বা হতো। (সূত্র ঃ কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্সনারী, পৃষ্ঠা ৪২৫)। আসলে গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান লাভের পরে মিথ্যা ভগবানসমূহকে পূজা করতে নিষেধ করেন। হিন্দুর সন্তান হয়েও তিনি মূর্তিসমূহকে পূজা করতে নিষেধ করেন। তখন লোকজন তাঁকে বলে, তাহলে আপনি কি ভগবান? একথা বলার অর্থ ভারত উপমহাদেশে অবতারবাদের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিখ্যাত ধর্মীয় মানুষকেও ভগবান বলা হয়। কোন কোন হিন্দু জনসাধারণ গৌতম বুদ্ধকে সেইরূপ মানুষরূপী ভগবান–অবতার মনে করে। উল্লেখ্য, এখনও হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ গৌতম বুদ্ধকে অবতার মনে করে, যদিও বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ দাবী অগ্রহণযোগ্য বলে। গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলেন, "আই এম নট ভগবান" (আমি ভগবান নই)। গৌতম ঠিকই বলেছিলেন যে, তিনি ভগবান নন, কিন্তু তিনি বললে কি হবে, হিন্দু ধর্মের প্রভাব পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে প্রবলভাবে প্রবেশ করায় গৌতম বুদ্ধ শুধু অবতার নন, ভগবানে পরিণত হলেন। আধুনিক বৌদ্ধগণ অবশ্য বলে থাকে যে ভগবান নেই–'পারসনাল গড' (ব্যক্তিসত্তা সম্পন্ন স্রষ্টা) নেই। আর সেই বৌদ্ধগণই শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার সেই শূন্য আসনে গৌতম বুদ্ধকে বসিয়ে 'ভগবান বুদ্ধ' বানায়। গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে আর একবার এলে তিনি তাঁর 'ভগবান' হওয়ার পর্যায় দেখে বিস্মিত হতেন।

গৌতম বুদ্ধের 'ভগবান' হওয়া, আর যীশুখৃষ্টের তিন খোদার এক খোদা হওয়ার মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। গৌতম তো যীশুর জন্মের ৫৪৪ বছর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গৌতমের ৫৪৪ বছর পরে জন্মগ্রহণ করে যীশু খৃষ্টানদের চোখে তিন খোদার (গড, হলি ঘোষ্ট অর্থাৎ জিবরাইল ফেরেশ্‌তা অথবা যীশুর মাতা মেরি এবং যীশুখৃষ্ট) অন্যতম খোদায় পরিণত হয়ে গেলেন! যীশু স্রষ্টাকে শুধু পিতার সঙ্গে তুলনা করে কথা বলেছিলেন, তাতেই ভক্তবৃন্দ তাঁকে স্রষ্টার পুত্ররূপে স্রষ্টার ওয়ারিস হিসাবে অন্যতম খোদায় পরিণত করে। যীশু এখন পৃথিবীতে এলে তিনিও গৌতম বুদ্ধের মত বিস্মিত হতেন। এভাবে ভক্তদের চোখে খোদা বা স্রষ্টার সংখ্যা পৃথিবীতে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা সময়। ফলে একসময়ে ভারতবর্ষে মনে করা হতো তেত্রিশ কোটি দেবতা বা ভগবান রয়েছে। মানুষও কাল্পনিক ভাগবানের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে ঢেঁকিমঙ্গলের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ঢেঁকিও একটি বিখ্যাত শক্তিতে পরিণত হোল এবং বিকল্প খোদায়ী শক্তি হয়ে গেল।

গৌতমবুদ্ধ 'ভগবান' মান্য করেন নাই বলে তাঁকে নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু গৌতম তো ব্রহ্মা, গন্ধর্ব, কিন্নর, স্বর্গ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন, আর অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান যুগের কট্টর নাস্তিকগণ এ সম্পর্কে কি বলবেন? ব্রহ্মাকে অবশ্য বৌদ্ধগণ খাটো করে ফেলেছে। ভারতীয় ধর্মে ব্রহ্মা এককালে সর্বশ্রেষ্ট 'ভগবান' ছিল। পরবর্তীতে নানা ভগবানের জন্ম হলে ব্রহ্মার সে অবস্থান আর থাকে নাই। অন্যদিকে বৌদ্ধগণও বলে যে, গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় ব্রহ্মা গৌতমকে প্রণতি জানায় অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধকে ব্রহ্মার উপরে স্থান দেওয়া হয়।

সে যাই হোক, বৌদ্ধ দর্শন দিয়ে নাস্তিকতার সমর্থন হবে না। কারণ, গৌতম বুদ্ধের চাইতে দুর্বল ব্রহ্মা, গন্ধর্ব ও, কিন্নর এবং স্বর্গ (যেমন তুশিতা স্বর্গ) রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে। আধুনিক নাস্তিকগণ কি সে সবকে মান্য করবে? আর গৌতম বুদ্ধকে কি 'ভগবান' হিসাবে নাস্তিকগণ মান্য করবে?

গৌতম নাস্তিক কি না, তা গৌতমের কাছ থেকে জানতে পারলেই ভাল করে বলা যেত। এমন যে অশ্বঘোসের 'ললিতবিস্তর' তা শুধু নামেই বিদ্যমান। তবু, Recent researches in Buddhism have shown that the metaphysical silence of Buddha is not tantamount to what is called agnosticism. There are utterences of Buddha not generally taken as spurious which indicate that he had a knowledge of a transcendental reality, but he did not give it publicity lest it might be source of unnecessary duels." (G. c. Dev.—Idealism; A new defence and a new application, p—125). তাছাড়া, 'বুদ্ধের সংলাপ' বা বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদিতে একথা তো পাওয়া গেছে–

"আচ্ছা, এই ব্রাহ্মণরা কিংবা তাঁদের গুরুদের কেউ যদি তাঁদের নিজ চক্ষু দিয়ে ঈশ্বরকে না দেখে থাকেন, তাহলে তাঁরা কি করে অপরকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন? . . . ঈশ্বর দূরতম থেকেও দূরবর্তী এবং সুক্ষ্মতম থেকেও সুক্ষ্ম . . . কেবল সেই তোমাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌছে দিতে পারবে– যার জ্ঞান ও অবগতি আছে তাঁর সম্বন্ধে। কেবল তিনিই তোমাকে ঈশ্বরের কাছে নিতে পারবেন যিনি নিজে এসেছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে।" ঃ–'Dialogues of

www.pathagar.com

Buddha' by Rhys David: 'Sacred Books of Buddhists' by Max Muller দ্রষ্টব্য)

তথাগত বুদ্ধ আরও বলেছেন, "ব্রহ্মাকে আমি জানি, আমি ব্রহ্মার জগৎ এবং তাতে পৌছুবার পথও জানি। হ্যাঁ, তাকেও আমি জানি যিনি ব্রহ্মজগতে প্রবেশ করেছেন এবং তথায় জন্মলাভ করেছেন।" (তেভিগ্য সুত্তনঃ)

বৌদ্ধদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আগত বুদ্ধ আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু একথা কি তিনি কোথাও বলেছেন যে, তিনি আত্মা মানেন না। আত্মা না মানলে তো নির্বান-মহাপরিনির্বানের প্রশ্ন উঠে না। যাঁরা বুদ্ধকে অনাত্মবাদী মনে করেন তারা নির্বানের অর্থ করেন 'লয় হয়ে যাওয়া'- 'বিলীন হয়ে যাওয়া।' অথচ, সত্যিকার অর্থে নির্বান প্রাপ্ত আত্মা, পার্থিব কলুষ কামনা-বাসনার 'মার' বা শয়তানের শত্রুতা থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করেই অনন্তের পথে পাড়ি জমায় এবং আত্মার সেই যাত্রা নিষ্কর্ম নিস্পন্দ হবে না-এটাই ছিল বুদ্ধদেবের নির্বানের কথা। আত্মার পরিত্রাণ লাভই তার আর এক জন্মলাভ এবং তা এই বস্তুজগতে পুনরাগমন নয়, ব্রহ্মজীবনে নবজীবন লাভ। মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে মানবাত্মার যে স্থানান্তর পরজগতে, তাও পরজন্ম। পর জগতেই এই জন্মলাভ ইহজগতে জন্ম নয়, অন্যজন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর এবং এই 'জন্মান্তরের' অপব্যাখ্যা থেকেই সম্ভব হয়েছে জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদের অবৈধ জন্ম। ইহজগত থেকে পরজগতে 'আত্মার স্থানান্তর' করণের নাম মৃত্যু। মৃত্যু অর্থ লয় নয়, বর্তমান অবস্থার গুণাবলীর নিষ্ক্রিয়তাসাধন, অপসারণ বা তার পরিবর্তন বা স্থানান্তরণ। যাঁদের ধারণা বস্তু অবিনশ্বর, তারাও বোধ করি মৃত্যুর এই অর্থটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

অতএব, তথাগত বুদ্ধকে যাঁরা অনাত্মবাদী, নাস্তিক বা নিরশ্বরবাদী বলে মনে করেন, তাঁদের অন্ধ-ভ্রমটার অবসান হউক, এটাই কাম্য। কেননা, যে ব্যক্তি নাস্তিক, সে প্রকৃতপক্ষে ইবলিসের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইবলিসের যে পরিচয় ধর্মগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সে নাস্তিক ছিল না। সে খোদা মানতো। মানেনি খোদার নবীকে। সে মনে করেছিল যে, খোদার নবীর চাইতে সে-ই উত্তম। এই অহংকারই সর্বনাশ করেছে তার। খোদার হুকুম অমান্য করে অভিশপ্ত হয়েছে সে। অতএব, যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত নবী-রাসূলকে অমান্য করে, সে ইবলিস; আর যে খোদাকেই অস্বীকার করে সে ইবলিসেরও অধম। তাই, যে বৌদ্ধ-সন্তানরা আজ বুদ্ধদেবকে নাস্তিকতার ঘোর তিমিরে নিপতিত রাখতে চান, তাদের নির্বোধ অজ্ঞতার অবসান হউক।(শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, পৃঃ ১৮-১৯)।

www.pathagar.com

(৩০) নাস্তিকরা যুক্তি পেশ করছে যে সৃষ্টিকর্তা যদি থেকেই থাকেন, তাহলে তিনি অনন্ত হতে পারেন না, কারণ যদি তাঁকে অনন্ত হতে হয়, তাহলে এমন হতে হবে যে তাঁর কোনো শুরু ছিল না। কিন্তু যাঁর শুরু বা সৃষ্টি হয়নি, তাঁর কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। জন্ম ছাড়া অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। যদি বলা হয় যে, তিনি আপনা থেকেই অনন্তকাল ধরে আছেন এবং থাকবেন, তাহলে তা হবে নিছক একটি বিশ্বাসের ব্যাপার। তাকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

আমাদের জবাব হল যে, নাস্তিকরাই তো বলছে মহাবিশ্ব শুধু আছে। স্টিফেন হকিং বলছেন, "It is just be"। মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করলে, স্রষ্টা সম্পর্কে কেন করা যাবে না– স্রষ্টা অবস্থান করছেন– এই হোল সুস্পষ্ট ধারণা। যিনি শুধু অবস্থান করছেন, তিনি অনন্তই হবেন। যার শুরু আছে তাকে অনন্ত বলা যায় না। স্রষ্টা নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। তাঁকে বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি রয়েছে প্রচুর। অযৌক্তিকভাবে স্রষ্টাকে মানার প্রয়োজনীয়তা নেই। যুক্তিই সত্য প্রতিষ্ঠা করবে। তবে আস্তিক মানুষের যুক্তি তার বিশ্বাসকে করবে দৃঢ়।

(৩১) নাস্তিকেরা বলে, আজ পর্যন্তও কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে, সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন।

আমরা বলবো যে, আজও পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে, সৃষ্টিকর্তা নেই। মানুষের জ্ঞান-গবেষণা চলছেই– এখনও শেষ বিন্দুতে পৌঁছে নাই। তাই 'না' বলার সময় আসে নাই।

আর এখনও যে স্রষ্টা রয়েছেন তা প্রমাণিত হয় নাই–একথাটাও ঠিক নয়। স্রষ্টা যে রয়েছেন তা পৃথিবীর মহামানবগণ নানাভাবে প্রমাণ রেখে গেছেন। হ্যাঁ, কেউ চোখে স্রষ্টাকে দেখিয়ে দিতে পারেন নাই। কারণ স্রষ্টার একটি মূলনীতি হলো যে, তিনি ধরার ধূলিতে দর্শন দেবেন না। এটি তাঁর একটি কর্ম পদ্ধতি। মানুষ যেমন পৃথিবীতে এসেই হাতের কাছে আগুন, বস্ত্র, আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ী, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, টিভি, ইত্যাদি পায় নাই। আবিষ্কার করতে হয়েছে, খুঁজে পেতে হয়েছে, স্রষ্টাকেও মানুষ খুঁজে বের করবে। যারা খুঁজে পাবে না, তারা হতভাগা। শুধু ভাগ্যবানরাই স্রষ্টার নাগাল পেতে পারে। বস্তুদ্রব্য খুঁজে পেতে মানুষের এত সাধনা করতে হয়েছে, আর স্রষ্টাতো বস্তু নয়। তাই তাকে পেতে হলে আরো বেশী সাধনা প্রয়োজন পড়বে।

(৩২) নাস্তিকেরা বলে, সৃষ্টিকর্তাকে যদি থাকতেই হয় তাহলে নিঃসন্দেহে

www.pathagar.com

তাঁকে হতে হবে সর্বশক্তিমান। কিন্তু যদি দেখানো যায় যে, তাঁর কমপক্ষে একটি অক্ষমতা আছে, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। তাঁকে যদি অনন্তকাল ধরে অস্তিত্বশীল থাকতে হয়, তাহলে তাঁর একটি ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়; তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। এই না পারাটাই তাঁর একটি অক্ষমতা। যার কারণে তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। আর যদি তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন, তাহলে তিনি নশ্বর বা ধ্বংসশীল। আর নশ্বর বলেই তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।

আমরা বলব যে, এটি একটি স্ব-বিরোধী যুক্তি। কথায় বলে যে, একজন উপরেরটাও খেতে চায়, আবার তলেরটাও কুড়োতে চায়। সৃষ্টিকর্তাকে অনন্ত হিসাবে দেখতে চায় না নাস্তিক। আবার সসীম হিসাবেও নয়। তাহলে তারা কি হিসাবে স্রষ্টাকে দেখতে চায় তারা 'হ্যাঁ' ও শুনতে চায় না, 'না'ও শুনতে চায় না। স্রষ্টা সর্বশক্তিমান হলে তাকে ধ্বংসশীলও হতে হবে–এটি কোন যুক্তি নয়? এটি স্ব-বিরোধিতা-ভাষার কারসাজি আর কি। সোনার পাথরবাটি–এই আর কি।

স্রষ্টা সর্বশক্তিমানই–তাঁর শক্তিতে কোন কমতি নেই। কমতি থাকলে তা স্রষ্টা হতে পারে না।

নাস্তিক বলছে, স্রষ্টা কি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন?

আমরা বলব, কেন তিনি তাঁকে ধ্বংস করবেন? রূপকথার গল্পে পড়েছিলাম যে, বোতল থেকে মুক্ত দৈত্যকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, সে সেই বোতলে ছিল না; আর যদি থেকেই থাকে আর একবার বোতলে ঢুকে প্রমাণ দিক যে, সে সেখানে অতবড় দেহ নিয়েই থাকতে পেরেছিল। নাস্তিক কি স্রষ্টাকে সেই প্রশ্ন করছে বা শক্তির কসরত দেখাতে চ্যালেঞ্জ করছে? স্রষ্টার সবকিছু করার সার্বভৌমত্ব রয়েছে। তবে নাস্তিকের কথায় তিনি তা করতে যাবেন কেন?

নাস্তিক প্রশ্ন করতে পারে, স্রষ্টার কি যৌনক্ষমতা রয়েছে? নিদ্রা আছে? ক্ষুধা আছে? তন্দ্রা আছে? তাঁর কি পায়খানা-প্রস্রাব লাগে? তিনি কি পাপ কাজ করতে সক্ষম? তাঁর কি পুত্রবাৎসল্যগুণ আছে? স্ত্রী-প্রেম? ক্লান্তি? হতাশা? রোগ? শোক? জরা? ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি বলা হয় যে, এসব তাঁর নাই, তাহলে নাস্তিকগণ বলবে যে, স্রষ্টা নেই, কারণ এগুলোর কমতিই প্রমাণ করে স্রষ্টায় অনেক কিছু নেই। এটি কোন যুক্তি হলো? স্রষ্টা কুরআন মজীদে বলেছেন,

"আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ (প্রভূ) নাই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট, বিশ্বধাতা, তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে

www.pathagar.com

যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৫)। এই হলো কুরআনের বিখ্যাত 'আয়াতুল কুরসি' (আসন সংক্রান্ত বাক্য)।

নাস্তিকেরা যে সমস্ত পয়েন্টকে স্রষ্টার অক্ষমতা বলছেন, তা অক্ষমতা নয়। বরং এইসব থাকলেই অক্ষমতার দোষারোপ হবে। স্রষ্টার যদি ক্ষুধা থাকত, তা কি তাঁর জন্য 'পজিটিভ' গুণ হতো? যদি তাঁর যৌনক্ষুধা থাক্‌ত তাহলে কি তাঁর জন্য শোভনীয় হতো? তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না বা করেন না, এটা স্রষ্টার কোন অক্ষমতা নয়। স্রষ্টা নিজেকে ধ্বংস করবেন, আত্মহত্যা করবেন, আর সৃষ্টি ঠিকই পূর্বের ন্যায় সচল থাকবে– নাস্তিক কি তাই ধারণা করে? নাস্তিক যে সব 'নেগেটিভ' বৈশিষ্ট্য স্রষ্টাতে নেই বলছে, সেগুলো স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভিতর দিয়ে দিয়েছেন। তাই তো মানুষের ক্ষুধালাগে, তন্দ্রা আসে, নিদ্রা আসে, ক্লান্তি আসে, যৌনক্ষুধা অনুভব হয়, পায়খানা-প্রস্রাব লাগে, পুত্র-বাৎসল্য পেয়ে বসে, স্ত্রী-প্রেম আসে, হতাশা আসে, পাপ কাজে কখনও প্রবৃত্তি হতে পারে, এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে, রোগ-শোক-জরা আসে। এইসব নেগেটিভ বৈশিষ্ট্য স্রষ্টাতে পাওয়া গেলে তাকে স্রষ্টাই বলা যাবে না। পৌত্তলিক ধর্মসমূহ এইসব বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার উপর আরোপ করে স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের সঠিক ধারণাকেই করেছে বিভ্রান্ত। আর এ ধরনের স্রষ্টাকে যুক্তিবাদী মানুষ, বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃত স্রষ্টা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে সর্বশক্তিমান হিসাবেই রয়েছেন। কোন কমতি তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি কোন স্ব-বিরোধিতার বস্তু নন।

স্রষ্টা নিজেকে ধ্বংস করতে পারে কি না, তাঁর যৌনক্ষুধা ইত্যাদি আছে কি না– এসব না থাক্‌লে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নন–এটা কোন যুক্তিই হলো না। স্রষ্টার যদি এসব থাকত্, অর্থাৎ তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন বা তাঁর যৌনক্ষুধা আছে, তাহলে তিনি আর স্রষ্টা-সর্বশক্তিমান স্রষ্টা থাকেন না। স্রষ্টার কমতি থাকার অর্থ তিনি আর স্রষ্টা নন। ক্ষুধা, যৌনক্ষুধা, আত্মহত্যার ক্ষমতা ইত্যাদি হলো কমতির লক্ষণ। এগুলো মানুষের রয়েছে। তাহলে কি মানুষ স্রষ্টা হয়ে যাবে এসব নিয়ে? আত্মহত্যা করার ক্ষমতা থাকলে তিনি সার্বভৌম স্রষ্টা হবেন, আর না থাকলে নন– এটি কোন যুক্তি হলো না। মানুষ আত্মহত্যার ক্ষমতা নিয়েও কোনদিন স্রষ্টা হতে পারবে না।

www.pathagar.com

(৩৩) নাস্তিকেরা বলে যে, স্রষ্টা যে আছে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব আস্তিকের। আমরা বলব যে, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছি। তা যদি নাস্তিকেরা গ্রহণ না করে, তা তাদের দূর্ভাগ্য। আর স্রষ্টা যে নেই তাও নাস্তিকদেরই প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণহীন অবিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। স্রষ্টার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এত গুরুত্বপূর্ণ যে, হেলাফেলার বিষয় এ'টি নয়। যদি প্রমাণহীন অবিশ্বাসের শিকার হয় মানুষ, সমগ্র জীবন তার বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হবে। তার হবে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি জগৎ জীবন নিয়ে। জীবনের উদ্দেশ্যই সে হারিয়ে ফেলবে চোরাবালিতে। এস এম জাকির হুসাইন তাঁর "সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন" গ্রন্থে লেখেন, "কোনো কিছুকে জানা যাচ্ছে না বলে এ বলার কোনো যুক্তি নেই যে, তা নেই। মানুষের জানার ক্ষমতার ওপর বস্তুজগতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।" (পৃষ্ঠা ৫৫)।

(৩৪) সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব প্রমাণে কয়টি যুক্তি রয়েছে, যেগুলো ধাঁধার মত। স্রষ্টার তথাকথিত অক্ষমতা সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এস এম জাকির হুসাইন বলেন, "ধরা যাক সৃষ্টিকর্তা আছেন। তাহলে তাঁকে নিঃসন্দেহে হতে হবে সর্বশক্তিমান এবং অনন্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁর কি কোনো অক্ষমতাই নেই? অন্তত একটি অক্ষমতা তাঁর আছে এবং তা হলো এই যে, তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। এটি নিঃসন্দেহে একটি অক্ষমতা। সুতরাং সর্বশক্তিমান বলে কিছু নেই এবং ফলে, সৃষ্টিকর্তা বলেও কিছু নেই। অপরপক্ষে যদি বলা হয় যে, তিনি নিজেকেও ধ্বংস করতে পারেন, তাহলে তো তিনি ধ্বংসশীল বা নশ্বর হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তার ধ্বংস সম্ভব– যাঁর কারণেই হোক না কেন। কিন্তু নশ্বর কোনো শক্তি কখনও সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। ফলে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।

এ ধাঁধার মর্মার্থ বহন করে আরো অনেক সমান্তরাল ধাঁধা আছে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যা হোক একটাই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়– সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারেও না। কয়েকটি এখানে বিশ্লেষিত হলো।

Big Bang Theory অনুসারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা এক সময়ে ছোট একটা বিন্দুর বা কলমের খোঁচার (full stop-এর মতো ছিলো) ঐ বিন্দুটার ওজন ছিল গোটা সৃষ্টি-জগতের ওজনের সমান। প্রশ্ন হলো ঃ ঐ বিন্দুটা ছিল কোথায়? অর্থাৎ বিন্দুটার চারপাশে কী ছিল?

শূন্যে? কিন্তু শূন্য এবং সময়ও এক ধরনের সৃষ্টি যা আগে ছিল না। ব্রহ্মাণ্ড

www.pathagar.com

সৃষ্টির সাথে সাথেই শূন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদও তাই বলে।

আসলে উক্ত পর্যায়ে আমাদের কল্পনা পৌছাতে পারে না। মানবীয় যুক্তি space (শূন্য) এবং time (সময়) এর বাইরে যেতে পারে না। এসব বিষয়কে বিবেচনা করার আগে মানবীয় যুক্তির দৌড় কতদূর তা জেনে নিতে হবে।

আরেকটা ধাঁধা হলো একটা সাপকে নিয়ে, সাপটি ক্ষুধার্ত হলে নিজের লেজ গিলে খায়। ধরা যাক সে তার লেজ চিবিয়ে খায় না, গিলে খায়। তার উদ্দেশ্য সে নিজেকে পুরোপুরি গিলে খেয়ে ফেলবে। তা কি সে পারবে? একটু করে চিন্তার মধ্যে এগুতে থাকুন এবং কল্পনায় দেখতে থাকুন সে কতদূর এগুতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নবান এসে প্রশ্নকর্তাকে বিদ্ধ করবে; "নিজের লেজ সে গিলবে– বুঝলাম, কিন্তু রাখবে কোথায়?"

পেটে।

"পেটও তো সে খাবে। রাখবে কোথায়?"

গলায়।

"গলাও তো সে খাবে। রাখবে কোথায়?"

গালের মধ্যে, অর্থাৎ মুখে।

"কিন্তু তার তো মুখটাও খাওয়ার কথা, যেহেতু সে নিজেকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু মুখকে সে খাবে কী দিয়ে?"

মুখ দিয়ে। "সাপটার কয়টা মুখ?"

একটা।

"তাহলে এ আদৌ সম্ভব না।"

একদম না?

"না।"

যদি সৃষ্টিকর্তা তাকে আদেশ দেন, 'সাপ! তুই নিজেকে পুরোপুরি খেয়ে ফেল, "তাহলেও না?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব ঃ যদি তিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হন, তাহলে

www.pathagar.com

তিনি যেহেতু মানুষের চিন্তায় যা সম্ভব এবং অসম্ভব তার সবই সম্ভব করতে পারেন, সেহেতু তাঁর দেয়া কৌশল অনুসারে সাপটা তা পারবে।

কিভাবে?

তা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে, তাঁর দ্বারা তা সম্ভব।

তা যে সম্ভব তা প্রমাণ করতে পারবেন?

কিভাবে তা সম্ভব তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তা জানতে পারলে তো আমরা তাঁকেই জেনে ফেলতাম এবং তখন তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলতাম না। অর্থাৎ তখন তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকতেন না। সুতরাং যেহেতু আমরা জানি যে, তা তাঁর দ্বারা সম্ভব এবং যেহেতু আমরা জানি না কিভাবে তা সম্ভব নয়, সেহেতু একথা প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টিকর্তার দ্বারা (যদি তিনি থাকেন) তা পুরোপুরি সম্ভব। তবে মানুষের পক্ষে তা দেখা সম্ভব নয়। মানুষ দ্যাখে চোখ দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে। তার যুক্তিতে এরূপ ঘটনা দেখার মতো কোনো ক্ষমতা নেই বলে সে তা দেখতে পাবে না। সেখানে যুক্তিকে প্রয়োগ করতে চাইলে তা আত্মবিরোধের জন্ম দেবে। যুক্তির ক্ষমতা নেই নিজেকে অতিক্রম করার। ফলে তা তার আয়ত্বের বাইরে, তার বিচারে অযৌক্তিক। কিন্তু আরো উন্নত কোনো যুক্তি থাকতে পারে– যার বিচারে এরূপ ঘটনা অযৌক্তিক নয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে এগুতে এগুতে হয়তো এমন যুক্তিও পাওয়া যাবে যার কাছে অযৌক্তিক বলেই কিছু নেই। সেখানে সবই যৌক্তিক। আর যৌক্তিক বলেই তা সেখানে সম্ভব। যুক্তির সে সিস্টেমে কোনো আত্মবিরোধ থাকতে পারে না।

একই জাতীয় আরেকটা ধাঁধা ঃ এক মাথাবিশিষ্ট এক রাক্ষস রাগে নিজের মাথা ছিঁড়ে নিজে খাচ্ছে। কিভাবে?

উত্তর একই ধরনের।

বেশ, তাহলে বুঝতে সুবিধা হলো যে, উপরোক্ত আত্মবিরোধমূলক কোন যুক্তি যদি থাকে, তাহলে তা অনুসারে সৃষ্টিকর্তা নিজেকে সৃষ্টিও করতে পারেন, ধ্বংসও করতে পারেন। তবে পার্থক্য এখানে যে, নিজেকে ধ্বংস করার পরও তিনি সৃষ্টিকর্তাই থাকেন এবং নিজেকে সৃষ্টি করার আগেও তিনি ছিলেন।

মানুষের বিচারে যাকে ধ্বংস বলা হয়, সৃষ্টিকর্তার বিচারে ধ্বংস মানে তা

www.pathagar.com

না-ও হতে পারে। এমনকি মানুষের বিচারেও তো পুরোপুরি ধ্বংস বলে কিছু নেই। শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুসারে, মানুষ সৃষ্টি-জগতের কোনো শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু এক প্রকারের শক্তিকে অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আর আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ (যেখানে E= শক্তি, m= বস্তুর ভর, c= আলোর বেগ) সূত্র অনুসারে পদার্থই শক্তি, শক্তিই পদার্থ। সুতরাং সৃষ্টিজগতের কোনো পদার্থও ধ্বংস করা সম্ভব নয়। শুধু সম্ভব রূপান্তর।

এই যদি হয় মানুষের অবস্থা, তাহলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি আরো স্থির। এমনও তো হতে পারে যে, তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে করতে সম্পূর্ণ নিজেতেই রূপান্তরিত হন, ভিন্ন কিছুতেই রূপান্তরিত হন না। অর্থাৎ তাঁর কোনো রূপান্তরই নেই। তবে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা (process) তার জানা আছে। নিজেকে ধ্বংস করতে করতে তিনি উক্ত ধ্বংস প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবিত থাকেন এবং উক্ত প্রক্রিয়ার পরও অক্ষত থাকেন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।" (সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন, পৃঃ ১২-১৫)।

এস এম জাকির হুসাইন সাপের উদাহরণে লেখেন, "নিজেকে খেয়ে সাপটি এখন দিগুণ মোটা হয়ে গেল। তাহলে এই দ্বিগুণ মোটা সাপটি কি আগের সাপটির মধ্যে আছে?

প্রশ্নটি আপনার কাছে এত ভূতুড়ে ধরনের ভালো লেগেছে যে, এর জবাব দেবার ইচ্ছা আপনার নেই। কিন্তু এই আনন্দ ভূতুড়ে বলেই গায়ের রোম যখন আর খাড়া থাকবে না তখন যুক্তি এসে আপনাকে আবার জয় করে নিবে। ফলে বলবেন, এতো পুরোপুরি আত্মবিরুদ্ধ। সে নিজের মধ্যে নিজে নেই।

দেখুন তো, এখন আপনিই তো প্রমাণ করে দিলেন যে, তার বাইরেও সে আছে!" (পৃঃ ৪৬)।

এস, এম, জাকির হুসাইন আবার লেখেন, "Big Bang Theory" অনুসারে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একসময়ে, অর্থাৎ তার সৃষ্টির মুহূর্তের কিছুটা পরে একটি ফুলষ্টপের মতো ছিল। তার থিওরি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অনুসারে তখন Space এবং Time বলে কিছু ছিল না। Space যদিও না থাকে, তাহলে বিন্দুটি ছিল কোথায়? অর্থাৎ তার চারপাশে কী ছিল? সে কি নিজের মধ্যেই নিজে অবস্থান করছিল? . . . তাহলে সেই

www.pathagar.com

বিন্দুটির সৃষ্টির আগে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ছিল? তাহলে কি তা নিজের মধ্যে নিজে ছিল না? তাহলে কি তার অস্তিত্বের মধ্যেই তার অনস্তিত্ব ছিল, কিংবা তার অনস্তিত্বের মধ্যেই তার অস্তিত্ব লুকিয়ে ছিল?" (পৃঃ ৫৩)

এস, এম, জাকির হুসাইন লেখেন, "এই ধাঁধাটির অনুরূপ একটি ধাঁধা বেশ প্রচলিত আছে, যা বুঝতে পারা আরো সহজ। তা এরূপ ঃ এক শহরে এক নাপিত আছে। ঐ শহরের যত লোক নিজের দাড়ি কামায় না তাদের সবার দাড়ি সে কামায়। তাহলে সে কি নিজের দাড়ি কামায়?

যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে সে নিজের দাড়ি কামায় না, কারণ তার নিয়মই তো শুধু লোকদের দাড়ি কামানো– যারা কখনই নিজেদের দাড়ি কামায় না। আবার যদি বলি না, তাহলে সে নিজের দাড়ি কামায়, কারণ নিজের দাড়ি কামায় না এমন সব লোকের দাড়িই তো তাকে কামানোর কথা, আর সেও তো ঐ শহরের সব লোকদের মধ্যে একজন। আত্মবিরোধ। আপনি যাচ্ছেন 'হ্যাঁ'তে, আপনার যুক্তি আপনাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে 'না'তে–এবং উল্টোভাবেও।

এখন দেখা যাক এরূপ ধাঁধাকে solve করতে হবে নাকি dissolve করতে হবে। একে solve করা সম্ভব নয় যদি যে-যুক্তির ওপর ধাঁধাটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে শাশ্বত বলে ধরে নেয়া হয়। আর যদি প্রমাণ করা যায় যে তা শাশ্বত নয়, তাহলে ধাঁধাটিকে dissolve করতে হবে, অর্থাৎ তা আর ধাঁধাই থাকবে না। তখন যে-যুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে তাতে সবই সত্য, তাতে আত্মবিরোধ বলে কিছু নেই, তাতে মহাসেট Z নিজেও নিজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কোনো শর্তই নাপিতকে নিজের এবং অন্যের দাড়ি কামানো থেকে বিরত রাখতে পারে না, তখন সাপটি নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলতে পারবে এবং তার পরও সে বেঁচে থাকবে, তখন সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংসও করতে পারবেন– কোনোরূপ অক্ষমতার গ্লানি তাকে বইতে হবে না এবং একই সাথে তখন তাকে কোনোরূপ নশ্বরতার গ্লানিও বইতে হবে না– কারণ নিজেকে ধ্বংস করার পরও তিনি অক্ষত থাকবেন। তখন এক মেরু বিশিষ্ট চুম্বক পাওয়া যবে, এক হাতে তালি বাজানো যাবে, নিজেই নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানো যাবে। তখন সম্ভব আর অসম্ভব, সত্য আর মিথ্যা, ভালো আর মন্দ, গতকাল আর আজ আর আগামীকাল, ধ্বংস আর সৃষ্টি–সবই একই তলে অবস্থান করবে, একটি অপরটির বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে না। . . .

www.pathagar.com

হয়তো যুক্তিবিদ এখনও সন্দেহ তুলবেন, "এরূপ কোনো নাপিত থাকতে পারে না, কারণ তার থাকা উচিত নয়।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারো থাকা না থাকা অন্য কারো উচিত- অনুচিতের ওপর নির্ভরশীল নয়।

"কিন্তু", তিনি আবারও প্রতিবাদ করবেন, "তার নিজের উচিত- অনুচিতের ওপর তার থাকা- না থাকা নির্ভরশীল।"

আমি বলব না, তা আদৌ নয়। অস্তিত্বই তার উচিতকে তৈরি করে। এরূপ নাপিত থাকা সম্ভব- যা সম্ভব নয় তা হলো তার ওপর আরোপিত শর্তগুলি। যদি আপনার শর্তগুলিকে আপনি যুক্তিযুক্ত বলতে চান, তাহলে নাপিতকেও যুক্তিযুক্ত বলতে হবে। তাকে মিথ্যা বললে শর্তগুলিকে বলতে হয় এমন আইন যা প্রণয়ন করা হয়েছে তার জন্য- যার কোনো অস্তিত্বই নেই।

এখন শর্ত থাকলে নাপিত থাকতে পারে না; নাপিত থাকলে শর্ত থাকতে পারে না। এটাই তো একটি আত্মবিরোধ, অথচ আগেরটি এখন আর কোনো আত্মবিরোধ নয়। আপনার লজিককে ঠিক রেখে আপনি যদি আত্মবিরোধের নিষ্পত্তি করতে চান তাহলে আরেকটা আত্মবিরোধের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। আপনার লজিক তার প্রান্তে গিয়ে আত্মবিরোধের জন্ম দেয় অন্য কোনো লজিকে পৌঁছে যাবার জন্য।

নাপিত আছে। তাহলে কি আপনি এখনও শর্তগুলি আরোপ করে বলতেই থাকবেন, সে নেই? নিজের চোখ বুজে থেকে কি প্রমাণ করা যায় আপনার সামনে যে বসে আছে সে আসলে নেই?

কিংবা আপনি কি অন্ধ চোখ বড় বড় করে খুলে রেখে প্রমাণ করতে চান যে আপনি যাকে দেখতে পাননি সে আসলে নেই? নিজের চোখের ব্যাপারে কি কোনো প্রশ্নই তুলবেন না? আপনার যুক্তি কি সত্যই শাশ্বত?

সভ্যতার শুরু থেকে এই পর্যন্ত সব দার্শনিকই মনে করছেন যে যুক্তি স্থান-কাল-পাত্রহীন, শাশ্বত (universal)। কিন্তু যুক্তি শাশ্বত নয়!

যুক্তি সময়নির্ভর।

যুক্তি স্থাননির্ভর। "(পৃঃ ৪৮-৪৯)।

www.pathagar.com

উপসংহার

পদার্থবিদ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর স্রষ্টা বিরোধী মন্তব্যসমূহের জন্য এ গ্রন্থের অবতারণা। তবে হকিং নাস্তিকতার জন্য একা দায়ী নন। পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নাস্তিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামকে পরখ করে দেখার সময় করতে পারেন নাই। তাঁরাও যদি স্বনামধন্য ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলির ন্যায় কুরআন, হাদীস ও ইসলামকে যাচাই করতে পারতেন, তাহলে সত্যে পৌঁছতে সক্ষম হতে পারতেন। আমার কনিষ্ঠা কন্যা রুবিনা সিদ্দিকা হকিং এর রচনায় প্রথম আকৃষ্ট হয়। আমি তার থেকেই হকিং সংক্রান্ত বই পুস্তক পাই। যেহেতু হকিং পাশ্চাত্যে একজন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক, আর বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়ের উপর কিছু অযৌক্তিক মন্তব্য রয়েছে, তাই আমি প্রসঙ্গটি এড়াতে পারলাম না। কোমলমতি যুবক-যুবতীগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় তাই এ গ্রন্থ রচনা।

নাস্তিকতা, স্রষ্টা, ইসলাম ইত্যাদি নিয়ে এ গ্রন্থের এখানেই আপাততঃ শেষ। তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। নাস্তিকতা সম্পর্কিত চৌত্রিশটি যুক্তির জবাব আমরা এ গ্রন্থে দিয়েছি। আমরা নাস্তিকদের আরো শ'খানেক যুক্তির সন্ধান পেয়েছি। এগুলো বেশীরভাগ কলকাতা কেন্দ্রিক। এসব যুক্তিকে বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ "নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন" এর পাতায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ওঠে যে দু'টি গ্রন্থেই তো নাস্তিকতাকে সমালোচনা করা হলো। তাহলে আসল "কনসেপ্ট অব গড" (স্রষ্টা তত্ত্ব) কি? তাই বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় গ্রন্থে "স্রষ্টাতত্ত্ব ও ইসলাম" এর পাতায়। আসলে এই তিনটি গ্রন্থকে আমরা একটি "TRILOGY" (ট্রীলজি) অর্থাৎ "ত্রয়ী" প্রচেষ্টা বিশেষ বলতে পারি। এ তিনটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে নাস্তিকদের অনেক প্রশ্ন, অনেক আঘাতের জবাব প্রদান সম্ভবপর হতে পারে। তবে আমি আরো নতুন গবেষকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করব নাস্তিকদের মোকাবিলা করে গ্রন্থ রচনা করতে।

www.pathagar.com

Bangla Language Book:
Stephen Hawking, Nastikata-O-Islam
(Stephen Hawking, Atheism and Islam)
A book on the eminent physicist Stephen W. Hawking's
atheism and its scrutiny in the light of Islamic principles
Written by: Muhammad Siddique
ISBN: 984-31-1018-8

যুক্তরাজ্যের পদার্থবিদ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর সমালোচনায় সমগ্র পৃথিবীতে সম্ভবত: এটি প্রথম গ্রন্থ। পঙ্গু হকিং বর্তমান বিশ্বের একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ-পদার্থবিদ। তাঁর নামের প্রচারে তাঁর প্রভাব উঠতি শিক্ষার্থীদের উপর যথেষ্ট। তবে এসট্রো ফিজিক্স-এর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা), দর্শন ও স্রষ্টাতত্ত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-সমালোচনা করায় তাঁকে ছাড় দেওয়া যায় না।"হু ক্রিয়েটেড গড" (স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন)? স্রষ্টা কি মানুষের ব্যাপারে ওয়াকেফহাল? স্রষ্টা মানুষের ব্যাপারে কি মাথা ঘামান? স্রষ্টার প্রয়োজন আছে কি? মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনে স্রষ্টার কোন স্বাধীনতাই ছিল না- এমনি ধরনের অজস্র দর্শনকেন্দ্রিক মন্তব্য করেছেন পদার্থবিদ হকিং তাঁর বিজ্ঞানের গ্রন্থে। হকিং-এর জীবনী লেখক হোয়াইট ও গ্রিবিন মন্তব্য করেছেন, হকিং গডের ধারণা পুরাপুরি ছুঁড়ে ফেলেছেন। আধুনিক খ্রিস্ট ধর্মের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে হকিং এসব মন্তব্য করে থাকবেন। হকিং যেহেতু ইসলামের স্রষ্টাতত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত, "ফিজিক্স"-এর বাইরে তাঁর অযৌক্তিক মন্তব্যসমূহ বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া যায় না। হকিং তথা অন্যান্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়ের উপর "সুইপিং" (অবিবেচনা-প্রসূত) মন্তব্য মুসলিম যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারে কারণ অনেকেই হকিং এবং অন্য বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান গবেষণায় মুগ্ধ। ফিজিক্সের আপাতত: সত্যের সঙ্গে মেটাফিজিক্স-এর অসত্যকে মিলিয়ে চালানোর প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদানই এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। তবে হকিং ও অন্যান্যের মূল পদার্থবিদ্যা তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে কোন বিদ্বেষ নেই বর্তমান লেখকের।

এই গ্রন্থটি যদিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ, তবে এটিকে একটি ত্রয়ী পরিকল্পনার অন্যতম বলা যেতে পারে। স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ হলো "নাস্তিকের যুক্তি খন্ডন"এবং" স্রষ্টা তত্ত্ব ও ইসলাম" । যারা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চান তাদের হাতে এ তিনটি গ্রন্থ শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। বর্তমান লেখক একজন প্রবীণ গবেষক, প্রবন্ধকার, কলাম লেখক, সাবেক অধ্যাপক ও সাবেক কূটনীতিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডক্টর আনিসুজ্জামান পি এইচ ডি (ওয়েল্‌স, ইউ, কে) - এর মন্তব্যঃ
" আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে, ইংরেজিতে এটির অনুবাদের জন্য পরামর্শ দেই।"